সাহিত্য অঙ্গন

(সাহিত্য আংগন // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XXI, September 2024

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

কার্যকরী সম্পাদক

ড. প্রণবকুমার মাহাতো

ড. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. উজ্জ্বল প্রামাণিক

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণধন আচার্য

: প্রাপ্তিস্থান :

পাতিরাম, দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর এবং ধ্যানবিন্দু

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

অভিষেক টাওয়ার, ৪র্থ তল, ফ্ল্যাট নং-২

কলাকুশমা, ডাক-কে. জি. আশ্রম, ধানবাদ-৩২৮১০০৯

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual
Peer-reviewed Journal
ISSN : 2394 4889 Vol : X, Issue : XXI, September 2024

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

Working Editor :
Dr. Pranabkumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Ujjwal Pramanik

© Publisher

Cover : Krishnadhan Acharyya

Type Setting & Cover Disign :
Manik Sahu
Mob : 9830950380

Printing and Binding :
Granco Process
44, Biplabi Pulin Das Street
Kolkata - 700 009
Ph. : 9331801957

Price : 300.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 7003488354
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Prof. (Dr.) Barendu Mondal, Jadavpur University, Kolkata
Prof. (Dr.) Prabir Pramanik, University of Kalyani, Nadia, W.B.
Amar Mitra, (Katha Sahityik : Sahitya Academy & Bankim Awarded)
Nalini Bera, (Katha Sahityik : Ananda & Bankim Awarded)
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata
Dr. Ritam Mukhopadhyay, Presidency University, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Working Editor :

Dr. Pranab Kumar Mahato
Dr. Soumyabrata Bandyopadhyay
Dr. Ujjwal Pramanik

Working Editorial Board :

Dr. Samaresh Bhowmik, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, 24 pgs. (South)
Swaraj Kumar Das, Fakir Chand Halder College, Diamond Harber

This issue made
as
conference
proceedings
of
One-day International Seminar
was organised on the occasion
of
10th years
of
SAHITYA ANGAN PATRIKA.

ISSN : 2394 4889

The seminar was organised by the
Department of Bengali & IQAC cell
of
Saltora Netaji Centenary College,
Bankura.

বাংলা সাহিত্য : সংকট ও সম্ভাবনা

সূচি

সম্পাদকীয়—৭

পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা —১১

মৌসুমী মন্ডল—রবীন্দ্র ভাবনায় অমঙ্গলের সমস্যা থেকে মানুষের অভীষ্টের প্রকাশ—১৭

পরেশ চন্দ্র মাহাত—কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাচর্চায় বিচ্ছিন্নতাবোধের পরাকাষ্ঠা—২৩

স্বরাজ কুমার দাশ—প্রেমের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়—৩১

সুরজিৎ প্রামাণিক—অলোকরঞ্জনের কবিতা : চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো—৩৭

মহাশ্বেতা চ্যাটার্জি—বিশ্বলোকে স্পন্দিত সুর : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'যৌবন বাউল'—৪৮

শান্তনু সাহা—'বাছুরের খুরে যতটুকু ধূলো ওঠে/তার বেশি নয়'—এক আত্মবিলোপী অলোকরঞ্জনের অহংবর্জিত 'অলোকরঞ্জনা'র নিবিড় পাঠ—৫৪

স্বপন প্রামাণিক—কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে সংকট ও উত্তরণ—৬৫

ফাল্গুনী তপাদার—প্রসঙ্গ হাংরি আন্দোলন : প্রথাভাঙার গল্প—৭১

পঞ্চানন নস্কর—মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রত্যক্ষ জীবন ও চিত্রময়তা—৭৮

স্বাগতা পতি—ইতিহাস ও ধর্মীয় উপাসনার মিলনসাগর : রাধা—৮৪

অঞ্জু মাহাত—মণীন্দ্রলাল বসুর ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা —৮৮

পুতুল বৈদ্য—বনফুলের 'তাজমহল' শাশ্বত প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ—৯৫

মিঠু রায়—বনফুলের ছোটগল্পে (নির্বাচিত) মানবজীবন ও নারী—১০১

রচনা রায়—প্রথম পার্থ : অন্দর মহলের রাজনীতি—১০৬

শিখা কর্মকার—আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্প : সামাজিক দর্পণে নারীর চরিত্র চিত্রায়ণ —১১২

ডাক্তার মাহাত—মালোদের অস্তিত্ব সংকট : প্রসঙ্গ 'তিতাস একটি নদীর নাম'—১১৮

পীযূষ বেরা—সত্তরের অনিমেষদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান : সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'—১২৩

প্রকাশ চন্দ্র মন্ডল—সমরেশ মজুমদারের ছোটগল্পে রাজনৈতিক সংকট : নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে—১২৯

পিন্টু দাস মোদক—সুমথনাথ ঘোষের নির্বাচিত ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকট—১৩৮

অনিন্দিতা মুখার্জী—রাজনৈতিক দর্পণে বিমল করের ছোটগল্প : নতুনত্বের সন্ধান—১৪৪

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস—ভারতবর্ষ : আত্মবিপর্যয় ও এক অস্তিত্ব সংকটের আখ্যান—১৫১

অসীম মুখার্জি—আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : জাফরান রৌদ্রালোকে মৃত্যুর নব বয়ান—১৫৭
স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী—নিরামিষ জীবন ও আমিষ রান্নার দ্বন্দ্ব : বাসুদেব দাশগুপ্ত-র 'রন্ধনশালা'—১৬৩
দেবপ্রিয়া সেন—বিপন্ন সময়ের প্রতিচ্ছবি : প্রসঙ্গ ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি'—১৭২
সৈকত মাহাতো—রাজনীতির আলোকে সমীর রক্ষিতের ছোটোগল্প : স্বাধীনতা থেকে সমকাল—১৭৭
গাফফার আনসারী—একটি পরিবারের গৌরবসর্বস্ব পতনের ইতিবৃত্ত নাকি ঐতিহ্যের স্বাভাবিক রূপান্তর : প্রসঙ্গ একরাম আলির 'দিগন্তের একটু আগে'—১৮৪
সৌগত মুখোপাধ্যায়—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন' পত্রিকায় বাংলায় বিদেশি ও কলকাতা প্রসঙ্গ—১৯২
অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী—লোক সংস্কৃতির নিরিখে বাংলার সূর্যপূজা—২০০
শম্পা হালদার—লোক সংস্কৃতির আলোকে অষ্টক—২০৯
তিথি ঘোষ—নদীয়া জেলার লোকাচার : জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—২১৮
কৌশিক দে—মনুসংহিতার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বাংলা সাহিত্য : একটি পর্যালোচনা—২২৫
উষ্ণীষ পতি— বাঙালির ভোজনবিলাস : আমিষ পর্ব—২৩৪
শাশ্বতী সিনহা বাবু — বাংলার পট ও পটুয়া নারী—২৪১

সম্পাদকীয়

(কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা থেকে) হঠাৎ ঝলকানি, শহরের চারিদিকে চমকায়— মেরুদণ্ড হাতে হাতে, পাহাড় যেন মুঠোয়; উল্টোদিকে হামাগুড়ি দেয় লোহার ব্যারিকেড। লক্ষ লক্ষ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ড্যামি পুলিশ। মানুষের আলিঙ্গন, মানববন্ধন রাস্তার বুকজোড়া— আবার ঝলকানি বিদ্যুতের, সবুজ ধানীপোকা উড়ছে ফাঁকা ধানক্ষেতে। তরুণ-তরুণীর চিৎকার, কী খুঁজছেন মশাই? জোরসে বলি কী করে—হারিয়ে গেছে মেরুদণ্ডখানা। এখনো সময় আছে— চলে এসো কুকুরের ফ্রক পরে, কী করবে!

মুখের ফেনা তুলে যে মানবেরা শ্রাবণ-রাত্রি গায় গান, রাস্তার দুই ঢালে ঢেউ তোলে, সমুদ্র দোলে অফুরান ছন্দে ছন্দে; এঁকে তোলে অন্ধের নাটক। স্মৃতিমূলে তালা দেয় সেনাপতি— দু-একটা ধাপ পেরোলেই সীমন্তিনী নদী। ওরা বসে বসে গায় বিদ্রোহী সুর, ছন্দে ছন্দে নাচে পানীয় বোতল :

"কারার ওই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী"

প্রতিজ্ঞা পথে পথে দুঃখের শিকড়ে বাঁধা, লক্ষ লক্ষ মন-প্রেমিক হাতে আঁচলের হাওয়া— জল্লাদের হাত কেটে নিতে চায়—যে কিনা দেখায় সত্যিকারের সঙ, স্থির পুতুলের ছদ্মবেশে দ্যাখে অগণন প্রহত প্রৌঢ়তাকে। এক পার্বতী নেচেছিল তিলোত্তমা হয়ে বুনে সবার পাপ।

রক্তবীজের নুন খেয়েছে যাঁরা, তাঁরা চেনে না তারা, ওরা পালাতে শেখেনি; পালাতে পারে না ওরা— শিরদাঁড়াটা সোজা ক'রে ঘোরে। ওরা মেধাবী ভবিষ্যৎ। বলছে ওরা, ওরে কাপুরুষ রাত্রি ভরে জেগে দেখ— পাখিরা শীতের ভোরে মাঘমণ্ডল শেষে শূন্য থেকে তুলে আনে তোর আশৈশব পরাভব, উন্নত গ্রীবা। জীর্ণ এই সমাজে কী আর দাবি— শুধু চেনাতে চায় : পুলিশ নাকি আগ্রীব শৃগাল।

একদিকে পাখির দল অন্যদিকে অক্ষৌহিণী কুকুর— প্রভুভক্ত সহস্র চুম্বন খায় ঘুমের। দিনের কঠিন যুদ্ধে আলো জ্বেলে দিতে প্রেমিক শহরের আলো নিভিয়ে দেয়। স্টেথোস্কোপে আগুন, একলব্য এখন হাজার হাজার— লুপ্তবংশকে ওরা দিতে চায় শিশিরভরা চোখ।

দু-হাজার চব্বিশ, জটায়ু আবার দিয়েছেন প্রাণ। চোখে চোখে দেখেছে যখন সীতাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে খাকী অম্লান। হে সেনাপতি, শহরেই এসেছ তুমি কাজে অকাজে যেভাবেই হোক— শিখে নাও একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে ভিড়ের ভিতর। সহস্র নারীরা শেখাবে আলো জ্বেলে গূঢ় অপমান কাকে কয়।

তোমাদের দেখে সন্দেহ বদ্ধমূল হয়— দুর্গামণিকে বাঁচাতে চাও যদি এই প্রখর শীতেও

দেখো মায়ের আঁতুড়ঘর, সুস্থ যন্ত্রণাই কেবল অন্তরায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি কবিতার পংক্তিগুলি প্রতিধ্বনিত হয় ডালে ডালে— পাতায় পাতায় :

'মৌলিক নিষাদ'

পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি।
পিতামহ, দাঁড়িয়ে রয়েছি,
আর চেয়ে দেখছি রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটিও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।

এই এক আশ্চর্য সময়।
যখন আশ্চর্য বলে কোনো কিছু নেই।
যখন নদীতে জল আছে কি না-আছে
কেউ তা জানে না।
যখন পাহাড়ে মেঘ আছে কি না আছে
কেউ তা জানে না।
পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, যাবতীয় আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—ভয়।

পিতামহ, তোমার আকাশ
নীল—কতখানি নীল ছিল?
আমার আকাশ নীল নয়।
পিতামহ, তোমার হৃদয়
নীল—কতখানি নীল ছিল?

আমার হৃদয় নীল নয়।
আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা
আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে।

পিতামহ, আমি সেই ভয়ের দারুণ অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে রয়েছি!
পিতামহ, দাঁড়িয়ে রয়েছি,
আর চেয়ে দেখেছি, রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
মনে হয়, আমি এক অমোঘ মৃত্যুর কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার

অন্ধকারে জেগে আছে মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।

জয়গোপাল মণ্ডল

শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারী কলেজে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন পর্বে
কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র

পি ঙ্কি দাস মুখো পা ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে। মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে তাঁর বিদ্যালয় পথ চলা শুরু করেছিল। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন (all round development)। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে গান, নৃত্য, অভিনয়, অঙ্কনবিদ্যা ও খেলাধূলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কবি জানতেন খেলাধূলার মধ্য দিয়েই হবে শরীরের বিকাশ, আসবে মানসিক স্ফূর্তি। তাঁর ছোটবেলায় সেজদাদা বিভিন্ন বিদ্যার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিও রেখেছিলেন। অর্থাৎ আত্মরক্ষার কৌশল শেখা। সেটা কবির কাছে জরুরি মনে হয়েছিল। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে বিশেষত ছাত্রীরা আত্মরক্ষার শিক্ষা লাভ করুক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাই লাঠিখেলা, হা ডু ডু, জুজুৎসু প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। ২৬ মাঘ ১৩৩৪ এ লেখা একটি চিঠিতে লিখছেন, 'হাডুডু' বইখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এই খেলা পুনর্বার আমাদের দেশে প্রচার করিবার জন্য আপনারা যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হউক এই কামনা করি। আমাদের এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এ খেলার যথেষ্ট আদর আছে।"[১]

খেলা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত খেলা করে সেজন্য বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন। যারা খেলাধূলা করবে না তাদের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে বলছেন। (১৯০৪ এর ২ জুলাই) মোহিতচন্দ্রকে লিখছেন,

"আমার ... মনে হচ্ছে সকালে কোনো এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যে-সব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এই রকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রমকালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোনো অসুখ করে না, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই একজন ছেলের এক আধদিন একটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভালো নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তা হলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভালো করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দুই একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন—বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুত পদচালনা করে চলবেন— দু-চার দিন এমন করলেই রৌদ্র বৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ হিতকর।"[২]

৬ জুলাই (১৯০৪) এর চিঠিতে লিখলেন (মোহিতচন্দ্র সেনকে),

"... ছেলেদের ব্যায়াম সম্বন্ধে একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলুম। Skipping জিনিসটা অত্যন্ত ভালো। প্রত্যেক ছেলেকে একটা করে skipping rope দেবেন। বর্ষার সময় ঘরেও skip করতে পারে। সুরের সঙ্গে তালে তালে skip করাই হচ্ছে দস্তুর! কোনো এক সময়ে আপনাদের গাইয়েকে দিয়ে দ্রুত তালের গান জুড়ে দিতে পারেন, সেই সময়ে সার বেঁধে ইস্কুলের ছোটোবড়ো সমস্ত ছেলে তালে তালে skip করলে বেশ হয়।"[৩]

বিদ্যালয়ে ছেলেদের খেলা এবং খেলার সামগ্রীর জন্য কবি কী পরিমাণে উদ্বিগ্ন থাকতেন তার একটা চিত্র ধরা পড়েছে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি সেখানে লিখছেন (১৩ জুলাই ১৯১১ / ২৮ আষাঢ় ১৩১৮),

"প্রশান্ত, ছেলেদের খেলার কী করলে? মেঘ হচ্চে, বৃষ্টি পড়চে, ছেলেদের মন ছটফট করচে—ওদের হাতে কিছু ত দিতে হবে। আর কিছু খুঁজে বের করা এবং ভেবে ঠিক করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কয়েক সেট Ping Pong পাঠিয়ে দিয়ো—ওটা সব ছেলেরই খুব ভাল লাগে। মনে করেছিলুম সন্তোষের হাতে এগুলো তুমি পাঠাতে পারবে কিন্তু আজ চিঠি পাওয়া গেল সন্তোষ কলকাতা থেকে আজ বড়হি চলে যাচ্চেন। শুনেছিলুম, তুমি কোনো একটা শনিবারে এখানে আস্বে—সেইজন্যে এতদিন তোমাকে তাগিদ দিইনি— কিন্তু সময় বয়ে যাচ্চে—আষাঢ় ত শেষ হল-কেবল শ্রাবণ মাসটি হাতে আছে।"[৪]

"আশ্রমে ছাত্রদের জুজুৎসু শিক্ষার প্রতি ভীষণভাবে আগ্রহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তেনশিন ওকাকুরা ভারতে এলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তৈরি হয়। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় (১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জুজুৎসু শিক্ষার জন্য জাপান থেকে একজন শিক্ষক পাঠাতে অনুরোধ করেন। ১৯০৫ সালে কেইওও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ফুকুজাওয়া তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র জিন্নোৎসুকে সানো-কে জুজুৎসু শিক্ষক হিসেবে শান্তিনিকেতনে পাঠান। বিদ্যালয়ে তিনি সানো সান নামে পরিচিত ছিলেন।"[৫]

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ কানাডা থেকে ভারতে আসার পথে জাপানে কিছুদিন অবস্থানকালে রবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান সুনিহিকো ওওকুরাকে শান্তিনিকেতনে একজন জুজুৎসু শিক্ষক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি জুজুৎসু সংস্থা কোদোকানের প্রতিষ্ঠাতা জিগারোকোনোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেই সংস্থা থেকে শিনজো তাকাগাকিকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি আসার পর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সিংহসদনে জুডো শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরজন্য প্রথমেই দরকার মাদুর বা ম্যাট। জাপানে এই খেলার জন্য বিশেষ ধরনের মাদুর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তার অভাব। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে চারপাশে পরপর দুই স্তরে ইঁট সাজিয়ে তার ভিতর খড়,

কাপড়ের টুকরো ভরে মোটা ক্যানভাস দিয়ে সেলাই করে ম্যাট তৈরি করা হয়। জুডোর পোশাকের জন্য তাকাগাকি জাপান থেকে এক ধরনের মোটা ছিট আনিয়েছিলেন। সেই ছিট জাপানি কায়দায় সেলাই করে জুজুৎসু লড়ার পোশাক তৈরি হল। এইভাবে তাকাগাকির তত্ত্বাবধানে জুজুৎসু শিক্ষা শুরু হল।

পাঠভবনের উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের জন্য জুজুৎসু শিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে জনাপাঁচেক উৎসাহী ছাত্রী এই ক্লাসে যোগদান করে। ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত আবশ্যিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও অন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অঙ্কের শিক্ষক ওস্তাদ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সেই বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে ইচ্ছুক সকলের নির্বাচনের ভার নিয়েছিলেন। তাঁর নির্বাচনের পর অবশ্য চূড়ান্ত নির্বাচন করেছিলেন তাকাগাকি নিজে। কর্মী শিক্ষকদের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন অফিসের মনোমোহন দে, অঙ্কের প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, কাঠের কাজের নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের সকলের বলিষ্ঠ চেহারা জুজুৎসু শেখার পক্ষে উপযুক্ত ছিল। মেয়েদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন অমিতা সেন, নিবেদিতা ঘোষ, যমুনা সেন, গীতা রায় প্রমুখ। অন্যদের মধ্যে গৌরগোপাল ঘোষ, ভূপেন কর, গোঁরাচাদ বসুর কথা উল্লেখ্য। শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শেখানো হচ্ছে এই খবর পেয়ে ভারতের নানা জায়গা থেকে অনেকে এখানে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেরালা থেকে মেনন ভ্রাতৃদ্বয়, কলকাতা থেকে নির্মলকুমার বসু উল্লেখযোগ্য।

তাকাগাকির প্রচেষ্টায় জুজুৎসু শান্তিনিকেতনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে চারশোয় পৌঁছায়। ফলে সিংহসদনের বদলে গৌরপ্রাঙ্গণের মাঠে জুজুৎসু শিক্ষা চলতে থাকে। সাধারণত সপ্তাহে তিনদিন এক ঘন্টা করে জুজুৎসু শেখাতেন তাকাগাকি। জুজুৎসু লড়ার বিভিন্ন কায়দা শেখানো হতো, যেমন—'সেওই নাগে' অর্থাৎ আক্রমণকারীর পোষাকের গলার কাছের অংশ চেপে ধরে পিঠ দিয়ে তার দেহটি তুলে ফেলে সামনে আছাড় মারা অথবা 'আশি বারাই' অর্থাৎ অকস্মাৎ আক্রমণ করে বিপক্ষের খেলোয়াড়ের পায়ে পা লাগিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া ইত্যাদি।

তাকাগাকির অন্যতম ছাত্রী গীতা রায় তাঁর শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "তাকাগাকি স্বভাবে ছিলেন ঈষৎ গম্ভীর। যতক্ষণ না জুজুৎসুর কৌশলগুলি পুরোপুরি রপ্ত হত, ততক্ষণ আমাদের আটকে রাখতেন তিনি। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সমানভাবে স্নেহ করতেন তাকাগাকি। তার মধ্যে যারা জুজুৎসু অভ্যেস করত আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে, তাকাগাকি তাদের ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশি। মেয়েদের মধ্যে আমরা চারজন নিয়মিত জুজুৎসু অভ্যেস করতাম।"

শান্তিনিকেতন থেকে জুজুৎসুর দল বাইরে গিয়ে প্রশংসাও কুড়িয়ে নিয়েছিল। নিবেদিতা বসুর কথায় জানতে পারি, "বেনারসে All Asia Educational Conference থেকে একবার আহ্বান এল। শান্তিনিকেতন থেকে আমরা সকলে গেলাম। দলে ছিলেন গৌরগোপাল ঘোষ,

মেনন ভ্রাতৃদ্বয়, ভূপেন কর, গোরাচাঁদ বসু, অমিতা সেন, নিবেদিতা ঘোষ, যমুনা সেন, গীতা রায় ও আর কয়েকজন। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন—তাকাগাকি, তাঁর পত্নী মাকি হোসি। ছেলেদের মধ্যে গৌরগোপাল ঘোষ ও মেয়েদের দলে মাকি হোসি অধিনায়কত্ব করেন।"

মাকি হোসি তাঁর 'ভারত ভ্রমণ কাহিনী' তে এসম্পর্কে লিখছেন,

"আমরা ১১ জনের বিশ্বভারতীর জুজুৎসু দল বেনারস স্টেশনে পৌঁছলাম ২৭ তারিখ। আমি ও চারজন ছাত্রী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হস্টেলে উঠলাম।... ছেলেদের হস্টেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত জুজুৎসু প্র্যাকটিস হল। ২৮ শে ডিসেম্বর শিক্ষা সম্মেলনে সকাল আটটা থেকে জুজুৎসু প্রদর্শন শুরু হল। প্রথমে তাকাগাকি ইংরেজিতে বললেন। তারপর জাপানী ভাষায় জুজুৎসুর পরিভাষা অনুযায়ী জুজুৎসু খেলা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের মাঝখানে পাতা ম্যাটের উপর জুজুৎসু প্রদর্শনী, কাছে ও দূরে বসা হাজার হাজার লোকের আনন্দ ও প্রশংসার বিষয় হয়ে উঠল।... রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বিশ্বভারতীর দলের এই জুজুৎসু অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল, বিশেষত মেয়েদের অংশগ্রহণ সেই অনুষ্ঠানের গৌরব বাড়িয়েছিল বহুগুণে। অনুষ্ঠানের আগে তাকাগাকি ও তাঁর দলের সকলের উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল চোখেমুখে। দু'ঘণ্টা ধরে প্রদর্শনী চলার পর ছাত্রছাত্রীদের সকলকেই যেন খুব খুশি বলে মনে হল।"

বেনারসে এই জুজুৎসু প্রদর্শনীর কথা বলতে গিয়ে গোরাচাঁদ বসু বলেন, "আমরা ১১ জন গিয়েছিলাম সেবারে। পরিবহন বা রাস্তাঘাটের অন্য সব খরচই গুরুদেব দিয়েছিলেন। বেনারসে পনের মিনিট শুধু জুজুৎসুর কিছু কৌশল দেখানো হল। এরপর জোড়ায় জোড়ায় fight হল। একেবারে শেষে ছিল free fight। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে জমে উঠল কয়েক হাজার লোক।" নিবেদিতা বসু বলেন, "ঐখানে আমরা প্রচুর প্রশংসা পেয়েছি। আমাদের মেয়েদের আত্মরক্ষা শিক্ষা দেখে দর্শকরা সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন। প্রথম যখন কয়েকজন মেয়ে-আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম জুজুৎসু শিখতে, হস্টেল সুপারিটেন্ডেন্ট বাধা দিয়েছিলেন প্রবলভাবে। বেনারসে ওরকম সাফল্যের পর সব চিন্তা দূর হয়েছিল।"

১৯৩১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে তাকাগাকি ও বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা জুজুৎসু প্রদর্শন করেছিলেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, Programme of Jiu-jitsu demonstration by Santiniketan boys and girls-New Empire Theatre– 6 p.m.–16 March 1931 (5pages). Printed by Jagadananda Roy– at the Santiniketan Press.[৬] মঞ্চে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকাগাকিকে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কিন্তু দর্শকদের কোনো ভিড় ছিল না। কবির আশা ছিল বাঙালি ছেলেমেয়েরা আত্মরক্ষা ও দুর্বৃত্তদমনের জন্য এই কৌশল গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে। কিন্তু তাঁর সেই আশা ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞাপন দিয়ে, বৃত্তি ঘোষণা করেও সাধারণের মধ্যে

উৎসাহের সঞ্চার করা যায় নি। জুজুৎসু দেখতে ভিড় না হলেও 'নবীন' গীতিনাট্য অভিনয়ে বেশ ভিড় হয়েছিল। বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকাগাকিকে বিদায় দিতে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েছিলেন।[৭]

সত্যরঞ্জন বসু তাঁর 'আশ্রম-স্মৃতি'তে বিভিন্ন খেলার কথা জানাচ্ছেন। তিনি বলছেন, "পাঠাভ্যাসের পাশে তৈরী থাকতো খেলার সরঞ্জাম। নিয়মিত সময়ের পূর্বে যারা পাঠ সমাপন করতে পারতো—তাদের সেই সময়ে খেলার সুযোগ হতো। ফুটবল তো ছিলই। আর ছিল বিলাতী খেলা 'ক্রোকে' (Croquet)। এই খেলার সরঞ্জাম কাঠের বড় বল, তাকে ঠুকে ঠুকে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে—খিলানের আকারে মাটিতে বসানো কয়েকটি লোহার খুঁটির ভিতর দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে কে আগে পৌঁছুতে পারে। লোহার খুঁটির গায়ে বল লাগেই তাকে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে। ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই কে ঠিকভাবে নিজের বলটিকে নির্দিষ্ট সীমানায় ঠুকে নিতে পারে- তার জন্য আমাদের অভিনিবেশই বা ছিল কত! এই খেলার সময়েই hoop ও mallet শব্দ দুটি শিখেছিলাম মনে আছে।

শীতকালে কুয়াসার মধ্যে আর এক খেলা ছিল। তাকে জাপানী খেলা বলেই জানতাম। মুখোমুখি দুই সারি ছেলে দাঁড়াতো। কুয়াসার ভেতর একজন দৌড়াল—তাকে খুঁজে ধরবার জন্য অন্য লাইনের আর একজন তার পেছন নিল। এইভাবে একের পর এক। প্রায়ই দেখা যেত কুয়াসা কমে গেলে- অনেকেই উল্টো দিকে তার প্রতিপক্ষের জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন হাসির হুল্লোড় বয়ে চলতো।

"মিঃ কেল্কার নামে শিক্ষকশ্রেণীর এক মারাঠী যুবক ছিলেন কিছুকাল। তিনি আমাদের ক্রিকেট খেলার পত্তন করে যান। কী জোরে বল করতেন। আমার তো বুড়ো আঙ্গুলের নখই উঠে গিয়েছিল। তখন তো আমরা এই খেলায় গ্লাভসইত্যাদি পরা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ—কিছু ছিলও না সেখানে।"[৮]

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় খেলাধূলায় কতটা উন্নত ছিল তার খবর পাওয়া যায় শান্তিনিকেতন পত্রিকার পাতায়। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় বাধ্যতামূলক ভাবে খেলার খবর থাকতো। বিদ্যালয়ের ফুটবল দলটি ছিল খুব শক্তিশালী। মোহনবাগানের মতো দল মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে খেলে যেত। বাইরের বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় আশ্রমের দল নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো এবং সাফল্যলাভ করতো। এছাড়া অ্যাথলেটিকস এও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন পুরস্কার নিয়ে আসতো।"[৯]

খেলা নিয়ে বিভিন্ন মজার কাণ্ডও হয়েছে। একবার ছেলেদের শখ হল তারা পোলো খেলবে। পোলো খেলার জন্য দরকার অনেকগুলি তাজা ঘোড়া। আশ্রমে ঘোড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে! অগত্যা ঘোড়ার অভাবে গাধার পিঠে চেপেই খেলার কথা ভাবা হল। বোলপুর থেকে ধোপারা গাধার পিঠে কাপড় চাপিয়ে ভুবনডাঙার বাঁধে আসতো কাপড় কাচতে। তাদের কাছ থেকে এক দঙ্গল গাধা জোগাড় করে খেলার আয়োজন করা

হল। এখন দরকার একজন রেফারির। এরজন্য বলা হল শিক্ষক গুরুদয়াল মল্লিককে। তিনি অতি উৎসাহে ছেলেদের সঙ্গে মাঠে নেমে গাধার পিঠে চেপে রেফারির ভূমিকা পালন করলেন।[১০]

ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কোনো পাঠ্যক্রম তৈরি করতে পারেননি। কিন্তু শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার রূপায়ণে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠি থেকে, বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথা, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কথা, শান্তিনিকেতন পত্রিকার পাতা থেকে সেই সাক্ষ্য আমরা পেয়ে থাকি। কবির ইস্কুল শুধুমাত্র কবির খেয়াল ছিল না। ছিল না তাঁর অবসর বিনোদন। সেখানে তিনি নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা ও শরীরচর্চার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মেয়েদের শরীরচর্চার প্রতিও তাঁর কীরকম নজর ছিল সেটা আমাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়। আসলে ছোটবেলায় তিনি বাড়িতে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে শারীরিক কসরতের গুরুত্ব বুঝেছিলেন। সেই ব্যবস্থারই সফল রূপায়ন ঘটিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে।

তথ্যসূত্র :

১. এই চিঠিটির কোনো উৎস কাজুও আজুমার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গৌরচন্দ্র সাহার রবীন্দ্রপত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী গ্রন্থেও এই দিনে রবীন্দ্রনাথের চিঠির কোনো উল্লেখ নেই। ফলে তিনি কাকে লিখছেন, কোন বই সম্পর্কে লিখছেন তার বিশদ তথ্য আমরা পাইনি। উজ্জ্বল সূর্য, কাজুও আজুমা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ১।

২. শান্তিনিকেত বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ, পত্র ও প্রবন্ধ সংকলন, অনাথনাথ দাস কর্তৃক সংগ্রথিত ও সম্পাদিত, শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ৭ পৌষ, ১৩৮৯, পৃ ১০৫-১০৬।

৩. তদেব, পৃ ১০৭।

৪. প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত: রবীন্দ্রনাথ — প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পত্রবিনিময়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ৩৫।

৫. উজ্জ্বল সূর্য, কাজুও আজুমা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ২।

৬. প্রশান্তকুমার পাল, রবীন্দ্রজীবনী ৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৪৩৪-৪৩৫।

৭. উজ্জ্বল সূর্য, পৃ ১-১৪।

৮. সত্যরঞ্জন বসু, আশ্রম-স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পৃ ২৫৬।

৯. বিশদ বিবরণের জন্য সুপ্তি মিত্র, সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। শান্তিনিকেতন, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

১০. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শান্তিনিকেতনের এক যুগ. বিশ্বভারতী, কলকাতা, কার্তিক ১৪০৯, পৃ ২০৭।

মৌ সু মী ম ন্ড ল

রবীন্দ্র ভাবনায় অমঙ্গলের সমস্যা থেকে মানুষের অভীষ্টের প্রকাশ

"তোমারও অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথাও বিচ্ছেদ নাই" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগ যুগ ধরে অর্থাৎ সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন মানুষের মনে জেগে উঠেছে, ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় সত্তা হন তাহলে ঈশ্বর সৃষ্ট জগতে এত অমঙ্গল কেন? এই প্রশ্নটি মানুষকে ভাবিয়েছে এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়ে তুলেছে। জগতে অমঙ্গলের উপস্থিতি সর্বজনীন সত্য। মঙ্গল থাকলে অমঙ্গল থাকবেই, যেমনটা দুঃখ থাকলে সুখ থাকে সেই অনুরূপ। একটিকে ছাড়া অন্যটির উপস্থিতি কল্পনা করা যায় না। রবীন্দ্র দর্শনে এই অমঙ্গল সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের পক্ষে কখনো এই অমঙ্গলকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মঙ্গল এবং অমঙ্গল একে অপরের পরিপূরক। তাহলে এখন প্রশ্ন হয় যে, অমঙ্গল কি? এর উত্তরে বলা যায় যা মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে তাই হলো অমঙ্গল। মানুষের জীবনে সমাজে এই অমঙ্গল একটি বিপর্যয়। এটাকে আমরা নেতিবাচক দিক থেকে বর্ণনা করে থাকি। কখনো সদর্থক ভাবে বর্ণনা করতে পারি না। প্রাকৃতিক দুর্জয়, রোগ, শোক, দুর্ঘটনা এগুলোকে আমরা অমঙ্গল মনে করে থাকি। অনেক সময় যখন পুজো করি তখন যদি হঠাৎ করে প্রদীপ নিভে যায় সে সময় আমাদের অনেকের মনে হয় যে প্রদীপ নিভে যাওয়া হল অমঙ্গল। কিন্তু এটি আমাদের মনের ভুল। অনেক কারণেই প্রদীপ নিভে যেতে পারে। তাই বলে এটিকে নেতিবাচক হিসেবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। অমঙ্গল সাধারণত মানুষের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও এই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন যখন তিনি মানুষের অভীষ্টের কথা বলেছেন এবং অমঙ্গল সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি অমঙ্গলের সমস্যাকে আমাদের জীবন থেকে অস্বীকার করতে পারেননি। কারণ তিনি বলেন জীবন আছে বলেই মঙ্গল-অমঙ্গল, সুখ-দুঃখ, হাসি- কান্না আছে। সেহেতু তিনি কখনো অমঙ্গলকে নেতিবাচক হিসেবে দেখেননি। কারণ এটি তো আমাদের সৃষ্টির মধ্যেই আছে। যিনি স্রষ্টা তিনি অমঙ্গল সৃষ্টি করেছেন, তাই আমরা একে অস্বীকার করতে পারি না। অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে একবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র ভাবনায় ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটেছে। প্রশ্ন হল, এর সৃষ্টিকর্তা কে? সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

ঈশ্বর সর্ব মঙ্গলময়, তিনি আবার সর্বশক্তিমান। তিনি যদি মঙ্গলময় হন তাহলে অমঙ্গল কেন তিনি সৃষ্টি করলেন, আবার তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে তিনি অমঙ্গলের বিনাশ করবেন। কিন্তু অমঙ্গল হল বাস্তবিক ঘটনা। এটি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। সমগ্র

বিশ্ব যখন ঈশ্বরের সৃষ্টি তখন এই অমঙ্গল ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। তাই ঈশ্বর একই সঙ্গে মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হতে পারেন না, কারণ তিনি মঙ্গলময় সত্তা হলে মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করবেন এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে অমঙ্গলকে বিনাশ করার ইচ্ছা করবেন। এই সমস্ত অমঙ্গল বা পাপ সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। সেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হলে অমঙ্গলকে স্বীকার করতে হবে এবং অমঙ্গল কে স্বীকার করতে হলে ঈশ্বরকেও স্বীকার করতে হবে। এই সৃষ্টিকর্তা এবং তার সৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্র দর্শন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র দর্শনে এমন কোন কিছু অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়নি। সর্বোপরি বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতে অমঙ্গলকে দেখেননি। তাঁর মতে অমঙ্গল সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট, যেটিকে আমরা লঙ্ঘন করতে পারবো না। তিনি মনে করতেন যে কোন সৃষ্টি- সৃষ্টি হিসেবে অসম্পূর্ণ হতে পারে না। আমরা সাধারণ মানুষেরা এই অমঙ্গলকে এমন ভাবে চিন্তা করি যার দ্বারা সত্যি সত্যি একে অমঙ্গল মনে করি। যদি আমরা এইভাবে অমঙ্গল কে চিন্তা করি তাহলে কখনোই এই অমঙ্গলকে কেন্দ্র করে নেতিবাচক ভাবনা মন থেকে কখনোই বিদায় দিতে পারব না। এটি সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট, তাই এটিকে বাস্তব হিসেবে দেখতে হবে। মনের মধ্যে সমস্ত কুসংস্কার যার থেকে অমঙ্গলের সৃষ্টি সে কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে হবে, তবেই অমঙ্গলকে ইতিবাচক রূপে দেখা যাবে। অমঙ্গল কোন চরম ঘটনা নয়, এটি একটি পর্যায় বাচক। তাই সাধারণভাবে অমঙ্গল-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাহলে প্রশ্ন হলো, অমঙ্গল আসে কোথা থেকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় অমঙ্গল বিষয়ে দু' ধরণের মত দেখা যায়। এক পক্ষ যারা অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তাদের মতে অমঙ্গল বা দুঃখ বা পাপ এই সমস্ত আমাদের ভ্রান্তি বিশেষ। অপরপক্ষ মঙ্গলের অস্তিত্বকে মানলেও তারা অমঙ্গলের কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে দায় থেকে মুক্ত করে থাকেন। দার্শনিক স্পিনোজার মতে, ইহজগতে বাস্তবিক ভালো বা মন্দ বলে কিছুই নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের কাছে ভ্রান্ত বস্তু যেগুলি আমাদের মনগড়া সেগুলি বাস্তব বলে মনে হয়।

স্পিনোজার মতে, যা ঈশ্বর তাই দ্রব্য তাই প্রকৃতি। তিনি মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালো-মন্দ, সুখ- দুঃখের অতীত। তাহলে প্রশ্ন হয় অমঙ্গল কি আসলে সত্য? এই অমঙ্গল কি আপেক্ষিক? আমরা অমঙ্গলের জন্য কেন এত দুঃখ কষ্টে ভুগি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমঙ্গল এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অনস্বীকার্য। আমাদেরকে মানতে হবে আমরা কখনোই পূর্ণ নই, জীবনে ওঠা পড়ার মত মঙ্গল-অমঙ্গল রয়েছে। তাই অমঙ্গলকে মেনে নিয়েই আমাদেরকে চলতে হবে কিন্তু এটাকে কখনো নেতিবাচক দিক থেকে দেখা যাবে না। এমনকি অমঙ্গলের বিরুদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে বা যাকে অসম্পূর্ণতা বলি সেই অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণতার বিরোধী রূপে দেখা উচিত নয়। বরঞ্চ এইভাবে বিরুদ্ধ রূপে দেখার জন্যই আমরা অমঙ্গলকে মন্দ রূপে দেখি এবং ভাবি অর্থাৎ আমরা এটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছি। আমরা অমঙ্গলকে এতটাই চরমতম

রূপে দেখি যে তাকে মনে হয় এই চরম সত্তার কোন শেষ নেই। এই অমঙ্গল সুপ্ত অবস্থায় মনের মধ্যে আছে। তাই এটা কখনো আংশিকভাবে দেখা যায় না সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেরূপ সত্যকে দেখার যে দৃষ্টিকোণ তা হল বস্তুর বিষয়কে বা ব্যক্তিকে সমগ্রের সাথে যুক্ত করে দেখা। সুতরাং আমাদের দৃষ্টিকোণকে বদলাতে হবে, তবেই প্রকৃতভাবে মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণাকে মানুষ নিজ আঙ্গিকে দেখতে শিখবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মানুষের এই অসংগতির মূলে রয়েছে তার সামগ্রিক জীবন বোধের অভাব। জীবনের অভীষ্টে পৌঁছাতে হলে অথবা পরমাত্মায় পৌঁছাতে হলে মানুষকে তার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিকৃত ভাবনা, মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি অসঙ্গতি, বিরুদ্ধতা ইত্যাদি গুলিকে বদলাতে হবে। অমঙ্গলের যদি একটি উপমা দেওয়া যায় তাহলে আরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছোটবেলায় যখন শিশু যখন হাঁটতে চেষ্টা করে কিন্তু সে বারবার পড়ে যায় তখন তার এই পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া এই সমস্ত কি আমরা যদি নেতিবাচক রূপে না নিয়ে যদি সেটাকে ইতিবাচক রূপে গ্রহণ করি তাহলে সেটি আমাদের কাছে আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে— কারণ পড়ে যাওয়া অর্থাৎ যাকে বলা যায় ব্যর্থতা এই ব্যর্থতা থেকেই আসে সফলতা। তাই শিশুটি যতবার পড়ে যাবে ততবারই মনে করতে হবে সে কোন মুহূর্তেই হাঁটতে শিখবে। মঙ্গল-অমঙ্গলকেও এই দৃষ্টিতে আমাদেরকে ভাবতে হবে। তাহলে আর অমঙ্গলকে অমঙ্গল বলে মনে হবে না।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে, অমঙ্গল তখনই প্রকৃত অমঙ্গল হয়ে ওঠে যখন আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ যে দৃষ্টিকোণ, যে আমিত্ববোধ বা আমিত্বকেন্দ্রিকতা থেকে অমঙ্গলকে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু যেই মুহূর্তে এই আমিত্বকেন্দ্রিকতা পরিবর্তন করে ভাবার চেষ্টা করি তাহলে অমঙ্গল যাকে অসম্পূর্ণতা বলি সেই অমঙ্গল আর মানুষের কাছে প্রকৃত অমঙ্গল হিসাবে প্রকাশ পায় না, কারণ এটি একটি বাস্তব বিষয়। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং আমি কেন্দ্রীকতা পরিবর্তন করতে হবে, এমনকি অমঙ্গল কে চরমতম রূপে সিদ্ধান্ত নেওয়া পরিবর্তিত করতে হবে, ফলস্বরূপ অমঙ্গলকে আত্মচেতনায় উন্নীত করতে হবে, ব্যক্তি আসল 'আমি'র স্বরূপ হল বিশ্ব মানব। যখনই সংকীর্ণ আমিত্ববোধকে বিশ্বমানবতায় বা পরমাত্মায় নিয়ে যাওয়া যাবে তখন মানুষের সংকীর্ণ দুঃখ, বেদনা, অমঙ্গল দূরীভূত হবে। মানুষ নিজের আঙ্গিকে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুকে ভাবতে শিখবে, তখনই মানুষের পরমাত্মায় প্রকাশ বা অভীষ্টের প্রকাশ ঘটবে অর্থাৎ বলা যায় সসীম থেকে অসীমের দিকে প্রকাশ।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের এই অভীষ্টের (Human Destiny) প্রকাশ কী? আমরা জানি, দুঃখ, সুখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, আবেগ এই সমস্ত কিছু নিয়েই রবীন্দ্র দর্শন। রবীন্দ্র দর্শনে মানুষ বিশেষ স্থান লাভ করেছে। মানুষের মধ্যে যখন দেবত্বের উপলব্ধি ঘটে তখন মানুষ ঈশ্বরের সত্তায় উন্নীত হয়। মানুষ যখনই সীমিত সত্তা থেকে বেরিয়ে আসে তখনই সে অসীমতায় পৌঁছায়। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অভীষ্টের প্রকাশ হল তার একত্বের

অনুভূতি, দিব্য উপলব্ধি, দেবত্বের বা ঈশ্বরের উপলব্ধি এবং সর্বোপরি পরমাত্মার বা বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি। প্রশ্ন হল, এই উপলব্ধি কী আগের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন? এটা কি নঞর্থক অবস্থা? ব্যক্তি কি এই অবস্থার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে? এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বলা যায় যে, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু এটা সত্য যে একটি মুদ্রার যেমন দুটি দিক ঠিক সে রকমই মানুষের জীবনে ও সুখ- দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল রয়েছে, জন্ম-মৃত্যু রয়েছে। আমাদের সমস্ত কিছুর পর যেমন মৃত্যু একমাত্র পরিসমাপ্তি ভারতীয় দর্শনে যারা জড়বাদী তারা মনে করেন মৃত্যুতেই মানুষের শেষ, এরপর কোন সত্তা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, আবার মৃত্যুকে নেতিবাচক রূপে স্বীকার করা যায় না। এটি একটি সদর্থক দিক এবং বাস্তব বিষয়। ঠিক সেইরূপ অমঙ্গল দুঃখের স্বরূপ, এটিও একটি বাস্তবিক বিষয়। মানুষ যেমন মৃত্যুকে ভয় পায় ঠিক সেই রূপ অমঙ্গল কেউ ভয় পায়, এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ফল। অমঙ্গল বা মৃত্যুকে যদি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে এটির মধ্যে যে বাস্তবতা আছে সেটাকে মানুষ খুঁজে পাবে। তখন তার কাছে অমঙ্গল বা মৃত্যু কোনটির নাস্তিকত্ব প্রকাশ পাবে না।

মানুষ যখন সসীম সত্তা থেকে অসীমতায় বিচরণ করে তখন সেই অসীমতা মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে, তার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তার আমিত্ববোধ পরিবর্তন হয়। এই অসীমতা মানুষকে এনে দিয়েছে গতিশীলতা, সদা বিকশিত হওয়ার প্রবণতা, মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে কোনটা বাস্তব কোনটা অবাস্তব, মানুষের মনে ঈশ্বরের উপলব্ধি ঘটেছে। মানুষ অভীষ্টে অর্থাৎ অসীমতায় পৌঁছায় তার পূর্বের কর্মের অবস্থা এবং নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে। এটি মানুষের ব্যক্তি সত্তার বিকাশ অর্থাৎ সসীমাতা (finite expect) থেকে অসীমতায় (infinite expect) এবং তখনই মানুষ সক্রিয় হয়ে ওঠে, বাস্তবিক হয়ে ওঠে, বিশ্বজনীনতায় বা অভীষ্টে পৌঁছে। মানুষের মধ্যে যে স্বাধীনতা আছে, যে অন্তরের শক্তি আছে সেই শক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষ আধ্যাত্মিক পটভূমিকাতে নিজেকে উন্নত করতে পারে। মানুষ আধ্যাত্মিক বিবর্তনে উপলব্ধি করতে পারবে সত্য,শিব এবং সুন্দরকে। এগুলো সব কিছুই রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। এটি মানুষের আসল প্রকৃতি। তার কাছে 'অভীষ্ট' হল একটি উপলব্ধি, পরিপূর্ণ মুক্তি, দেবত্বের উপলব্ধি। মানুষ বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায় এই মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াই হল মানুষের অভীষ্টের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে তাঁর উপলব্ধির কথা বলেছিলেন যে, দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাণের কল্লোল তিনি নিবিড় ভাবে অনুভব করেছিলেন একটি অনবচ্ছিন্ন ধারা জীবনের সমস্ত কিছু মিলিয়ে খন্ড-অখন্ড লীলা চলছে। সেই লীলা হলো সুখ-দুঃখের খন্ড প্রকাশ যা প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় বয়ে চলেছে

এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি নাটকীয়তা দেখেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে সুখ-দুঃখে এতদিন তিনি বিচলিত হয়েছিলেন সেই সমস্ত সুখ-দুঃখ লীলার তিনি নিত্য সাক্ষী হয়েছিলেন এবং তিনি পরম আনন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় এই অমঙ্গল এবং দুঃখ সমস্ত কিছুকে বাস্তবে এরকম খেলার আঙ্গিকে যদি আমরা বয়ে নিয়ে যাই তাহলে কখনোই অমঙ্গল প্রকৃত অমঙ্গল হিসাবে মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে না।

ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে অভীষ্টে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত হবে। মানুষের যেটি অসীমতার দিক সেটি হল মানুষ ক্রমাগত তার নিজের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের মধ্যে রয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য, অসীমতার ভাবনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। এই সমস্ত কিছুর প্রকাশ তখনই ঘটে যখন আমরা কোন ভালো কাজ করতে চাই এবং তার জন্য আমাদের দুঃখ-কষ্ট পেতে হতে পারে, জয়-পরাজয় আসতে পারে, সুখ-দুঃখ আসতে পারে, আমরা সমস্ত কিছুর প্রতি ত্যাগ স্বীকার করতে অভ্যস্ত থাকি তখন আমাদের মধ্যে এই ঈশ্বরের উপলব্ধি অর্থাৎ মনের মধ্যে দেবত্বের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণতার বিপরীত হলো শূন্যতা কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নয়, বিরুদ্ধে নয় বরং সেটি পূর্ণতারই বিকাশ। মানুষ যদি প্রবৃত্তির দিক থেকে অমঙ্গলকে দেখে, চিন্তা করে তাহলে সেটি প্রকৃত অমঙ্গল তার কাছে মনে হয়। কিন্তু যদি সে নিষ্কাম কর্মের পথ ধরে অমঙ্গলের চিন্তা করে বা অসম্পূর্ণতার চিন্তা করে তাহলে সেই অমঙ্গল তখন আর প্রকৃত অমঙ্গল হয়ে ওঠে না। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের ধারণা একটি দৃষ্টিগত ধারণা। মানুষ তার সীমানার বাইরে চলে গেলে তার মধ্যে দেবত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, অভীষ্টের দিকে তার যাত্রা ঘটে। নিষ্কাম কর্মের যাত্রাপথে মঙ্গল অমঙ্গলের সমাধান সম্ভব অর্থাৎ মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অমঙ্গল যার বিপরীত দিক মঙ্গল। সসীমতার দিক থেকে মঙ্গল প্রকৃত অমঙ্গল হয়ে ওঠে কিন্তু যখনই অসীমতার সৃষ্টি হয় তখন অমঙ্গল বাস্তবিক রূপ পায়। অসীমতায় বিচরণ করার ফলে মানুষ প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে শেখে। এই সত্যের আদর্শ আছে আমাদের মননে, চিন্তায়, এমনকি মানব অস্তিতে কিন্তু শুধু এই সত্যকে মানুষকে সঠিক সময়ে, সঠিক চেতনায় প্রকাশ করার অভাব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে অপূর্ণতা সব দিক থেকে আপন নয় যার আদর্শের জন্য পূর্ণতা আছে তাকে নিরন্তর উপলব্ধি করে চলতে হয়। এভাবে অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণের দিকে, অসত্যকে সত্যের দিকে উপলব্ধি করা বুদ্ধির আসল কাজ। আমাদের দেহকে আমরা যদি অসীমের একটি দিক রুপে দেখি তাহলে আমাদের দেহ হয়ে উঠতে পারে অভীষ্ট উপলব্ধির একটি অঙ্গ। আমাদের ইচ্ছাশক্তি অমঙ্গল কে অতিক্রম করে ঘরে-বাইরে ক্রমাগত পূর্ণতা অর্জন করে চলেছে-এটি সর্বত্র মানুষের অভীষ্টের দিকে প্রকাশ।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। দেবনাথ, দীরেন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর নিখিলেশ, ভারতীয় দর্শন, স্বদেশ,বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা ৭০০০০৬।

২। LAL– BASANT KUMAR– CONTEMPORARY INDIAN PHILOSOPHY– MOTILAL BANARASIDAS PUBLISHERS PVT. LTD– DELHI-110 028 (India).

৩। রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৫, তথ্য অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০০১২।

৪। সেনগুপ্ত, শংকর(অনুবাদ), দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,৩৭এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প রে শ চ ন্দ্র মা হা ত

কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাচর্চায় বিচ্ছিন্নতাবোধের পরাকাষ্ঠা

আধুনিক যুগের তিরিশ দশকের অন্যতম কবি হলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর কবিতায় বিচ্ছিন্নতাবোধের উপস্থিতি বেশ উজ্জ্বলভাবে প্রকট রয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ কী? এর উত্তর আমরা দেখতে পাব কবির লেখা আত্মজীবনী ও বিভিন্ন চিঠিপত্রে। আমি এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মধ্যে কীভাবে এবং কতটা পরিমাণে বিচ্ছিন্নতাবোধ লক্ষ করা যায়, সেই দিকের প্রতি আমার লক্ষ্য।

কবি বুদ্ধদেব বসু জীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই বুদ্ধিমান সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রচুর পরিমাণে তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। আর তার প্রভাব তাঁর জীবনের প্রথম দিককার কবিতার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তাঁর প্রথম কবি প্রতিভার সার্থকরূপ দেখা যায় 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে। এই কবিতার মধ্যে কোনো কোনো কবিতায় পারিপার্শ্বিক কদর্যতা ও কুৎসিত সম্পর্কে সচেতন থাকলেও বেশির ভাগ কবিতাতেই সেই বিচিন্নতাবোধের আভাস সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যায়িত। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় কদর্যতা সম্পর্কে সচেতন কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় —

> "আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
> আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
> সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
> হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গণ।"[১]

উদ্ধৃত কবিতায় ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশিত। এখানে তিনি দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। এই মুক্তির স্বাদ অল্প সংখ্যক কবিতায় ধরা পড়লেও অধিকাংশ কবিতায় কবির মধ্যে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্নতাবোধের পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে। কবির জীবন অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্তে আক্রান্ত হয়েছে, ফলে বিচ্ছিন্নতাবোধের দহন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সময় কালের প্রবাহে 'বিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতাবোধের অসহায় শিকার' — তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের চরম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে তাঁর আত্মজৈবনিক কবিতা 'কোন বন্ধুর প্রতি' কবিতায়। তাই আমি এই প্রসঙ্গে সেই কবিতাটি পুরো উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে ব্যর্থ হলাম —

> "জীবিকার নিরানন্দ অন্বেষণে ঘুরি রাজপথে।
> মন্থর, মসৃণ ট্রামে, ক্ষীপ্রগতি কিন্তু উৎকেন্দ্রিক
> বাস-এ, কিংবা (তাপমান শতাধিক!) রুষ্ট পদাতিক।
> বহু চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো; এবার কি হবে কেল্লা ফতে?

ঘুরবে কি চাকা? বহুবার প্রবৃত্তির প্রিয় ব্রতে
ভ্রষ্ট হ'য়ে, প্রতিভারে পণ্য ক'রে ঘৃণ্য ব্যবসার
ব্যভিচারে তবু, তবু মেটে না আক্ষেপ, অবসর
জোটে না ক্ষণিক; অবরুদ্ধ প্রয়োজনে।
ব্রত হতে
মুক্তি চাই, বিবেক করে না ক্ষমা। বিবেক? অথবা
অক্ষমের ছদ্মবেশী ভয়? গূঢ় যারা, ক্রূর যারা,
হিংস্র লোভে অকুণ্ঠলুণ্ঠনকারী, তারাই তো জয়ী।
তুমি, আমি পরাজিত ... ক্রীতদাস। কল্পনা- আশ্রয়ী
কবি শুধু। ... তবু আত্মরক্ষা ইষ্ট। শিল্পের অমরা
অগত্যা প্রত্যয়। আর পরস্পরে বিষণ্ণ বাহবা।"[২]

এ এক অসাধারণ বিচ্ছিন্নতাবোধের কবিতা। তিরিশ দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ মানসিকতার প্রকাশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রতিভাত কবি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাচর্বনের মধ্য দিয়ে। বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও সেই ভাবনার স্ফুরণ দেখা যায় না। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা বিপর্যস্ত সেই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছেন কবি। ফলত তাঁর সত্তা আজ 'রাজ্যচ্যুত' ও 'নির্বাসিত'। সেই সত্তার মধ্যে আজ দেখা যাচ্ছে 'অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস'। কবির হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া করুন আর্তনাদের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় অন্যতম কবিতা 'অন্যপ্রভু' শীর্ষক কবিতায়। সেখানে কবিকে বলতে শুনি :

"এ-স্বরাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি বঞ্চিত শুধু কি
আমি? ... আমি কবি! ... শুধু আমি
রাজ্যচ্যুত ... নির্বাসিত? ... অন্ন, শুধু প্রত্যহের অন্ন দিয়ে
আমার রাজত্ব নিলে কেড়ে? শুধু আমি প্রতি মুহূর্তের ...
অস্তিত্বের অস্বস্তির দাস? ... সত্যি তা-ই? না কি আমি, কবি-আমি,
কোলের কুকুর কিংবা জুয়োর ঘোড়ার মতো, সব,
সব স্বত্ব হারায়েছি অন্ন, হীন প্রভু মেনে নিয়ে।"[৩]

'নদী তুমি নটী' কবিতায় দেখি কবির বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে মুক্তির জন্য সকাতরে প্রার্থনা। মুক্তির পাশাপাশি কবির পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্ত হয়েছে সেই কবিতার শেষের দিকের কয়েকটি পঙক্তিতে :

"হে নর্তকী
নাও তুমি আমার স্বপ্নের স্পর্শ,
দাও মোরে তোমার কম্পন-কণা।
তোমার অঙ্গের রঙ্গে, তরঙ্গের শাণিত আভায়

দীর্ণ করো আমার পাষাণ-পুঞ্জ,
আমার প্রাণের স্তব্ধ আদিম পাহাড়ে
মূর্ত হোক তোমার পূর্ণতা।"[৪]

কবির আরেক উল্লেখযোগ্য কবিতার নাম 'বৃষ্টি', সেখানেও কবির সেই একই প্রার্থনা লক্ষ করা গেছে। মুক্তি পেতে হবে এই বিচ্ছিন্নতা বোধের নির্মম দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে। আর এই মুক্তি দেওয়া সম্ভব বৃষ্টির মধ্য দিয়ে:

"এসো মগ্ন কল্পনার মূলে, এসো তুমি সত্তার শিকড়ে,
মুক্ত করো সৃষ্টির উদ্দাম বীজ,
ছিন্ন করো স্তব্ধতার পাষাণ-শৃঙ্খল।
তোমার ঝঞ্ঝার স্বরে শূন্যতার কুহরে-কুহরে
জন্মের প্রচণ্ড মন্ত্র উচ্চারিত হোক;
ভেসে যাক স্খলিত পাহাড়
বিগলিত বস্তুর বন্যায়।"[৫]

উপরের উদ্ধৃত দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে কবিমনের যে মুক্তির অভিলাষী প্রকাশিত হয়েছে, সেই ভাবনার কথা শোনা যায় 'Ode to the West Wind"-এ 'West Wind'-কে লক্ষ করে শেলীর কবিহৃদয়ে :

"Oh– lift me as a wave– a leaf– a cloud œ
I fall upon the throns of life-I bleed–
A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee–tameless and swift– and proud.
Make me thy lyre– even as the forest is–
What if my leaves are falling like its own–
Be thou me– impetuous one–
Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken a new birth–
And– by the incantation of this verse–
Scatter– as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks– my words among mankind!"[৬]

প্রতিদিনের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ক্লান্তিবোধ ও গ্লানিকর উপলব্ধি কবির বিচ্ছিন্নতাবোধকে করে তুলেছে আর তীব্র থেকে তীব্রতর, গভীর থেকে গভীরতর, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। কবির হৃদয় গহ্বরে এই ধরনের জোয়ার বার বার উত্থিত হয়েছে।

কবির জীবনে ঘটে যাওয়া ছোটো ছোটো, মাঝারি এমনকি কয়েকটি বড় ঘটনাও এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে করে তুলেছে আরও তীব্রতর, করে তুলেছে আরও ব্যাপতর। এই ছোটো ছোটো ঘটনায় বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টির উৎসমূল। কারণ :

"সত্য, শিব ও সুন্দরে ঢাকি দীর্ণ জীবন, জীবনে-মরণ,
... ...
কেননা জীবন কেবলই জীবনধারণ,
জীবিকাই, হায়, জীবন।"[৭]

কবি বুদ্ধদেব বসুর এই চরণগুলি রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা " The world is too much with us"-এর কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

"The world is too much with us— late and soon–
Getting and spending– we lay waste our powers
Little we see in Nature that is ours—
We have given our hearts away– a sordid boon !"[৮]

অনন্য প্রতিভাধর কবি বুদ্ধদেব বসুর এই বিচ্ছিন্নতাবোধ নানা মাত্রায়, নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে কাব্য দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে। 'খুব ভালো আছি' এই ধরনের কোনো আশা তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। জীবনের সরল উল্লাস কবির হৃদয়ে আর দেখা যাবে না, আশা করা ব্যর্থ। তাই তো কবির বক্তব্য হলো :

"যদিও বোঝায় বুঝি ভালো আছি, খুব ভালো আছি,
তবু এ হৃদয়
চায় ফিরে যেতে ঐ পথের ধুলায়
বিস্মৃত জন্মের সেই অস্থির কুলায়ে।
কিন্তু এও জানি মনে-মনে
এ কেবল নিষ্ফল আক্ষেপ, অনর্থক বাসনা-বিলাস,
জীবনের সরল উল্লাস
আমার তো নয় আর।
সর্বস্বত্ত্বতার
ত্যাগ করে এসেছি যে, সভ্যতার কাছে
এই মোর দেনা।
হবে না, হবে না
বেদের মহলে ফিরে যাওয়া
যে শৃঙ্খলে বাঁধা আছি, ঢুকেছে তা জীবনের মূলে,
ছাড়পত্র হারায়েছি, রাস্তা গেছি ভুলে।"[৯]

প্রাণ অনিষ্টকারী যুদ্ধ কবির জীবনকে নানা শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাঁর জীবনের সঞ্চয় ঝুলিতে রয়েছে দুই দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। যদিও এখানে বলে রাখা ভালো যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স অধিক ছিল না। তাই সেই যুদ্ধ তাঁর জীবনে কতটুকু গ্রাস

করেছিল, সেটা নির্ণয় না করা গেলেও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স যথেষ্ট ছিল। সেই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক লীলা বেশ উজ্জ্বল ভাবে জীবনের স্মৃতির পাতায় রয়ে গেছে। এই সময় কবির বেশ কয়েকজন পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য কবির রচনা তাঁর পঠন পাঠনের বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সমস্ত লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— **Robert Bridge– Wilfred Owen– Seigrid saason– Louis Macniece** প্রভৃতি। এরফলে কবির কাছে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা ও ধ্বংসাত্মক রূপের পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। সবশেষে বলা যেতে পারে, এলিয়ট সেই সঙ্গে আরও বহু যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী কবিদের রচনার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের লেখার অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। এই যুদ্ধের ভীতিকর এবং শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'অধুনা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা' কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন:

(বোমা পড়ার পরে)
"অধুনা নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা; উপরন্তু রাত্রি দীর্ঘজীবী।
সময় চলেনা আর, ঘোলা জল যেন পচা ডোবা
জ'মে আছে শতাব্দীর মধ্যদিনে। যতবাবু, বিবি
ফুর্তিহারা গৃহনীড়ে; দাম্পত্য নীরস, বই বোবা।
... ...
কেননা অধুনা দেখি মড়ার খুলির মতো চাঁদ
নাগরিক আকাশেরে প্রতি রাত্রে আতঙ্কে শানায়;
শূন্য পথ, রুদ্ধ গৃহ, অন্ধ দৃষ্টি যদিও জানায়
তমিস্রার বরেণ্যতা, তবু ঘৃণ্য পূর্ণিমার ফাঁদ
সুনীল সপ্তমে চড়ে আজো গড়ে পঞ্চমবাহিনী,
শত্রুর পাখায় ওড়ে এ অকথ্য কলঙ্ককাহিনী।"[১০]

যুদ্ধের সময় নিক্ষেপিত বোমার আওয়াজে কবির হৃদয়ে যে ভীতি সঞ্চার করেছিল, তারই কাব্যিক রূপ প্রকাশিত উপরের উদ্ধৃত কবিতায়। 'খুলির মতো চাঁদ', 'আতঙ্কে শানায়', 'শূন্য পথ', 'রুদ্ধ গৃহ', 'অন্ধ দৃষ্টি', 'তমিস্রার বরেণ্যতা ও ঘৃণ্য পূর্ণিমার ফাঁদ' ইত্যাদি বর্ণনামূলক শব্দগুচ্ছের চিত্রকল্পের মধ্যে যে অবক্ষয় চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যেই সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি ধ্বংসাত্মক লীলার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর মধ্য দিয়ে কবি মনের বিচ্ছিন্নতাবোধকে উদ্রেক করে—

"সভ্যতার শাশান শয্যায়
সংক্রামিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়;
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা।
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরো থরো

উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

... ...

প্রাণ রুদ্ধ, গান স্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে

লুব্ধতার লালা ঝরে।"[১১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি হওয়া ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন আর শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষ। এই দৃশ্য কবিকে আঘাত করেছিল। ছিনিয়ে নেওয়া, মনুষত্বের অপমান ও অবমাননার ফলে 'যাদের ঘর্মাক্ত শ্রমে/ধনীর ঐশ্বর্য জমে' সেই সমস্ত শ্রমজীবী লোকেদের উপরে চলা অত্যাচার কবির হৃদয় আত্মা ক্ষোভে জর্জরিত। আর এই সব দৃশ্যও কবির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মায়।

"ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খলা শান্তিরে করেছে অন্তরীণ,

নগরে বন্দরে গঞ্জে ঘাটে

অনিশ্চিত উৎকণ্ঠায় কাটে

দিন পরে দিন।

... ...

দুর্দিন উন্মত্ত রণ

হিংস্র নখদন্তে ছিঁড়ে মানবের হৃৎপিণ্ড, হত্যার তিমিরে

আরক্ত আকাশ, জলে স্থলে ত্রাস!" [১২]

দুর্বল দেশ আফ্রিকার উপরে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে কবির মনের ভিতরে বিরাট ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। মানুষের মধ্যে যে কত রকমের লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ থাকতে পারে, তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি এই মহাদেশের প্রতি আক্রমণে। কবির মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হওয়া ক্ষোভ তিনি উগরে দিলেন কবিতার মধ্যে দিয়ে। প্রতিবাদের স্বরূপ কবিতা লিখলেন 'ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা'। ঘৃণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অকথ্য ভাষায় নিন্দাও করেছেন। পশ্চিমী সভ্যতাকে যা ইচ্ছে গলি দিয়েছেন। আফ্রিকা মহাদেশকে নিয়ে কবির মনে আশাবাদ সূচিত হলেও সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক বাদ ও বাণিজ্যবাদের সীমাহীন আগ্রাসন নীতির ফলে কবি হৃদয়ে সচ্চরিত্র ক্ষোভ একপ্রকার বিচ্ছিন্নতাবোধকেই নির্দেশিত করে।

কবির অন্যতম কাব্যসংকলন 'যে আঁধার আলোর অধিক' এর বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে সূচিত ও উন্মেষিত করে। এই কাব্যের বহু কবিতা পাঠ করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, কীভাবে কবি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন এই বিচ্ছিন্নতার দুর্বিষহ যন্ত্রণাদগ্ধ পরিবেশ থেকে। 'সমুদ্রের প্রতি — জাহাজ থেকে' কবিতায় দেখা যাচ্ছে সমুদ্রকে 'পূর্ণতার' 'বিশালতার', 'সংগীতময়তার', 'ফলপ্রসূতার' ও 'সৃষ্টিশীলতার' প্রতীক হিসাবে না দেখে, দেখা হয়েছে 'নিঃসঙ্গতার', 'বঞ্চনার', 'যন্ত্রণার'—

"আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস, আর
সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার
**** **** ****
'যাকে ভালোবাসো তাকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।'
তাই আর শান্তি নেই। তাই চাপা-কান্নার তাণ্ডবে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উতরোল প্রতিবাদ। তাই হাহাকার,
তুফান, তুষার-শিলা, ডুবে মরা নাবিকের হাড়,
হাঙরের দাঁতে ছেঁড়া যন্ত্রণার অব্যক্ত চিৎকার
এইসব ছেয়ে আছে তিক্ত নীল রক্তের লবণ।
আমিও তোমারই মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।"[১৩]

"যে আঁধার আলোর অধিক" কাব্যের আরেকটি কবিতা 'কেন'। এই কবিতায় দেখি জ্বরা ব্যাধিতে আক্রান্ত এই ধরাভূমে কবি বুদ্ধদেব বসুর হৃদয় আজ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে একেবারে অঙ্গারে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই যন্ত্রণা দগ্ধ হৃদয়ে কবির সেই অমোঘ অব্যর্থ মন্ত্র উচ্চারণ:

"শুধু, কোন অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত- সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।"[১৪]

আপাত দৃষ্টিতে যে বিষয়কে আমরা একেবারে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক মনে করি, সেই সহজ, সরল, স্বাভাবিক বিষয়ও একদিন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ভারের পরিমাণ এতই অধিক হয়ে যায় যে, সেই ভারের ফলে জীবনযাপন করা খুবই কষ্টকর ও দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ফলে এই রকম পরিস্থিতিতে কবির মনে তৈরি হয় এক বিশাল বিচ্ছিন্নতাবোধ। তাই তো কবির কথা:

"কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার —
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতে তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।"[১৫]

কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত 'চতুর পাহাড়' শব্দবন্ধ প্রয়োগ ইঙ্গিত করে কবির হৃদয় চারপাশের অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ কবির মনে সৃষ্টি হয়েছে এক বিষণ্ণতাবোধ। আর এই বিষণ্ণতার কারণেই কবি আজ বিচ্ছিন্ন। জীবনের চলার পথ আজ এতই কণ্টক মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, জীবনের আজ ঘোর অন্তঃসারশূন্য দেখা দিয়েছে। 'প্রত্যহের ভার' এর জন্য বুদ্ধদেব বসুর মন

আজ পুরো বিপর্যস্ত, মনে সৃষ্টি হয়েছে ঘোর ব্যথা। আর এই বিপর্যস্ত ও ঘোর ব্যথাময় জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ আজ নিক্ষেপিত হয়েছে অবক্ষয়ের চক্রব্যূহের দিকে।

আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ 'অনন্ত সূর্যোদয়ের' মধ্যে আশাহতের পরিবর্তে শুনিয়েছেন আশার অমৃৎবাণী। কিন্তু আশার অমৃত চিরন্তনী বাণীর কথা বললেও 'অদ্ভুত আঁধার' লোক থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনি শুনিয়েছেন তিমির হননের গান, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তিনি সেই তিমিরের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, সেই অন্তহীন তিমিরাচ্ছন্ন থেকে বেরোতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই দিক দিয়ে তারই সমকালীন কবি বুদ্ধদেব বসুর জীবন ঘোর অন্ধকারে থেকেও, ঘোর বিচ্ছিন্ন হয়েও 'ছাড়পত্র হারিয়ে'ও, 'রাস্তা ভুলে গিয়ে' পৃথিবীর মধ্যে আলোর ভুবন সৃষ্টি করেছেন, সেই আলোর ভুবনের বাসিন্দা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরাঘুরি করেছেন, বিভিন্ন সভা সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই এই সমস্ত কথা বলার পরও আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, কবি বুদ্ধদেব বসু বিচ্ছিন্নতাবোধের সংক্রামক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অব্যর্থ হননি।

তথ্য সূত্র :

১। ভট্টাচার্য, সঞ্জয় : 'বুদ্ধদেব বসু', আধুনিক কবিতার ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ৭৫।
২। তদেব,: পৃ. ৬১।
৩। তদেব,: পৃ. ১০৩।
৪। তদেব,: পৃ. ৯৪।
৫। তদেব,: পৃ. ৯৫।
৬। Shelley– P. B. - Poetical Works– London– 1968 reprint– p. 579.
৭। ভট্টাচার্য, সঞ্জয় : 'বুদ্ধদেব বসু', আধুনিক কবিতার ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৬৬,পৃ. ৭৬।
৮। Wordsworth– William in The Norton Anthology of English Literature. (Fifth Edition)– New York– London– 1962– p. 1440.
৯। চক্রবর্তী, নিরঞ্জন, (সম্পাদক) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (৮ম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৯০ পৃ. ৬৫-৬৬।
১০। গুহ, নরেশ (সম্পাদক) : বুদ্ধদেব বসুর কবিতা সংগ্রহ (পাঁচ খণ্ড), ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৮০-২৮১।
১১। তদেব: পৃ. ২৭।
১২। তদেব: পৃ. ২৮৩, ২৮৫।
১৩। তদেব: পৃ. ৬৯।
১৪। তদেব : পৃ. ৮৪।
১৫। তদেব: পৃ. ৭৭।

স্ব রা জ কু মা র দা শ

প্রেমের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাঙালি নাকি প্রেমে না পড়লে কবি হতে পারে না। এই অভিমতটি অন্য কবিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হোক আর না হোক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা একেবারেই যথার্থ। রবীন্দ্রনাথের মতো ভালোবাসা আর পূজাকে তিনি সমার্থক করে তুলেছেন। শক্তি কোনো ব্যক্তি নামের নারীকে নৈর্ব্যক্তিক করে তুলে অন্য কবিদের মতো প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাননি। বিহারীলালের সারদা আছেন, রবীন্দ্রনাথের আছেন মানস-সুন্দরী, সুধীন্দ্রনাথের আছেন শাশ্বতী, জীবনানন্দের আছেন বনলতা সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আছেন নীরা। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেম তেমন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাম কেন্দ্রিক নারীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। 'তুমি' সম্বোধনে শক্তির নায়িকা কবিতাতে বিরাজমান। তিনিই শক্তির শক্তির মূলে যে আছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চর্যার কাল থেকে একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ইতিহাসের প্রতিটি শাখা পুনর্মূল্যায়িত হলে দেখা যাবে প্রেম-ই সাহিত্যে শাসন করেছে। চর্যায় ডোম রমণীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে ব্রাহ্মণ যুবক ঘর ছেড়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য তো পুরোপুরি প্রেমেরই কীর্তন কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার বিরহ যন্ত্রণার সাথে যেকোনো বিরহী প্রেমিকা নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারেন। লোর-চন্দ্রাণী বা সতী ময়না, মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতীর মতো পালা কাহিনির মূলেও আছে প্রেম। আধুনিক কালে প্রেমকে মিস্টিকধর্মী অন্তর্নিহিত সত্যানুসন্ধানের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম বিদেহী প্রেম। প্রেমে সচেতনভাবে দেহ যুক্ত করলেন তিরিশের কবিরা। এর আগে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বলেছিলেন, "আমি তারে ভালোবাসি অস্থি-মাংস সহ!" বিশের দশকের কবি মোহিতলাল ছিলেন দেহাত্মবাদী। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রেমের মধ্যে নাস্তিকতাকে যুক্ত করলেন, "প্রেম বলে কিছু নাই/...চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।" তিরিশের কবি বুদ্ধদেব বসু তো পুরোপুরি প্রেমের মধ্যে দেহকেই খুঁজেছেন। জীবনানন্দ দাশ "ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে" একথা বলার পরেও বনলতা সেনের জন্য হাজার বছর ধরে পথ হেঁটেছেন। চল্লিশের দশকের অধিকাংশ কবি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। তাঁরা তাঁদের প্রেমিকাকেও মিছিলের সঙ্গী করে নিতে চেয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'সুন্দর'-এর অর্থই বদলে দিলেন প্রেমের ক্ষেত্রে। অবশ্য এই পন্থার সূচনা হয়েছিল তিরিশের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দের কবিতায়। প্রিয়ার বাহুডোর উপেক্ষা করে কামার-কুমোর-মুটে-মজুরের কবি হতে চেয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিষ্ণু দে-র 'ঘোড়সওয়ার' গণজাগরণ ও প্রেমের মিশ্র উপস্থাপন।

ভালোবাসার মধ্যেই আছে কবিত্বের প্রথম পাঠ শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রমী নন। ভালোবাসলে পাথরও ঝরে পড়তে বাধ্য। ভালোবাসলে যে কেউ নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। নীল পাথর লাল হতে পারে, লাল পাথরও হতে পারে নীল। কবি তাই বললেন :

"একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো
দেখবে নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে।
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।"[১]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামই হল 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'। প্রেম যে প্রকৃত অর্থেই নৈঃশব্দ্যানুভূতি তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কাব্যগ্রন্থের 'পাবো প্রেম কান পেতে রেখে' কবিতায়। প্রেম এলেই প্রেমাস্পদের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের প্রযত্নশীলতা। কবি প্রেম-কে রোদ্দুরে রাখতে চান না। এমনকি ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়াতেও রাখতে চান না। কবি প্রেমকে রেখে দিতে চান একেবারে বুকের গভীরে নিগূঢ় কোনো গোপন ঘরে :

"অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।"[২]

বিরহ আছে বলেই স্মৃতি আছে। স্মৃতি আছে বলে বারবার মনে পড়াও আছে। এই মনে পড়ার মধ্যেই আছে প্রেমের পরিচয় এই কথাই যেন আলোচ্য কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। পাওয়ার মধ্যে নয়, না-পাওয়ার মধ্যেই আছে প্রেমকে আস্বাদন করার মাপকাঠি। বিরহ না থাকলে ভাবসম্মিলন থাকত না। রাধিকার মতো শক্তিও ভাগ্য বা কপালের দোষ দিচ্ছেন না পাওয়ার ক্ষেত্রে। আবার তার ঠিক পরেই তিনি বলছেন, চোখ বুজলে প্রিয় মানুষকে তিনি অবলোকন করতে পারেন :

"কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি।"[৩]

বিরহ-ই যে প্রেমের গভীরতা পরিমাপের মাপকাঠি তার প্রমাণ মেলে 'আনন্দ-ভৈরবী' কবিতাতেও। 'চাবি' কবিতাতেও আছে স্মৃতি ও বিরহ :

"চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?
অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে

তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কি না?"[৪]

'ঝাউয়ের ডাকে' কবিতায় বলেছেন "গত বছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম/ তোমায় ভালো"। 'স্থায়ী' কবিতায় বলেছেন "রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি/যখন তুমি চাইবে জানি/অনন্যোপায় দিতেই হবে/অনুভবে/অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।" প্রেম আসলে হৃদয়পুরের জটিলতা একথা ব্যক্ত হয়েছে 'হৃদয়পুর' কবিতাতে :

"তখনো ছিলো অন্ধকার তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরের জটিলতার চলিতেছিলো খেলা।"[৫]

ভালোবাসলে শরীর জুড়ে প্রেমিকার বিষ-পিঁপড়ের কামড়কে যে অনুভব করা যায় তার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'বিষ-পিঁপড়ে' কবিতায় "সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম'। বিষের রঙ নীল, আবার নীল অসীমতারও প্রতীক। ভালোবাসলে বিষের যন্ত্রণা আছে, তেমনই আছে অনন্ত নীলাভ অনুভব। 'নীল ভালোবাসা" কবিতায় বলছেন:

"ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি"[৬]

জীবনানন্দের কাছে 'হাত' হল অত্যন্ত ব্যক্তিগত উষ্ণ অনুভূতি সেই হাত 'নগ্ন নির্জন হাত'। সুনীলের কাছে হাত নীরার মুখ ছুঁয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ "এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ/আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি?" আর শক্তির কাছে প্রেমিকার হাত হল ভালোবাসার অজ্ঞাত অনুভূতি "তোমার হাত যে ধরেই ছিলাম তাই পারিনি জানতে" (তোমার হাত)। মেঘলা দিনে প্রিয়াকে যে মনে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। কালিদাসের 'মেঘদূত কাব্য' এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। চমৎকার একটি ভালোবাসার কবিতা 'বাঘ' :

"মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালবাসার বাঘ বেরুলো বনে...
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ নড়ে বসছে না।"[৭]

এখানেও আছে 'হাত'-এর প্রসঙ্গ "আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার"। 'বাঘ' কবিতায় যেমন বাঘকে খেতে বললেও প্রেমিক-কবিকে খায় না, তেমনই সমধর্মী অনুভব আছে 'সব হবে' কবিতায় :

"ভালোবাসা সবই খায় এঁটো পাতা, হেমন্তের খড়
রুগ্ন বাগানের কোণে পড়ে-থাকা লতার শিকড়
সবই খায়, খায় না আমাকে
এবং হাঁ করে রোজ আমারই সম্মুখে বসে থাকে।"[৮]

কবি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধান্বিত ও দ্বিখণ্ডিত। 'আসতে পারে' কবিতায় বলছেন :

"খুব সহজেই আসতে পারে কাছে
ওই, যা কিছু বুকের ভিতর আল্‌গা হয়ে আছে।
পাতার ফাঁকে উঠছে শামুক, শিকড় কাটে উই
আমার মতন একলা মানুষ দুখান হয়ে শুই।"[৯]

দ্বিধান্বিত সত্তা খুঁজে পাই 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো' কবিতায়। কবি যে আদ্যন্ত প্রেমিক তা 'মেঘ ডাকছে' কবিতাতেও স্পষ্ট "মেঘ ডাকছে, ডাকুক/আমার কাছেই থাকুক/ভালো থাকবো, সুখে থাকবো এই বাসনা রাখুক।" কবি ভালোবাসাকে আজীবন ভালোবাসতেই চেয়েছেন। তাই তো শক্তির এত দ্বিধা, এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘাত, এত হৃদয়ের অন্তঃক্ষরণ। প্রেম-ই যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সৃষ্টির চালিকাশক্তি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তিরিশের কবিরা সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিরোধিতা চলেছিল প্রেমের ক্ষেত্রেও। রবীন্দ্রনাথের বিদেহী প্রেমের পরিবর্তে দেহযুক্ত প্রেম বাংলা কবিতায় পদার্পণ করল। বুদ্ধদেব বসু নিজেকে যৌবনের কবি বলে ঘোষণা করলেন। জীবনানন্দের কবিতায় উপমা চয়নে অনেক সময় যৌনঙ্গের কথা উঠে এল "স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো-দুধে আর্দ-কবেকার শঙ্খিনীমালার" (শঙ্খমালা-জীবনানন্দ দাশ)। চল্লিশের দশকের কবিতায় প্রেম ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে উপস্থাপিত হল। চল্লিশের কবিরা বেশি প্রেমের কবি, তার থেকেও বেশি তাঁরা জনগণের কবি, জন-দরদী কবি। ব্যক্তি প্রেমের ঊর্ধে উঠে জনগণ প্রাধান্য পেয়েছে তাঁদের কবিতায়। 'অরণি' (১৯৪১) ও 'অগ্রণী' (১৯৪৮) পত্রিকা দুটিতে সমাজমনস্কতা ও প্রগতিবাদী কবিতায় প্রতিপালিত হয়েছে। অবশ্য এই চল্লিশের দশকে প্রগতিবাদী সাহিত্যের সমান্তরালে পেয়েছি অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়ের মতো ভিন্ন ঘরাণার কবিকে। পঞ্চাশের দশকের কবিতায় প্রেম আবার ফিরে এল ব্যক্তিগতভাবে রোমান্স ও রোমান্টিকতা নিয়ে। পঞ্চাশের দশকের দুই প্রধান কবি হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও আছেন বিনয় মজুমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের মতো প্রধান কবিরা। তাঁরা 'শতভিষা' (১৯৫১) ও 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) পত্রিকাকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে কবিতার ফুল ফোটালেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম যতখানি মেটাফিজিকাল, তার থেকেও অনেক সময় বেশি পরিমাণ আছে ফিজিকাল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন :

"কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম
শেখাবে
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার

মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা
খয়েরি" (হিমযুগ)

এইরকমভাবে প্রেমের কবিতায় যৌনাঙ্গের ব্যবহার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় তেমন দেখা যায় না। এমনকি ছয়ের দশকের 'হাংরি জেনারেশন'-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যখন তখনকার কবিতাতেও দেখা মিলল না। আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রেমের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ছিলেন মগ্নচারী, পরিশীলিত ও কিছুটা অন্তর্মুখী। 'হাংরি জেনারেশান'-এর বিকৃত চিৎকার থেকে তিনি তাই কিছুদিন পরে সরে এসেছিলেন। 'হাংরি জেনারেশান'-এর কবি মলয় রায়চৌধুরীর দাদা সমীর রায়চৌধুরীর শ্যালিকা শীলা চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমে পড়েছিলেন শক্তি। শীলা যখন কলেজে যেতেন তখন তার জন্য গাছতলার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু সেই প্রেম কোনো পরিণতি পায়নি। ব্যর্থ প্রেমের এই বিরহ তাঁকে সারাজীবন কুরে কুরে খেয়েছে। প্রবল অর্থকষ্ট ও প্রতিষ্ঠা হীনতার কারণে শীলাকে হারাতে হয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের :

"হাংরি আন্দোলনের সহযোদ্ধা মলয় রায়চৌধুরীর ভাষ্যমতে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এ আন্দোলন (হাংরি জেনারেশান) ত্যাগ করার পেছনেও একটি প্রধান কারণ ছিল এই ব্যর্থ ব্যর্থ প্রেম। শীলার সাথে বিচ্ছেদের পরে তার মনে হয় যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হতে পারলেও শীলার পিতা তাকে মেনে নিতেন এবং অর্থচিন্তা তখন তাকে অনেকটাই পেয়ে বসে। এরপর ১৯৬৩ সালে একটি সংবাদপত্রে চাকরির প্রস্তাব পান শক্তি। কিন্তু চাকরির শর্ত ছিল, তাকে হাংরি আন্দোলন ছাড়তে হবে। এ কারণেই হাংরি আন্দেলনের প্রতি... শক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন...।"[১০]

এর কিছুদিন পরে আবার তাঁর জীবনে প্রেম এল। এক আড্ডায় ১৯৬৫ সালে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শক্তির আলাপ হয়। তারপরে তা গড়ায় প্রেমে, শেষপর্যন্ত বিবাহে। কিছুদিন পরে একটা কন্যা সন্তানের (তিতি চট্টোপাধ্যায়) জন্ম হয়। বিরহ ও মিলনের এই আত্মমগ্ন দ্বিধাদ্বন্দ্ব শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। শুধু প্রেম নয়, সে প্রেম জীবনের জৈব রসায়ন যুদ্ধ যেদন, মৃত্যুজীর্ণ সে ভাবনা, প্রেমই আধার সেখানে। কবি তাই বললেন :

"যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?
সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো"
(যেতে পারি, কিন্তু কেনো যাব)

সবশেষে আমরা শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এই কথাই বলতে পারি

১. শক্তি চট্টোপাধ্যায় মূলত প্রেমের কবি।
২. প্রেমের কবিতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়।
৩. তিনি যেমন বিরহের কবি, তেমনই তিনি মিলনেরও কবি।
৪. প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি যৌনতার অহেতুক আমদানি করেননি। আবার এই প্রেম রাবীন্দ্রিক বিদেহী মিস্টিক প্রেমও নয়।
৫. গভীর আত্মমগ্নচারী শব্দের রঙিন পাপড়িতে তাঁর কবিতায় প্রেম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, একবার তুমি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ১০১
২. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, প্রেম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ৪০
৩. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, যাকে চেয়েছিলাম তাকে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ৪১
৪. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, চাবি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ৪৭
৫. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, হৃদয়পুর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ৫০
৬. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, নীল ভালোবাসায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ৫৪
৭. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, বাঘ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ১৩০
৮. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, সব হবে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ১৩৯
৯. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, আসতে পারে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ ১৪৩
১০. চৌধুরী, অনিন্দিতা, হাংরি আন্দোলনের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দৈনিক অধিকার, ২৫ নভেম্বর, ২০১৯

সু র জি ৎ প্রা মা ণি ক

অলোকরঞ্জনের কবিতা : চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো

দৃশ্যের ভেতর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আরও এক দৃশ্যের অনুসন্ধিৎসু কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০), জীবনের বৃহত্তর সময় বিদেশের মাটিতে কাটিয়েছেন ঠিকই তবু দেশের প্রতি তাঁর আন্তরিক অভিনিবেশ কখনও পূর্ণচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হয়নি। কাজেই তাঁর কবিতায় স্বদেশ ও প্রবাসের অনন্তধারা পাশাপাশি সহাবস্থান করেই, প্রবাহিত হয় অনায়াসে। অলোকরঞ্জনের নিবিড় কবিতা বলয়ের শিল্পায়ন, বাংলা কবিতার পাঠককে সীমাহীন ভালোবাসা আর শাশ্বত সত্যের মুখে দাঁড় করায়। বন্যায় ভেসে যাওয়া নৌকা, জরাজীর্ণ কাঠের সেঁউতি বেয়ে অঙ্গীকার চেয়ে নেয় হেমন্তের শীতে। মানববিশ্বের এক টুকরো গোরখপুর থেকে বারাণসী, ভিয়েনা থেকে ডালহৌসি স্কোয়ারে ছুটে চলে তাঁর কবিতার মুহূর্তগুলো।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল' প্রকাশিত হয় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে। এরপর যথাক্রমে, 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৯৬৬), 'রক্তাক্ত ঝরোখা' (১৯৬৯), 'ঈথার দুহিতা' (১৯৭১), 'ছৌকাবুকির মুখোশ' (১৯৭৩), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৩), 'গিলোটিনে আলপনা' (১৯৭৭), 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ায় মুখে' (১৯৭৮), 'জবাবদিহির টিলা' (১৯৮২), 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' (১৯৮৩), 'দুই বন্ধু' (১৯৮৪), 'এবার চলো বিপ্রতীপে' (১৯৮৪), 'ঝরছে কথা আতসকাঁচে' (১৯৮৫), 'ধনুতে দিয়েছে টঙ্কার' (১৯৮৮), 'মরমী করাত' (১৯৯০), 'অস্তসূর্য এঁকে দিল টেম্পোরা' (১৯৯৮), 'আলো আরো আলো' (২০০৯), 'সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বরকণা' (২০১১), 'নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে' (২০১৩), 'এখন নভোনীল আমার তহবিল' (২০১৪), 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো' (২০১৫) ইত্যাদি। 'মরমী করাত' (অনুবাদ: দ্য মিস্টিক্যালস অ্যান্ড আদার পোয়েমস) বইটির জন্য তিনি ১৯৯২ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

আগেই বলেছি বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জীবনের প্রভূত সময় জার্মানিতে কাটালেও, বাংলার ঐতিহ্যকে ভোলেননি জীবনবোধের মগ্ন চৈতন্যের সৈকত থেকে কাব্যবোধের প্রবণতায়। তাই 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো' শুরুর শুরুতে হৈমবতী উমার প্রসঙ্গ টেনে 'বিভাব কবিতা' লিখে যেতে পারেন অলোকরঞ্জন। সিঁদুরে মেঘে সিঁথি ছুপিয়ে নিয়ে যাবার মুখে যে প্রহেলিকা রচনা করেছিলেন সমাসন্ন হৈমবতী উমা, সেই প্রহেলিকা কি কবিকে পরখ করবার জন্যই! এই আত্ম-জিজ্ঞাসা তৈরি হয়। যাঁর স্পর্শে মানব জীবনের ইন্দ্রিয় বিগত হয়ে যায়, ধান দুর্বা বেড়ে ওঠে, ঐতিহ্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁকে বরণ করে নিতে পারেন কবি।

"স্পর্শে আমার ইন্দ্রিয় বিগত,
ধানদুর্বাও বাড়ন্ত, ফলত
এই নারীকে শুধুই বরণ করি
চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো

একটুখানি ঐতিহ্যের স্বাদ :
চিবুক ছুঁয়ে আমার আশীর্বাদ"[১]

আশীর্বাদের এই অতল প্রবাহে একদিকে যেমন ঐতিহ্যে আশ্বস্ত হতে পারেন, ঠিক তার বিপরীতেই দুঃসংবাদের বিকৃত প্রতিচ্ছায়ায় মৃত্যুর বিষাক্ত বাষ্পে কেঁপে ওঠেন কবি। বারাণসীতে পৌঁছে পবিত্র ধ্বনি শ্রবণের বদলে শুভার্থীর ছদ্মবেশধধারী অস্পষ্ট লোকেরা কবির কর্ণকুহরে হতাশার শব্দ ঢেলে দিয়ে যায়, 'মহম্মদ রফি আর নেই।'[২] ডালহৌসি স্কোয়ারে ফেরার মুখে সুর শিল্পী 'হার্বাট ফন কারায়ান'-এর শোক সভায় ভেসে যেতে দেখেন জনজোয়ার। অকল্যাণের এইসব প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে অথবা প্রতিচ্ছায়া দেখতে দেখতে, ঘরকুনো হতে চান কবি। যা আদতেই মৃত্যুচেতনা থেকে উদ্ভূত এক ব্যথিত হৃদয়ের অবশ অবস্থান। যদিও সেই সাময়িক ঘোর ছাড়িয়ে, নিথর নিস্তব্ধতা কাটিয়ে, দুঃসংবাদের বোঝা সরিয়ে পুনরায় কবি ভাবতে পারেন মিথিলার কথা, কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠেন বিদ্যাপতি।

"আপাতত মিথিলার পথে হাঁটছি। মনটা বড়োই
পরিপ্লুত, আঞ্চলিক চিঁড়েগুড়দই
সঙ্গে আছে, সেটা বড় কথা নয়, পাঁচ ক্রোশ গিয়ে
দেখব সে-দেউল যার তোরণে দাঁড়িয়ে
বিদ্যাপতি লিখে গিয়েছেন—

যেই বেলা এল গোধূলির
নারী ছেড়ে গেল মন্দির
নতুন মেঘের বিদ্যুৎরেখা কেঁপে উঠে অস্থির"[৩]

এখানে গোধূলির বেলা মানে গভীর অর্থে জীবনের সময় ব্রহ্ম ক্ষীণ হয়ে আসা। ক্রমশ জীবনের বেলা বেড়ে যায়, দিনের আলো কমে আসে। যে আলো-আঁধারের যাত্রা পথে প্রতিটি প্রিয়জন ছেড়ে যায় প্রিয়জনকে। ছেড়ে যেতে হয়। কাজেই এ চিত্রার্পিত ত্রিভুবন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যিনি নিজের হাতে রং তুলি নিয়ে এঁকে দেন, প্রকৃত অর্থে তিনিই চিত্রবন্ত। বাকি মানব-জগতের আমরা সকলেই মহাশূন্যের এক একটি অতীব তুচ্ছ এক ফোঁটা আবহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তবু পটে আঁকা নর-নারীরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় বাঁকা অভিমানটুকু সত্য ভেবে চলে। উর্ধ্বের হংসবিমান তারা ভেবে দেখে না লৌকিক পৃথিবীর কৃত্রিম কলরব মগ্নতায় বিহ্বল হয়ে গিয়ে। কাঠ পুতুলের মতো নাগর দোলায় ঘুরতে ঘুরতে

সূত্রধরের দিকে না তাকানো জীবন নিয়ে, শিরীষ গাছের নিচে যেখানে আত্মার শান্তির মতো মধুর কিছু উপলব্ধির কথা ছিল, যেখানে কথা ছিল গান শোনাবার সেখানে অগণিত মৃতদেহ ভরে যায়। ছন্দে দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল যেখানে, সেখানে গজিয়ে ওঠে গোরস্থান। আমরা যারা লৌকিক পৃথিবীর জরা-ব্যাধির জীবন থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারিনি, যারা স্বৈরাচার মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ডাক দিতে পারিনি কখনও, সব লুট হয়ে যাবার কালেও যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি, তারা ব্যর্থ। দিনের শেষে প্রতিরোধহীন সেই ব্যর্থ আত্ম-অনুসন্ধান আমাদের বড়ো প্রয়োজন। প্রকাণ্ড আত্মপ্রত্যয়ে পূর্ণ হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে বিস্তীর্ণ আত্ম-জিজ্ঞাসা তৈরি হয় কবির। অসংখ্য প্রশ্ন মাথার ভেতর গজ গজ করতে থাকে অহরাত্র :

"কালব্যাধি ইবোলায় হাজার হাজার মৃতদেহ
পরিকীর্ণ সেইখানে, যেখানে আমার আজ
শিরীষ গাছের নিচে গান শোনাবার কথা ছিল!

'আলেপ্পা' 'আলেপ্পা' যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ,
অদূরপ্রাচ্যের দান, সেখানেই আজকে আমার
মিশরের ছন্দের বিষয়ে
দীক্ষিত হওয়ার কথা, কিন্তু সেখানেও
স্বৈরাচারী করে দিল সারাটা শহর গোরস্থান।

'নাইজেরিয়া' 'নাইজেরিয়া' করে যে-ছেলেটি
ঘুড়ি ওড়াবার ছলে মহাবিশ্বের স্বাদ নিত
তাকে তো দেখি না আর। সেইখানে বিদ্যাপীঠ থেকে
বোকো হারামের দল মেয়েদের লুট করে নিল

সেখানেও যাওয়া হয়নি। আমি কোনো দোষ করিনি তো?"[৪]

সমস্ত দিন নিঃশ্বাসবিহীন ঘুরে যেতে যেতে অনাহুত আতিথেয়তায় যারা সাড়া দেয়, ঘরে ফেরে না তারাও। শহরের প্রান্তে পরে থাকা বুড়িটা অনিচ্ছুক মানুষের দিকে যখন ঝিঙে টম্যাটোর ঝুড়ি উজাড় করে দেয়, আমরা তার কাছেও কি পৌঁছে যেতে পারি। কাজেই কবির এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। "তবে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা অলোকরঞ্জনের স্বভাব নয়। বরং হতাশার মহাশ্মশানে বসে নতুন সম্ভাবনার নন্দীপাঠের দিকেই তাঁর সহজাত প্রবণতা।"[৫] এই প্রবণতা থেকেই অতীন্দ্রিয় ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত ধান ক্ষেতের জলে অনন্ত আলোর উৎসার রচিত হয়। ফুটে ওঠে ঈশ্বরের পদকল্পতরুতল। যে কথা কাউকে বলার মতো নয়, যে কথার অর্থ, প্রকাশ পাওয়া মাত্রই বোকা হয়ে যায়, যে কথা বললে হয়তো বা ভালো হতো, কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনাটিও থাকে যথেষ্ট, সেই বহু জন্মের গোপন কথাটির মতো কবিও তুলে রাখেন তাঁর গোপন সাক্ষাৎ-সমাচার। তবু কি পৃথিবীর অস্থিরতা

আটকানো গেল? আটকানো গেল না। আটকানো যায় না। কেবল মুহুর্মুহু ঘনিয়ে ওঠা স্পষ্টত অন্ধকারের ভেতর আমরা শান্তির প্রার্থনাটুকু করতে পারি। আলোর মতো শান্তির প্রার্থনাটুকু। শ্মশানের পাশে বয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে দৈত্যাকার চুল্লির মতো বিষবাষ্প ওড়ে। কলুষতায় ঢেকে যায় সভ্যতা। যে সভ্যতায় কল্যাণের প্রতিচ্ছায়াগুলোও যেন বিষাক্ত ধোঁয়ার মতো সংক্রামিত, সম্প্রসারিত। যে বায়ুচক্রে ঘূর্ণায়মান চক্রান্ত নিত্য প্রবহমান। এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্ত মাধুর্যের কাকলিতে ভোরে ওঠার প্রত্যাশা আছে অলোকরঞ্জনের কবিতায়, জোনাকির আলোয়, ঈশ্বরের অনুসন্ধানে—

"পৃথিবীর শান্তির ভিক্ষায়
ডুব সাঁতার দিয়ে চলে যায়
কয়েকটি জোনাকি, ঈশ্বরের
নিজস্ব কয়েকটি সাবমেরিন
নিরস্ত্র, নিরীহ, অমলিন
পৃথিবীর শান্তির ভিক্ষায়..."[৬]

আমরা হয়তো আলোর প্রার্থনা বুকে নিয়ে জীবনের সবটুকু স্পর্ধা ছাড়িয়ে একদিন মাথার উপরে লেগে থাকা সিলিং-এর ছাদ ফুঁড়ে অপার বিস্ময়ে শূন্যে মিলিয়ে যাব ঠিকই। তবু জোনাকির আলোয় পৃথিবীর অসহায় মানুষের কান্নার দাগ মুছে দেওয়া যাবে না কখনও। তা আরও ঝলসে উঠবে সূক্ষ্ম চেতনা সম্পন্ন মানুষের সহজাত অঙ্গীকারে। মাটির ভুবন, কবিকে তলতলে কাদার মতো সারল্যে অংশগ্রহণের ডাক দিলেও, সেই ডাক সকলের কানে পৌঁছয় না কোনওভাবেই। কারণ তারা আপাদমস্তক কদর্য বর্বরতার পর্দায় আচ্ছন্ন। জঘন্য কলুষতার উল্লাসে উন্মত্ত রাষ্ট্র নেতারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে উত্তরণ। তারা জানে উত্তরণ মানে মুক্ত আকাশের বুকে অনন্ত আলোর উদ্ভাস। সেই আলো মুক্তির। সেই আলো আনন্দের। তাই অদ্ভুত অন্ধকার কবির মর্মে এসে লাগে, আর হৃদয়ে দস্তুর মতো বাজে আরব-ইজরায়েল পরিস্থিতি। শিল্পসরস্বতীর নির্দেশে ঝাউজোনাকিদের নিয়ে সেমিনারের তোড়জোড় চললেও ধুবুলিয়ার ক্যাম্পে মোকাম্বেল তানভীর, সুশীল সাহারা যখন হাজির হন, তখন মাটি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষের চোখের জলে পুষ্ট সরোবরের কথা মনে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। যা আদতে বাংলা কবিতার পাঠককে শুধু নয়, সমগ্র মানবজাতির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় চূড়ান্ত অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত। একদল মানুষের বিকারগ্রস্ত চক্রান্তে আরেক দল মানুষের অসহায়তার মুমূর্ষু পরিণতি তো ভোলা যায় না। ভোলার নয় বলেই। তা বক্ষে পাঁজরে সঞ্চিত থাকে আমৃত্যু।

"তাঁরা তুলে রাখছেন
দেশ বদলের শামিল
মানুষজনের কান্না

এই মুহূর্তে
শাশ্বতের প্রকল্পে ঘোষিত
জোনাকিদের আমি কিছুতেই অন্তর্গত করে নিতে পারি না

জোনাকিরা এখনও দারুণ অভিমানী
আমাকে বিশ্বাসঘাতক ঠাউরে
ঝাউ ছেড়ে শ্মশানচাঁপার গাছে পুনর্বাসন খুঁজে উড়ে গেল..."[৭]

তাই অপ্রয়োজনীয় বিভাজন রেখার ছবি জোর করে দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিলেও, সেই ছবি থেকে নেমে আসা অবান্তর যুক্তির ছায়া দেখে চোখ পুড়ে যায়। তবু অসংখ্য অন্ধকারের জমাটবদ্ধ মেঘ থেকেও মানুষের প্রতি আস্থা রাখতে হবে অটুট। সেই আস্থার চাকায় ভর করেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো কবিরা ভাবতে পেরেছেন মানুষের চৈতন্যের ব্যাপ্তি ও আনন্দের কথা। খুঁজতে পেরেছেন অন্য এক মানব সভ্যতা মানব সমাজ। 'পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যে প্রতিটি মানুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়', সেই বার্তা তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাকে যদি কেউ স্বীকার করতে না চায় তাহলে আমরা রাগ করতেও জানি'। ঐতিহ্যের প্রবহমানতায় বিশ্বাসী এই কবির এক সম্পূর্ণ পৃথক বাচনভঙ্গি যা তার একান্ত নিজস্ব। ... নিত্যনতুন শব্দের সন্ধান, অপূর্ব শব্দ বিন্যাস কবিতা মনস্ক পাঠকদের তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাঁর কবিতার আলো পথ দেখায় বাংলার শাশ্বত নীতির সঙ্গে সহাবস্থানের। তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় অনন্তকালীন সেই সত্তার কাছে এক চিরকালীন অভিযানের সঙ্গী করে।"[৮] প্রবল নীতিবোধের দীর্ঘ মাস্তুল আর সূক্ষ্ম ভাবনার চিরন্তন একাগ্রতা ছিল বলেই, দেশে দেশে মানুষের অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার প্রার্থনা রাখতে পেরেছেন কবি সত্যের সাধনায়। উন্মাদ লালসায় দগ্ধ হওয়া দূষিত পৃথিবী আর প্রকৃতির কালিমালিপ্ত ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন্ত অক্ষরে। কাজেই শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেই সভ্যতা যে শান্ত হয়ে যায় না, একথা উচ্চারণ করতে কোনও দ্বিধা রাখেননি অলোকরঞ্জন—

"পুরোহিত মহোদয়,
এমন বীভৎসভাবে ছিটিয়ে দেবেন না শান্তিজল,
চোখ বড় জ্বালা করে!

আপনি তো জানেন শান্তিজলে
লুকিয়ে থাকতে পারে আণবিকতার আবর্জনা

ল্যাবরেটরিতে গিয়ে অনিরুদ্ধ প্রমাণ পেয়েছে
বৃষ্টির জলেও আজ অ্যাসিডের ছিল পরিচয়

তাই তো বাড়ির পথে মীরার দুচোখ ঝলসে গেছে,
বৃষ্টির অ্যাসিডে, বৃষ্টি তাহলে কি ধর্ষকাম নয়?"[৯]

আসলে সমাজের সাংঘাতিক কালিমালিপ্ত অবস্থার দুঃসহ পরিণতি বারবার রেখাপাত করেছে তাঁর কবিতার পাতায়। যে সমাজের বুকে লটারির বিনোদনে নারীর শরীর বিক্রি হয়ে যায়, সেই সমাজের অধঃপতনের আর কোনও বাকি থাকে কি! বোধ হয় থাকে না। তীব্র লালশাগ্রস্থ বর্বরদের অনুমতিক্রমে প্রচণ্ড ভক্ষকের বীভৎস মূর্তিটিও স্পষ্ট হয়ে আসে। এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা কল্পনা করে খানিক থমকে গেলেও, প্রকৃত অর্থে কোনও পিছুটানেই ফিরে যাওয়া যাবে না আমাদের। সেই সমবেত দানবের মুখ দেখা না গেলেও, হনুমানের প্রতাপ স্মরণ করে নির্দিষ্ট কোথাও একটা নিশ্চিত আগুন লাগাতে হবে আমাদের। লাগাতেই হবে। কবিতার এই চিত্র, গভীর অর্থে প্রকাণ্ড ধ্বনির মতো আমাদের চেতনাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে যায়। আসলে "ধূসর দিকপ্রান্তে দূরাদয়শ্চক্রনিভ এক ক্ষীণ নীলাঞ্জনরেখার সন্ধান পঞ্চাশের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পঞ্চাশের তো বটেই, উত্তরৈবিক বাংলা কবিতার এক প্রধান কবি অলোকরঞ্জনের কবিতায় আমরা চিত্রকল্পের স্বতোৎসার যেমন দেখেছি, তেমনি দেখব তার রহস্যগ্রন্থিল অপ্রত্যক্ষতাও।"[১০]

আবার রহস্যের অপ্রত্যক্ষতার মাঝে রহস্য উন্মোচনের চিহ্নগুলিও কবি নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন বহু ক্ষেত্রে। তবে সব কিছুর মধ্যে মানব জীবনের দুর্বিষহ বেদনাশ্রু যেভাবে গড়িয়ে পড়েছে অলোকরঞ্জনের কাব্যবোধের অভিমুখ থেকে, তা পাঠক হিসাবে আমাদের কাছে মানবতার মন্ত্রে অঙ্গীকারবদ্ধতার অনন্ত ইশারার মতো। 'এ মায়া প্রপঞ্চময়' কবিতায় কবি রচনা করলেন জিজ্ঞাসায় ভরপুর এক কথনভাষ্য। ঠিক তার উল্টোদিকে আবার মানুষের অবস্থানটিও বুঝিয়ে গেলেন সাংঘাতিক :

"সারি সারি বায়ুচক্র ঘূর্ণ্যমান রয় পাশাপাশি,
আলো এনে দেবে নাকি ঘরে-ঘরে, বুঝতে পারি না
শুধুমাত্র আলো দিয়ে কী করবে হাঘরে উপবাসী
অন্যের সংস্থান যদি না হয়, তাহলে? প্রতিদিন
এসব না জেনে বুঝে একই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরি :
ধোঁয়া, বাষ্প, বায়ুচক্র, গৃহহীন মানুষের হাসি!"[১১]

'হাসি'-র গায়ে আটকে থাকা বিস্ময়কর জিজ্ঞাসার বোধটিই কবির নৈতিকতা ও মানবতার চূড়ান্ত প্রেক্ষণ বিন্দু চিনিয়ে যায় বাংলা কবিতার বিপুল সৈকতে। "প্রতিমুহূর্তে মানুষ যুযুধান জীবন-মৃত্যুর উন্মোচিত আঘাত-প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। একজন মহৎ কবি এই সংগ্রামের গুরুভার নিজে বহন করে তাকে পালটে দেন কবিতায়, চিত্রকল্পে, মানবিক উচ্চারণে। ... নইলে আর মানুষের অবস্থার উন্মত্ততা আর নীরবতার ভেতর থেকে কোন বিয়োগফল তাঁর কবিতায় তিনি ধরে রাখবেন?"[১২] তাই বারবার প্রশ্নচিহ্ন থেকে বিস্ময়

কিংবা বিস্ময় থেকে প্রশ্নচিহ্নেরা উঁকি মারে। আবার বিস্ময়বোধের ভেতরেই বিস্মিত উত্তরণের যথার্থ দিকনির্দেশনা আছে তাঁর কবিতায়। প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে যাবতীয় উত্তরের বীজ। রহস্যলোকের মধ্যে আছে রহস্যের পর্দা ভেদ করার প্রবল হাতছানি। দোলাচল সিদ্ধান্তের জিজ্ঞাসার মধ্যেই নির্ধারণ করা আছে নির্দিষ্ট অবস্থান। "বিষাদ ও বিষণ্ণতার কবিতা তিনি বেশি লেখেননি, আনন্দ হারাননি জীবনে। কিন্তু তাঁর জীবনের বিষাদযোগ ঢেকে রেখেছেন শ্লেষে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে অংশগ্রহণ করে, নানারকম বিরোধাভাসে। বস্তুত বিরোধাভাস নিয়েই তাঁর বিশ্বপরিক্রমা। সেই সূত্রে তাঁর কবিতায় এসেছে অনেক আকস্মিক নাট্যমুহূর্ত, অনেক গল্পের টুকরো, কথকতার নিসর্গ।"[১৩] সেই কথকতার নিসর্গেই প্রবাহিত হয় বোধের দীপ্তি ও পরিশুদ্ধির প্রগাঢ়-আকাঙ্ক্ষা। অবক্ষয় থেকে উত্তরণের সুতীব্র প্রত্যাশায় মগ্ন হতে পারেন অলোকরঞ্জন। জ্বলে ওঠে আলো। অন্ধকার কেটে যায়। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার কালে দাঁড়িয়েও, যেভাবে পুনরায় সূচনার সংকল্পে প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়, সেই ভাবনাকে আরও একবার জাগিয়ে যেতে চান তিনি বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে।

"অবক্ষয়ের খপ্পরে পড়ে
যেই না ভেবেছি আমার তো আর
একটুও কিছু আর নেই বাকি
ঈথারডানায় দীপ্ত জোয়ার

সঞ্চার করে একটি জোনাকি

প্রথম প্রথম উপেক্ষা করি,
ভাবি প্রাক্তন কাব্যধারার
বহুব্যবহৃত উপকরণ তো
কিন্তু ঘরের কালো দিগন্ত

আলো করে দিল একটি জোনাকি"[১৪]

এভাবেই তাঁর কবিতায় একটি জোনাকি থেকে সহস্র জোনাকি তৈরি হয়, এক আলো থেকে আলোর মিছিল। একটি ঘর থেকে অজস্র ঘর, একজন মানুষ থেকে অসংখ্য মানুষ, মানব সভ্যতা বিশ্ব সংসার। কবি আশাবাদ নিয়ে বাঁচেন, বেঁচে থাকেন। তাই তাঁর এক একটি কবিতা বাংলা কবিতার ধারায় যে বিরল দৃষ্টান্ত, একথা বলাই যায়। কালীকৃষ্ণ গুহ মনে করেন, অলোকরঞ্জনের কবিতা 'বিষয়মগ্নতা, বৈচিত্র্য, ভাষার জাদু আর বিরোধাভাসের খেলা নিয়ে সব সময়ই আমাদের চমকৃত করেছে। এতটাই বলতে পারি যে তাঁর এমন একটি কবিতাও পড়িনি যা কোনো-না-কোনো দিক থেকে অনন্য নয়।"[১৫] আমৃত্যু মানবতার সুউচ্চ পবিত্র শিরদাঁড়ায় নিজেকে স্থির রেখে, যিনি মানুষের প্রতি মানুষের সহিষ্ণুতাকে

জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অহর্নিশি বলে গেছেন প্রেমের কথা, ভালবাসার কথাগুলো। 'তাহলে কি আজ মরবো না' কবিতায় অলোকরঞ্জন লিখলেন,

"হিজল দিঘির তীর ঘেঁষে
ডাক দিয়ে গেল কে?
বৈরিগি বুঝি ত্রয়োদশীর
ভালোবাসা চেয়েছে!

তবে কি আমারই পুণ্যাহ
নিজেকে প্রশ্ন করি,
আঁচলে গহন মুখ গুঁজে
হাসল সেই কিশোরী।
...
বিশেষত ছোটো মেয়েটিকে
তুমি দত্তক নিয়ো,
বারাঙ্গনা সে, জানে না যেন
কোনো কাকপক্ষীও..."[১৬]

কাব্য অভিভবের এক অসামান্য দক্ষতায় কবি পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতার প্রবহমান স্রোতে ব্যতিক্রমী স্রষ্টা হয়ে উঠতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে। সুজিত সরকারের কথায়, "আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার এই যে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই অলোকরঞ্জন এই নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অনেক প্রধান কবিরাও করতে পারেননি। কবির নিজস্ব কাব্যভাষাকে অলোকরঞ্জন বলেছেন 'স্বরায়ণ"।[১৭] এই স্বরায়ণটাই তাঁর কবিতাকে চেনার জন্য যথেষ্ঠ। যার উপর ভিত্তি করে একজন কবি হয়ে ওঠেন দক্ষ চিত্রশিল্পীর মতো। জীবন্ত ছবি আঁকতে পারেন কবিতার পাতায়। অলোকরঞ্জনের কবিতার আকাশেও এক একটি ছবি স্পষ্ট আকারে মূর্ত হয়ে ওঠে।

"এমন সময় বেলাভূমির বিস্তীর্ণ বালুকায়
ভূমিষ্ঠ নবজাতক ককিয়ে উঠেছে,
সিন্ধুমরালেরা অমনি পঞ্চম-নিখাদ কাকলিতে
মা আর শিশুকে ঘিরে কর্কশ মাধুর্যে গান করে;
আমিও লেখার খাতা জড়ো করে এই মর্মে একটি কবিতা
লিখতে গেছি, তৎক্ষণাৎ স্নানার্থীরা আমার লেখার
পরিপার্শ্বে গোল হয়ে তীব্র কৌতূহলে ফেটে পড়ে

লেখার সময় আমি একাকী বিজন থাকতে চাই

সে কথা না বলে শুধু করজোড়ে ওদের জানাই :
"আজ সংগৃহীত হল চিত্রকল্প কাল প্রত্যুষায়
সমস্তটা লিপিবদ্ধ হবে'খন"

বলতে বলতে লজ্জা পাই আমারই নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে,
আমাকে আজকের মতো নিষ্কৃতি দিয়েই দিনমণি
অস্ত যায়, আর তার গনগনে মোমের রক্ত লেখার খাতায় ঝরে পড়ে..."[১৮]

কাজেই অলোকরঞ্জনের কবিতা পড়তে পড়তে আমরা খুঁজে নিতে পারি মেঘ কেটে যাওয়া এক নির্মেঘ আকাশের গনগনে আলোর দীপ্তি। সেই আকাশে বিষাদ থেমে গিয়ে শুরু হয় মাধুর্যের গান। অন্ধকারের আস্তরণ সরে গিয়ে জ্বলে ওঠে আশার আলো, ভালোবাসার আলো। যে আলো সকলের জন্য, সকলের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য। যে আলোর কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলে যেতে পারেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—

"বুকে যখন ভরে উঠেছে শাঙন সজল
ঠিক তখুনি লিখো
আশাবাদের একটি কবিতা

লিখন ভঙ্গি যেন সহজ হয়
না হলে খুব ধমক দেবে আমার
প্রথম যুগের ছাত্রী নবনীতা"[১৯]

এভাবেই তাঁর কবিতায়, প্রথম যুগের ছাত্রী থেকে কিশোরী যুবতীরা হেঁটে বেড়ায়। হেঁটে বেড়ায় শৈশব থেকে যৌবন হয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া মানুষ। "শুধুমাত্র মানুষই নয়, কবিতাও হেঁটে যায় এক প্রান্তের দর্শন থেকে অন্য প্রান্তের অভিষিক্ত চৈতন্যে"।[২০] কবির ব্যক্তিগত আশাবাদ, মানব জীবনের টুকরো টুকরো আশাকে খুঁজে দেয়। খুঁজে দেয়, পৃথিবীর চিত্রপটে মানুষের জেগে থাকার নেশাকে। জীবনের গতিতে কখনও লাগে জোয়ার, কখনও ভাঁটা পড়ে। এভাবেই "আত্ম-অবগাহনের পথকে চিনে চিনে জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়েই আমাদের পথ চলতে হয়। জাগ্রত রাখতে হয় ভেতর আর বাইরের দুই চোখের দৃষ্টিকেই। আর এই কারণেই কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন, ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে।"[২১] আলোর বৃত্তে স্পষ্ট হয় ছবি। "কবিতা নির্মাণে তিনি একজন চিত্রীর ভূমিকায়। সুন্দর একটি কন্যার কল্পিত মুখ চিত্রিত করার পর চিত্রী যেমন ছবির মেয়েটির ঠোঁটের কোণে একটি ছোট তিল এঁকে মেয়েটির হাসিকে মোনালিসার মতো স্বর্গীয় করে তোলেন, অলোকরঞ্জনের কবিতায় শব্দ ব্যবহার ঠিক তেমন।"[২২] তাঁর শব্দের চমকপ্রদ সংস্থাপন এবং চিত্রের সূক্ষ্ম রেখা পাঠককে নাড়িয়ে দেয় নিশ্চিতভাবে। কাজেই তাঁর কবিতার বৃত্তে একবার নিমগ্ন হতে পারলে, মানব

জীবনের গভীরতর ব্যাথার মধ্যেও বুকে ভরে ওঠে আনন্দ, মগ্ন হওয়া যায় সত্যের কলকাকলিতে। তখন বিশ্বসংসার ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাগুলো জীবনের বিস্তীর্ণ সৈকত জুড়ে জেগে ওঠে।

"মানুষজন
যে যেখানে আছে ভালো থাকুক।"[২৩]

তথ্যসূত্র :

১। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৯
২। তদেব, পৃষ্ঠা-১১
৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১১
৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
৫। দাস, সঞ্জীব, 'অলোকরঞ্জনের গোধূলিলগ্নের কবিতা : একটি মূল্যায়ন', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১৩৬
৬। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৫
৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১৭
৮। রায়, অঞ্জনা দেব, 'বাংলা কবিতার অন্যতম কারিগর ও শিক্ষক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১৫২
৯। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৬
১০। সিংহচৌধুরী, রজতকান্তি, 'অলোকরঞ্জনের কবিতায় চিত্রকল্প : বৈশিষ্ট্য ও বৈভব', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১৭২
১১। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৯
১২। সিংহচৌধুরী, রজতকান্তি, 'অলোকরঞ্জনের কবিতায় চিত্রকল্প : বৈশিষ্ট্য ও বৈভব', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১৫৬
১৩। গুহ, কালীকৃষ্ণ, 'মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহরের স্তব্ধতায় অলোকরঞ্জন', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-৫৪
১৪। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-২২
১৫। গুহ, কালীকৃষ্ণ, 'মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহরের স্তব্ধতায় অলোকরঞ্জন',

১৬। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৪
১৭। সরকার, সুজিত, 'অলোকসামান্য অলোকরঞ্জন', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-৬৭
১৮। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩১
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫
২০। মজুমদার, জহর সেন, 'অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আবহমানের ভুবনে', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-৭৪
২১। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানুষের কবির রক্তে অমূর্ত আগুনের কথা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১০৩
২২। সোম, দেবকুমার, 'অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা : পুনঃপাঠ', সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকা (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সংখ্যা), ধানবাদ, চতুর্দশ সংখ্যা-৩১ জুলাই ২০২১, পৃষ্ঠা-১১১
২৩। দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো', অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৯

ম হা শ্বে তা চ্যা টা র্জি

বিশ্বলোকে স্পন্দিত সুর : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ‘যৌবন বাউল’

মেধা, মনন, মনীষা আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে যাঁকে বারংবার; তিনি আর অন্য কেউ নন, তিনিই সাহিত্যিক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য-ই হোক কিংবা গঠন, শব্দচয়ন অথবা ব্যঞ্জনাধর্মিতা—কবি অলোকরঞ্জন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। অদ্ভুত এক রহস্যময়তা, গীতিধর্মিতা, জীবনের প্রতি আস্থাশীলতা এবং প্রগাঢ় প্রশান্তি রয়ে গেছে তাঁর কবিতা জুড়েই। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হয় তাঁর কবিতা লেখা। কবিতা ছুঁয়ে যায় একের পর এক অনুভূতি। জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয়। কর্মসূত্রে তাঁকে জার্মানিতে বসবাস করতে হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। সাতাশি বছর বয়সে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে থেমে যায় তাঁর কলম। ভাবলেও বিস্ময় জাগে তাঁর চিন্তাধারা, বিশ্ববীক্ষার পরিসর, উন্নততর চেতনপ্রবাহ যে খ্যাতি বা সম্মান তাঁকে এনে দিয়েছিল, তিনি সেই মানটুকু আগাগোড়া বজায় রেখেছেন। মানুষজনের সঙ্গে সাবলীল ব্যবহার, কিংবা বিষয়ভিত্তিক মতামত প্রদান —তিনি সর্বক্ষেত্রেই ছিলেন নম্র, ভদ্র এবং বিনয়ী।

তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘যৌবন বাউল’ (১৯৫৯), ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ (১৯৬৭), ‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ (১৯৬৯), ‘ঈথার দুহিতা’ (১৯৭১), ‘ছৌকাবুকির মুখোশ’ (১৯৩৭), ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৯৭৩), ‘গিলোটিন আলপনা’ (১৯৭৭), ‘লঘু সংগীতে ভোরের হাওয়ার মুখে’ (১৯৭৮), ‘জবাবদিহির টিলা’ (১৯৮২), ‘দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে’ (১৯৮৩), ‘দুই বন্ধু’ (১৯৮৪), ‘এবার চলো বিপ্রতীপে’ (১৯৮৪), ‘ঝরছে কথা আতস কাঁচে’ (১৯৮৫), ‘ধুনুরি দিয়েছে টংকার’ (১৯৮৮), ‘জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়’ (১৯৯৪), ‘তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন’ (১৯৯৬), ‘অস্তসূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা’ (১৯৯৭), ‘এখনও নামেনি বন্ধু নিউক্লিয়ার শীতের গোধূলি’ (১৯৯৯), ‘সমস্ত হৃদয় শুধু ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে আছে’ (২০০৬), ‘দুধে-আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি’ (২০০৮), ‘গোলাপ এখন রাজনৈতিক’ (২০০৮), ‘ছড়া খুঁজতে তেপান্তরে’ (২০০৯), ‘বয়েসের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে’ (২০১০) প্রভৃতি।

‘ছায়াপথের সান্দ্র সংলাপিকা’ (১৯৯৪), ‘অতন্দ্র গোলাপ’ (১৯৮৬) নাটক গুলি তিনি রচনা করেন। এছাড়াও প্রবন্ধ, গল্পগ্রন্থ, অনুদিত গ্রন্থও রয়েছে তাঁর।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘যৌবন বাউল’, এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির দিকেই মূলত আলোকপাত করবো আমরা। ‘যৌবন বাউল’ কাব্যগ্রন্থের ‘বিভাব’ অংশেই কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। পটভূমিকায় যতই গাঢ় হোক অন্ধকার তিনি হাল ছেড়ে দিতে রাজি নন। নীরবে তিনি ময়দান ছেড়ে দিতেও রাজি নন। ভগবানের গুপ্তচর যদি মৃত্যুও হয়, তবু তিনি কবিতা

লেখা ছাড়বেন না। এই পৃথিবীর বুকেই কবি তাঁর জীবনী শক্তিটুকু পেয়েছেন, সেই আলোকেই তিনি উদ্ভাসিত।

'বুধুয়ার পাখি' কবিতাটিতে কবি যেন এঁকেছেন এক দীর্ঘ পরিক্রমণ পথ। সেই বাউল সাধকরা যেমন আবিষ্কার করেন গূঢ় সাধনতত্ত্বের খুব সহজ সরল রূপগুলিকে। 'বুধুয়ার পাখি' কবিতাটিও উন্মুক্ত করেছে সেই বিশ্বলোকের অসীম দুয়ারখানি। বুধুয়া খুব সহজেই শহুরে, কৃত্রিম আস্ফালন টের পেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে তার গ্রামের নির্মলতাটুকু কতখানি খাঁটি। সেখানে প্রকৃতিই সবটুকু জুড়ে বিরাজ করে। অখ্যাত স্থান বুধুয়া যেন ক্রমশই সংকুচিত হতে থাকে।

তারপরে দেখি বুধুয়া বিশ্বলোকের সন্ধান পায়। নীল আকাশের ঔদার্য তাকে বিস্মিত করে। ঠিক তারপরেই সে সকলের খুশির আধার হয়ে ওঠে। আসলে এই খোঁজটুকুই অনবরত করে চলি আমরা। নিজেরাই নিজেদের বৃত্তকে ভাঙি এবং গড়ি এভাবেই চলতে থাকে জীবনের সফর।

'অরণ্যমধু' কবিতায় লক্ষ করি কিছু মানুষ শখ পূরণ করতে ছুটে আসেন গ্রামে, মধুর লোভে উপভোগ্য সবকিছুকেই টেনে ছেনে দেখে নেন। তারপর মন ভরে গেলে সবকিছু ফেলে দিয়ে প্রস্থান করেন। বনের আদিম বাসিন্দারা ভাবতে বাধ্য হন ,তারা সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। শান্ত, সরল, বনচারি মানুষজন ভাবিত হয়ে পড়েন। আস্তে আস্তে তারাও বুঝতে শুরু করেন।

"অরণ্যমধু ভরে নিতে মৌচাকে
শহুরিয়া যত গ্রামে কেন বাঁধে ডেরা?"[১]

এই সরল সত্য উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত যে তাদের ঘটেছে একথা কবি জানিয়েছেন। ঠিক যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

"একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।"[২]

সেই সব শহুরে মধুলোভীরা ঠিক ফিরে যাবেন সবটুকু শোষণ করে নেবার পরই।

'অবিনশ্বর' কবিতায় হেরে যাওয়া, বিধ্বস্ত মানুষও জেগে ওঠে, ব্যথার জোয়ার ঠেলেও তারা অদ্ভুত জীবনীশক্তি নিয়ে জেগে ওঠেন। জীবনের সবটুকু চড়াই-উৎরাইকে স্বীকার করে নিয়ে তারা বলে ওঠেন —'তবুও ভেবোনা কিছু। আছে সব আছে।'—যেন এই প্রাণ সুধা জাগিয়ে রাখে তাদের।

এই যে বারংবার জেগে ওঠা, এ যেন নিজেকেই জাগিয়ে রাখার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। মায়া—মমতার নিবিড় বন্ধন যে আঁকড়ে ধরে থাকে আমাদের। কখনো দৃশ্যত আবার কখনো অলক্ষ্যে অবিনশ্বর সেই কবিরই সত্তা যেন নিজের অজান্তে বলে যান—

"তবুও ভাবিনা কিছু। আছে, সব আছে।।"[৩]

ঈশ্বরের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরেই এসেছে। কখনো তাঁর মনে হয়েছে ঈশ্বর নেই, স্বপ্ন রয়ে গেছে। আবার কখনো তিনি দ্বিধান্বিত। ঈশ্বরকে তিনি পেয়েছেন। সেই ঈশ্বরকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদকে তিনি বারবার অনুভব করেছেন।

'বন্ধুরা বিদ্রুপ করে' কবিতায় এক চূড়ান্ত বেদনা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। কবিতার প্রথমেই কবি বলেছেন যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন বলেই বন্ধুরা তাকে বিদ্রুপ করে। আসলে বন্ধুদের উপর চূড়ান্ত বিশ্বাস উনি রাখতে পারেন নি। তাই ঈশ্বরই হয়ে উঠেছেন আশ্রয়। মৃত্যুর অপেক্ষা নিয়েই তারা জীবনপথ পাড়ি দেয়। 'যৌবন বাউল' তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ, মাত্র ছাব্বিশ বছরের তরুণের মনে ঈশ্বরকে নিয়ে যতটা দ্বিধা থাকার কথা তা কবি অলোকরঞ্জনেরও ছিল। তাই কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দলে
চলে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর বলে।।"[৪]

এক্ষেত্রে কবি সন্দিহান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে সব সময় উপলব্ধি করা যায় না। তবু মনের কোণে এক খন্ড বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর তার ছিলই; একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

আসলে ঈশ্বর কোনো রাজকীয় আড়ম্বর পূর্ণ ভাবনা নয় তাঁর কাছে। ঈশ্বর একান্ত, নিজস্ব এক অনুভব; যাঁকে হৃদয় দিয়ে স্পর্শও করা যায়। 'একটি শবযাত্রা' দুটি স্তবকে বিন্যস্ত, ছয়টি পঙক্তি নিয়ে রচিত এই কবিতায় কবি লিখেছেন; অন্তিম শয্যায় সাদা আবরণটুকু উঠিয়ে দিলেই দেখা যাবে সেখানে কোনো মৃতদেহ নেই। তবে জলজ্যান্ত কান্নার কলরোল তোলা মানুষগুলিই এক—এক জন মৃতদেহ স্বরূপ।

'Mary Elizabeth Frye. Do not stand at my grave and weep' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়। 'Do not stand at my grave and cry; I am not there. I did not die.' সত্যিই তো কোনো মৃতদেহ সেখানে নেই। এই পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, মাটিতে মিশে গেছে সে। রয়ে গেছে সেই সবকিছু পৃথিবীরই অংশ হয়ে।

"ঈশ্বর নেই' হাওয়া দেয় টিটকারি!
'ঈশ্বর নেই' দিগন্তবিস্তারী
কালো হাওয়া ঘোরে; আলোর প্রবাহ চলে,
আর, যেতে যেতে অন্তিম শৃঙ্খলে
বাঁধা পড়ে যদি অচল হিমার্ণবে,
কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে?"[৫]

'যৌবন বাউল' কাব্যগ্রন্থের 'কী বলতে হবে, কি করে বলতে হবে' কবিতায় ঈশ্বর নেই একথা মানতে নারাজ কবি। বার বার তিনি প্রশ্নাতুর। গদগদচিত্তে ঈশ্বরের অস্বিত্বকে নিয়ে

বাড়াবাড়ি রকমের ভক্তি প্রদর্শন করেননি তিনি। তিনি যখনই মেলাতে পারেননি বুকের ভেতরে ঘটে যাওয়া অস্থিরতা অথবা টানাপোড়েনকে তখনই যেন লীন হয়েছেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আশায়। মাতা, প্রেমিকা এবং ঈশ্বরের এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্নিবেশ এই কবিতায় চোখে পড়ার মতো। আসলে সবটাই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

'মেঘের মাথুর' কবিতাটিতে মাথুর প্রসঙ্গ এসেছে অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ এসেছে। সেই মাথুর অর্থাৎ সুদূর প্রবাস। এখানে মেঘের চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি মেঘ নিবিষ্ট হয়েছে। তারপরই জন্ম নিয়েছেন ঈশ্বর। এই ঈশ্বর নিশ্চয় খুব আপনার জন। যে ঈশ্বরের আদি অন্ত আমরা জানি না। উদ্ভব বিকাশ নিয়ে ভাবনার তর্কের কোনো বিরাম নেই সেই ঈশ্বরকে কী সহজ সরল দৃষ্টিতে দেখেছেন বা বলা যায় ভেবেছেন কবি এই নশ্বর ঈশ্বরই কী আমাদের আরাধ্য !

"এক মেঘ থেকে আরেক মেঘের সাঁকো
গাঁথতে গেলেন, কিন্তু নিথর শূন্যে
মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর।।"[৬]

আসলে ঈশ্বর বড় একা। তাঁর নিজস্ব পরিসরে কেউ নেই কোনোদিন। সব মানুষের পাপের বোঝা বহন করতে করতে তিনি বড়ই পরিশ্রান্ত। শূন্যতার লীলাক্ষেত্রে ঈশ্বরকে বাধা যায় না। ঈশ্বর এই পৃথিবীরই আলো, হাওয়ায় মিশে রয়ে গেছেন। তাঁকে বাইরে খুঁজতে গেলে বৃথা মনস্তাপ ছাড়া আর কিছুই হাতে থাকে না।

'আমার ছায়া' কবিতায় কবি জানাচ্ছেন- 'জীবন মরণের দুই পাহাড় যন্ত্রণার'—এ যেন দ্বীপান্তর স্বরূপ পৃথিবীতে, সবার সবটুকু পাপই অপ্রমাণিত। আমার ছায়া পড়ে হয়তো বা সর্বত্র। আলোর দিকেই যেন প্রিয়ার মুখকে তুলে ধরে। আগামীর হাতে তিনি তুলে দিতে চান সবটুকু। কবির নিজের ছায়া অর্থাৎ নিজস্বতাগুলি যেন আগামীর হাতে সুরক্ষিত থেকে যায়।

সেই সীমা এবং অসীমের চিরায়ত দ্বান্দ্বিক অবস্থান। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে দোলাচলতা যেন মানবের ভিতরে এক চিরায়ত জিজ্ঞাসার বীজকে সযত্নে লালন করে। 'শরীর ফুরিয়ে গেলে' কবিতায় ঈশ্বরের পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়াবার কথা উচ্চারিত। মায়াময় বস্তু জগতের আর কোনো রকম মোহ আবিষ্ট করে রাখবে না কবিকে। বিভেদের সব রেখা মুছে যাবে, যেন অন্তর্লীন হয়ে যাবেন ঈশ্বরের সঙ্গে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে যেখানে কোনো সীমারেখা থাকবে না।

"আর এই শরীরের আলাদা গড়ন
যন্ত্রণা দেবে না, আমি বিচ্ছেদের কোনো যন্ত্রণায়
কষ্ট তো পাব না, শুধু স্পর্ধাঋজু ধূপের মতন
তর্জনী আঙুলটাকে সূর্যে রেখে আনন্দে পোড়াব।"[৭]

শরীর হয়তো নশ্বর, তা একদিন ফুরিয়ে যাবেই কিন্তু অবিনাশী আত্মা যে ফুরোবার নয়। একদিন ওই ঈশ্বরের সঙ্গেই তিনি একাত্ম হয়ে রয়ে যাবেন এই স্থির বিশ্বাসের উপরই কবি আস্থাশীল।

'নিষিদ্ধ কোজাগরী' কাব্যগ্রন্থের 'তুমি কি চেয়েছ শুধু নম্র নবনীত' কবিতায় কবি জানাচ্ছেন—

"ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে
অনাচারী নাম যদি রটে তো রটুক;
যার পদতলে বাঁচি তার বাহুমূলে
কদম্বপরাগগন্ধ; যে আমার বুক
ভেঙে দিয়ে চলে গেছে তার সঙ্গে যদি
তোমার তুলনা করি, কিংবা যদি তার
গভীর চুলের কাঁটা তোমার হাতে দি'
তবে তুমি ক্ষুণ্ণ হবে? ভীষণ মিথ্যার
মূকাভিনয়ের চেয়ে সত্য স্বাভাবিক
তবে কেন চাও তুমি নম্র নবনীত?"[৮]

বিপথগামী কবিতার ভাষাকে কবি ছড়িয়ে দিতে চান। এ কবিতায় ঈশ্বর যেন নারীকে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জেগে উঠতে বলেছেন। সেসব পুরোনো বহুব্যবহার্য ক্লিশে মোড়ককে ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরূপে বিরাজমান হতে বলেছেন। এখানে সত্য, স্বাভাবিক, স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করেই জীবনপথে এগিয়ে যাবার অনুষঙ্গটি এসেছে। আসলে যে ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কোনো ফর্মই নেই তাঁকে তো সব রূপেই দেখা যেতে পারে। আদ্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী কবি অলোকরঞ্জন সেই ছবিকেই এঁকে গেছেন।

'একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে' কবিতাটি কবি সন্তর্পণে, আলতো ছোঁয়া দিয়ে যেন রচনা করেছেন। যেখানে কোনো ক্ষোভ, অভিযোগ নেই। নেই প্রেমাস্পদকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যাচিত উত্তর খোঁজার তাড়া। আছে কিছু প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মৃদু হাওয়ার মতো স্নিগ্ধতা মাখিয়ে যে কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন— তার আবেদন যেন অনন্ত প্রেমের কাছেই:

"তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধূলি হল।"[৯]

সেই যে কথা ছিল গোধূলি নামলে সবটা সহজ হয়ে যাবে। সে হয়ে উঠবে তারই মতো—এই সরল আর্তিটুকু যেন হৃদয়ছোঁয়া মুহূর্ত সৃষ্টি করে। কীর্তি বিনাশক পথে বয়ে

যাবে নিম্নগতির নদী, পথের সমস্ত কাঁটা দলিত হবে। যেন সেই গোধূলিবেলায় প্রেমাস্পদের বেশে আসবেন ঈশ্বর; কথা ছিল।

'এই যে তুমি বলেছিলে'—আসলে সে-ই ত্রাতা; যার কাছে সবকিছুর সমাধান আছে। হয়তো প্রাণেশ্বর, হয়তো প্রেম, হয়তো বা মনের মানুষ — যাকে মানসচক্ষে দেখা যায় না। কোনো এক মুহূর্তে সব নির্মোক খসে পড়বে সেই আলোকে ভেসে উঠবে আকাঙ্ক্ষিত সেই মুখ। অরুন্ধতী ও তার স্বামী বশিষ্ঠের সমীপে সমস্ত কিছু ভুলে সমর্পণ করবে। সেই রাত্রিও সন্নিকটে উপস্থিত, তার আভাস দিলেন কবি।

সেই একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকী ঘটে গেছে। কিন্তু সমর্পিত প্রাণ মানে না আগল। প্রাজ্ঞ, স্থিতধী এই যৌবন বাউল। পাগলপারা স্রোতে ভেসে গিয়েও যেন অভিমানের জলতরঙ্গ বাজতেই থেকেছে তাঁর হৃদয়ে। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের এ এক স্মরণীয় কবিতা হয়ে রয়ে গেছে।

'যৌবন বাউল' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পরতে পরতে লেগে রয়েছে ভিন্ন স্বাদের কবিতার সুর। এক শিল্পীত ঈশ্বরের পদচারণায় মুখর হয়েছে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা। ঈশ্বর বিশ্বাসের যেন এক নব ভাবনা রূপ পেল। মননের তীব্রতা, ভাবনার গভীরতা তাঁর কবিতাকে যে মাত্রা প্রদান করেছে তা বাংলা কবিতার ইতিহাসে স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছে; একথা অনায়াসেই বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যৌবন বাউল, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২।
২। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌরীন ভট্টাচার্য (সম্পাদক) প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প: দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নবম দে'জ সংস্করণ : ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৮৩।
৩। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যৌবন বাউল, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৭।
৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০।
৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭।
৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৭।
৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৮। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা সমগ্র (প্রথম খণ্ড), প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ১৭৩।
৯। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যৌবন বাউল, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৪০।

শা ন্ত নু সা হা

"বাছুরের খুরে যতোটুকু ধুলো ওঠে / তার বেশি নয়"—এক আত্মবিলোপী অলোকরঞ্জনের অহংবর্জিত 'অলোকরঞ্জনার' নিবিড় পাঠ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) 'হাওয়ার পা' শীর্ষক কবিতায় জীবনের এক সরল সমীকরণের কথা লিখছেন, "আঙ্গিকের জটিল সঙ্কেতে / সহজ ভাবে দম নিতে শিখলেই / মঞ্চ ছেড়ে জীবনে যেতে হবে"[১], যা তার একান্ত ভাবে অনুভূত এবং যার রেশ বজায় থাকবে আজীবন তার সাহিত্য সৃষ্টির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। বাংলা সাহিত্যের দিকপতিদের একজন, জার্মান সাহিত্যবোদ্ধা, বিশ্বসাহিত্যের রসজ্ঞদের ভিতর একজন হয়েও তাঁর কবিতার মূলভাব আপাতভাবে সহজ ও জটিলগঠনতন্ত্র বর্জিত। জীবনানন্দীয় বাংলা সাহিত্য যখন কৃত্তিবাসী সুনীল, শক্তি, সন্দীপন ও কবিতা সিংহের ডানায় ভর দিয়ে মস্ত একটা লাফ দেবে ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনার ভিতরে, ঠিক সেই জীবনানন্দের পরবর্তী সময়ে 'যৌবন বাউল'(১৯৬৯) নিয়ে বাংলা কবিতার পাঠকদের দরবারে উপস্থিত হলেন অলোকরঞ্জন। শুরু থেকেই নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র। নিজস্ব বয়ান পদ্ধতি, শব্দচয়ন ও চিত্রকল্প নির্মাণের ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন শুরুর দিনগুলো থেকেই। সবচেয়ে বিশেষ দিক কবিতায় অযথা জটিল আবহ তৈরী না করা। সহজ কথা সহজ করে বলতে পারার যে দক্ষতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে, /সহজ কথা যায় না লেখা সহজে",[২] তাকে অর্জন করা বিশেষ সাধনার পরিচায়ক। অলোকরঞ্জন মাটির কাছাকাছি থেকে বিশ্বের চূড়া ছুঁয়েছেন তাঁর সাহিত্য বীক্ষণ দ্বারা। শৈশবের সাঁওতাল ভূমে লালিত পালিত হয়ে যেভাবে পৌঁছে গেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানীগুলোয়, এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত তাঁর কবিতার বিবরণে ছড়িয়ে আছে। তাই রিখিয়া থেকে রাজস্থান হয়ে রাইখস্ট্যাগ পর্যন্ত তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও সার্বজনীন, একই সঙ্গে চিরায়ত ও একক, একই সঙ্গে ঘরের ও বাইরের কবি হয়ে তাঁর যাতায়াত চলতে থাকে কবিতা থেকে কবিতায়। কিন্তু এত কিছুর ভেতরেও তাঁর কবিতার শিরদাঁড়া গ্রথিত থাকে প্রকাশের দৃঢ় সরলরেখায়। অযথা জটিলতার বাহুল্যে নয়, ঋজু ও সাবলীল সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সমসাময়িক ও ভবিষ্যতের কবিদের ভিড়ে নিজেকে অপরিহার্য করে রেখেছিলেন। অনাবশ্যক মেদ অর্জনের একদম বিপরীতে গিয়ে তিনি লেখেন নির্ভার কবিতায়, "এবার তবে গৃহকে বলো গেহ/এমন কি ঐ দুর্ভার ঋফলা/সরাও"।[৩] সারাজীবন কীভাবে জীবনের অপ্রাসঙ্গিক ভার বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা থেকেও আবেগের মোহময়তা, মায়া অঞ্জন ও পরনির্ভরতা একদম ছেঁটে ফেলতে চেয়েছেন তাঁর কবিতাগুলো সেই সাক্ষ্য বহন করে। যে সময়ে তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেছেন, বিশ্বসাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের (ism) ছড়াছড়ি। যখন, সাহিত্য বিশেষত

কবিতা, আধুনিকোত্তর মতবাদের আঙ্গিকে বিভিন্ন ফর্ম ও স্ট্রাকচারের দ্বারা স্থাপত্যের শীর্ষবিন্দু গুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলো, অর্থ থেকে অর্থান্তরের পাণ্ডিত্য পরিমাপ করে নিচ্ছিলো অহরহ পুরাণ ও প্রত্নচিন্তার আদি প্রতিমার নবনবসৃজনে, ঠিক সেই সময়ে অলোকরঞ্জন অনুভব করলেন স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়ার অনিবার্যতা। তাই অনতিবিলম্বে ঘোষণা করলেন, "শুধুমাত্র প্রথম সংস্করণের/তিনটি বই আগলে রেখে নানা/অদরকারি শ্যাওলাঝিনুকশামুক/সরাও, সরাও"।[৪] শুধু "জিপ্সিদের দেওয়া/চিকন ঐ বেতের চেয়ার খানা/থাকুক"[৫]; কারণ সে যে কোনো এক ফেলে আসা, হারিয়ে ফেলা প্রেমের নিদর্শন; যা একান্ত ভাবেই পার্থিব সম্পত্তির বোঝা বাড়ায় না। তাই থেকে যাক শুধু ভালোবাসার নির্মেদ নিয়ন্ত্রণ, বাকি সব কিছু তো বাহুল্যমাত্র।

কবির এই মনোভাব, যা তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায় ছড়ানো, কোনো আকস্মিক উপলব্ধি নয়। তাঁর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক দিনগুলোর প্রতিফলন কবিতার ভেতরে উঠে আসে। যেভাবে তিনি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে মিশে মিশে নিজেকে মাটির ভীষণ কাছে এনে শিকড় ছুঁয়েছেন, তাঁর প্রতিটি অনুভবের প্রতিফলন যেন কবিতার ভেতরে তাকে আতিশয্যের বহুল ব্যবহার থেকে বিরত রাখে। তাই চাইলেও যেন তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন না বাক্য, শব্দ, ব্যঞ্জনার বাগাড়ম্বরে। নিজেকে ভীষণ সংযত রাখেন, আভরণহীন রাখেন। তাঁর কবিতা রচনার ম্যানিফেস্টোর মতো উঠে আসে নিচের পংক্তিগুলোতে :

> "মাঠে মাঠে ওই ঝুমুর কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী
> ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি?
> ভুলে গেলি কেন কথা ছিল তোর সবার সঙ্গে অঝোরে মিলব,
> সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই-তো আমার জীবনশিল্প।"[৬]
>
> (দুপুর : নির্জন দিনপঞ্জী ৫২)

এই অমোঘ উচ্চারণ তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয়। আর শুধু নিজের কথা নয়, 'যৌবন বাউল'-এর মতো প্রথম কাব্যগ্রন্থেই কবি পাঠকের কাছে বা তথাকথিত কাল্পনিক প্রেমিকার কাছে (বা পাঠক কি কবির একধরণের প্রেমিকা বা প্রেমিক নয়?) আবেদন রাখেন একইভাবে ভারহীন হওয়ার, "তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে / সহজ হবে তুমি আমার মতো?"[৭] ('একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকী'১১৪)। লেখক ও পাঠকের মধ্যে এই সহজ সমঝোতা কবির লেখকজীবনের শুরু থেকেই একটি নির্দিষ্ট যাত্রাপথ নির্দেশ করে দেয়। এর পরেও তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে লিখবেন। কিন্তু কোথাও যেন তাঁর এই কবি স্বভাব সারাজীবনের কবচ ও কুন্তল হয়ে থেকে যাবে। ব্যক্তিগত ঘটনা-দূর্ঘটনা, সংবেদ ও নির্বেদ- যা খুব সহজেই কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারতো — তিনি সযত্নে পাশ কাটিয়ে যান। আধুনিকতার যে প্রেক্ষাপটে তাঁর যাত্রা শুরু — বিশ্বযুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে যখন নতুন করে মানবসভ্যতা মাথা

তুলে দাঁড়াবার সাহস দেখাচ্ছে, বা দেশীয় প্রেক্ষাপটে যেখানে বহিঃর্দেশীয় নিয়ন্ত্রণ কাটিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে নিজের দেশ - তিনি লেখার মুখটা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এই বাইরের অভিমুখ যে তিনি এক প্রবণতায় পরিণত করেছিলেন স্পষ্ট বোঝা যায় যখন তিনি সমসাময়িক লেখক বন্ধুদের লেখালিখির আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "শঙ্খ ঘোষ ছিলেন আলোকের (সরকার) মতোই নিভৃতচারী, আমি তাকে বাইরের দিকে টেনে আনি"[৮]। এই অন্তর্মুখী 'আমি' থেকে এক সামাজিক 'আমি'-তে যাতায়াত, কোনো নির্দিষ্ট মাপদন্ডে মেপে রাখা মুশকিল শুধু নয়, বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। তাঁর এই তাগিদের পেছনে তাঁর লেখালিখির শুরুর প্রাথমিক দিনগুলো বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন নিজেকে তৈরির সৃজন প্রক্রিয়া জারি ছিল। অলোক সরকারের 'শতভিষা' পত্রিকায় লেখার সময়ে নিজের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছিলেন। অলোক সরকারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'শতভিষা'য় যে কবিতাগুলো প্রকাশিত হচ্ছিলো সেখানে 'ব্যক্তিগত' কবিতার পরিবর্তে 'ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত' কবিতা তাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। অলোকরঞ্জন সেরকমই একটি 'ব্যক্তিত্বের' বহিঃপ্রকাশ। দীপ্তী ত্রিপাঠী 'এ কালের প্রেমের কবিতা' সংকলনে কবি পরিচিতি দিতে গিয়ে লেখেছেন। "রবীন্দ্রনাথ থেকে রিলকে পর্যন্ত কবিদের স্বাক্ষরে অলোকরঞ্জনের কবিমানস ঋদ্ধ। একটি স্বচ্ছ প্রজ্ঞাবান মানসের তিনি অধিকারী"[৯]। বিশ্বসাহিত্যের এই একনিষ্ঠ পাঠক নিজেকে যত্ন করে সাজিয়ে তুলেছিলেন ভবিষ্যতের জন্য। তাই 'ব্যক্তিগত' চর্চার থেকে উদ্ভূত যে অহংবোধ, তার থেকে ভারমুক্ত হওয়ার অবিরত প্রয়াস তাঁর লেখার ভিতরে ছিল। 'সহৃদয়' কবিতায় তাই বক্তিগত আত্মকেন্দ্রিক শিল্পচর্চার থেকেও বড় যে বহির্জগৎ, প্রান্তিক মানুষের সাহচর্য, সেই আবশ্যিক প্রেক্ষাপটে উনি লেখেন:

"যদি তাঁর লেখা নতুন উপন্যাসে
পঁচিশ পাতার পরেও মন না আসে
ইস্তফা দিয়ে মননের সন্ন্যাসে
আদিবাসীদের সঙ্গে সহজ যুক্তাক্ষরে মেতে যাব জুমচাষে!"[১০]

শিকড়ের টানকে অগ্রাহ্য করা বস্তুত অসম্ভব বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আসলে উনি আরেক বিশিষ্ট কবি অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে যা বলেছেন, একই বক্তব্য তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সুপ্রযুক্ত, "অমিয় চক্রবর্তীর যে কবিতাগুলি আমাকে টানে, তার মধ্যে একটা সজল পার্থিবতা লেগে আছে"[১১]। এই পার্থিবতা ভোগবাদী জীবনের বস্তুবাদী (materialistic) কলুষযুক্ত জীবনচর্যার অঙ্গীভূত নয়। বরং এই পৃথিবীর রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ কে ছুঁয়ে ছেনে যে বেঁচে থাকার নিষ্কর্ষ প্রস্তুত হয় তার একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বয়ান। যেজন্য অমিয় চক্রবর্তী কে এক 'সুনশ্বর' কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন, তিনি জানেন নিজেও একই দলভুক্ত। কারণ বেঁচে থাকার অনিবার্য শিকড় থেকে মাটিকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনই

ক্ষণস্থায়ী হলেও এই জন্মের আধার আমাদের একান্ত নিজের এই পৃথিবী। তাই একই সঙ্গে নশ্বর আর নান্দনিক মূল্যবোধের শৈল্পিক মিশ্রণ ঘটিয়ে নিচ্ছিলেন ক্রমাগত তাঁর লেখালিখির ভেতরে। 'অনবদ্য এই নশ্বরতা' কবিতায় অনেকটা জন কিটসের " To One Who Has Been Long in the City Pent" কবিতার ধাঁচে একটা দিন বাংলার গ্রামে গ্রামে (এখানে শান্তিনিকেতন) কাটিয়ে যখন কলকাতা ফেরেন, অন্তরে বেঁচে থাকার মধ্যে এক অতিন্দ্রিয় সুখের বহিঃপ্রকাশ হয়:

"কলকাতায় ফিরে আসবার পথে মৃত্যু থেকে সাময়িক অব্যাহতির প্রতীক
হরিচন্দনের ভোরে মাটি থেকে দিগ্বলয় গামী
কাটোয়া ডাঁটার সবুজাভ
বলো তুমি পছন্দ করোনি?"[১২]

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি খেয়াল করেছেন কীভাবে কবি তাঁর কবিতায় "নিতান্ত চলতি এবং অত্যন্ত পুষ্পল শব্দকে"[১৩] একই আধারে ধারণ করেছেন। অলোকরঞ্জনও যেন প্রকৃত অর্থে ও বাচ্যার্থে নিতান্ত সহজ বোধ্যের সঙ্গে গূঢ়ার্থকে মিলিয়ে দিয়েছেন; বা বলা ভালো সরলতার অন্তরাল দিয়ে তিনি এমনভাবে অনিবার্য জটিলকে পাক দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন, (এলিয়ট প্রস্তাবিত) 'দীক্ষিত পাঠক' ছাড়া তাদের মর্মোদ্ধার নিতান্তই একস্তরীয় হয়ে দাঁড়াবে। এবং তাঁর এই প্রকল্প যেন তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে পাঠগ্রহণের ফল। উনার নিজের বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

"মধুসূদন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সাদৃশ্য এইখানে যে তারা দুজনেই স্বগতকে তদ্গত করে তুলেছেন। এবং কারুকার্যের অন্তরালে আপন-আপন আর্তিকেও এঁরা লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের 'এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে / জ্যোতির্ময় কর বঙ্গে-ভারতরতনে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি লজ্জা দিয়ো না'—দুটি উক্তিই চিরায়ত আত্মসংবরণের দৃষ্টান্ত। উভয়ক্ষেত্রেই রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ধ্রুপদী বীজমন্ত্রে সংবৃত। ধ্রুপদী কবিতা, সুতরাং বিষয়বস্তু নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না, তা একান্তভাবেই কারুকৃতিসম্ভব।"[১৪]

একইরকমভাবে অলোক রঞ্জনের কবিতাও এই 'কারুকৃতিসম্ভব' বা 'workmanship' এর উজ্জ্বল উদাহরণ। অহরহ দেখি কবিতার ভেতরে শৈলী নিয়ে বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা; সবটাই মূলত সুনিবিড় ভাবে নিজের 'আমি' কে মুছে দেওয়ার চেষ্টা। 'পথের ধারে'-এর সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ পাঠককে তাঁর প্রচেষ্টার একটা সবিশেষ ধারণা দিতে সক্ষম:

"আসা-যাওয়ার পথের ধারে
প্রায় প্রতিদিন লক্ষ করি
রাধিকামোহন মৈত্র
বসে আছেন মোড়ার উপর

তাঁর উপরে সৃজনচৈত্র
ঝরে না আর তিনি এখন
সৃষ্টিবিহীনতার সৃষ্টি
মাঝে-মাঝে গানের উপর

দু'তিনটে প্রবন্ধ লেখেন
তার নিজস্ব সরোদখানা
ছাত্র —তীর্থযাত্রিকদের
বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন

অনন্তমূল প্রজ্ঞানন্দে"।[১৫]

আপাত সহজ, অথচ কী ভীষণ গভীর; আপাত নির্ভার, অথচ অস্থিরতার কেন্দ্রজুড়ে ভাবনার সতত বিচরণ পাঠককে বাধ্য করে পুনঃপাঠে। বারো লাইনের হালকা চলন ভারসাম্যে আছে শেষ লাইনের ভাবগম্ভীর উপস্থাপনায়। শিল্পী কীভাবে শিল্পের চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে এক প্রজ্ঞা লাভ করেন; এমন এক ভাবসমাধির পর্যায়ে পৌঁছে যান যে তাঁর আপাত বসে থাকাও এক মিস্টিক (mystic) দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পাঠের জৌলুশহীনতা পেরিয়ে পরবর্তী পাঠগুলোতে পাঠক লক্ষ্য করতে বাধ্য হয় স্তর থেকে স্তরান্তরের আভাস। অনেকটা কাছাকাছি তাঁর বুদ্ধদেব বসুর গদ্য রচনার সম্বন্ধে করা মূল্যায়ন, "বুদ্ধদেবের গদ্যের এই প্রাঞ্জলতা বা প্রসাদগুণ , প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রতারক। 'সুহৃদ সম্মিত'/ 'কান্তাসম্মিত' গদ্যের প্রপঞ্চ —নিপুণ আয়োজন ঘটিয়ে তিনি প্রথম মুহূর্তেই পাঠককে জিতে নেন, অতঃপর স্বীয় সিদ্ধান্তের আনুকুল্যে তাকে দীক্ষিত করেন"[১৬]। উনার ক্ষেত্রে যদিও সাধারণ পাঠক সেভাবে এসে ভিড় করে না কবিতার দোরগোড়ায়, কিন্তু যারা আসে তারা 'সঙ্গোপনে অলকরঞ্জনায়' দীক্ষিত হয়ে ওঠে।

তিনি এক শব্দ-সন্ধানী কবি। সচেতন শব্দের প্রয়োগ তাঁর নিজস্ব শৈলী নির্মাণের পরিচায়ক। এই প্রয়োগের দৃষ্টান্ত টানতে আবশ্যিকভাবে জীবনানন্দের কথা চলে আসে[১৭]। এবং তিনি যে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি তাঁর কবিতা গুলো তারই প্রমাণ দেয়। তাই 'কনকঅম্বরম', 'বালার্করক্তিম', 'হরিদ্রাকুঙ্কুম', 'বিদ্যুৎরুচিরা', 'হেনার মঞ্জরী', 'অলকরঞ্জনা', 'মৃত্যুমিথুনশাল' ইত্যাদি অজস্র শব্দ বা শব্দবন্ধের ঝাঁক এসে তাঁর লেখা কে ঋদ্ধ করে। আসলে ওঁই 'নিতান্ত সরলের' সঙ্গে 'পুষ্পল' এর মিশ্রণের মতো উপায় খোঁজেন নিজেকে সমকালে ও আবহমানে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য। তাই কবিতার অর্থ খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও পরীক্ষা হয়। সে প্রস্তুত তো কবিতার পাঠোদ্ধার করার জন্য? শিল্পকলা, সাহিত্যের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সমাজমনস্কও তো? সমসাময়িক পৃথিবীর গতিবিধি তাকে ভাবায়?

সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক বড় চ্যালেঞ্জ, এটা জেনেও যে তাঁর এই প্রয়োগ কিছুটা

হলেও পাঠকদের তাঁর কবিতার কাছে পৌঁছতে একটা দেওয়াল তৈরী করতে পারে। যেমন ঠিক উলটোদিকে তাঁর সমসাময়িক বাংলায় শক্তি, সুনীল, শঙ্খ, কবিতা সিংহরা কবিতার শুরুতেই পাঠককে আচম্বিতে টেনে নেন তাঁদের নিজস্ব লেখন প্রক্রিয়ায়। বিপ্রতীপে হয়তো তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে তাঁর পাঠক যেন তাঁর লেখার জগতে অবগাহন করতে প্রস্তুত হবে। তাই এতো কাব্যগ্রন্থ, এতো পরীক্ষানিরীক্ষা। সাঁওতাল গ্রামের মাটির গন্ধ থেকে দেশীয় রাজনীতির আঙ্গিনা পেরিয়ে কবিতায় ঢুকে পরে শরণার্থী শিবির, উপসাগরীয় যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সমস্যা ইত্যাদি। এই সব লেখায় বিশ্বময় চিন্তনের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন, ধরাবাঁধা গণ্ডীর সঙ্কীর্নতায় কখনো আঁটকে যায় নি তাঁর কলম। ব্যক্তিগত আবেগের রোমঞ্চক বহিঃপ্রকাশ কখনো অস্বচ্ছ করে দেয়নি তাঁর প্রকাশ পথ। ভীষণ সচেতন ভাবেই পরিহার করে গেছেন আত্ম-কণ্ডূয়নের স্বাভাবিক সংরাগগুলো। তাই তাঁর কথাতেই, "স্বচ্ছ এই শালিকের মতো/কবে হবে আমার হৃদয়"?[১৮] যদিও জীবনের চলার পথ ততটা সহজ নয় এবং বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলো বারবার কণ্টকিত হয়ে পড়ে; ভাবনার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েও কবি অপেক্ষায় থাকেন তার। তাই যখনই নিজের বর্তমান জীবন সারাদিনের বিস্তর কর্মকান্ডের পরে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে, মনে পড়ে, "যে শহরে তোমার অঙ্কুর, / তাঁর শান্ত লোকালয় থেকে কতোদূর কতোদূর / এসেছ এখন তুমি, জানো?/ না-ই যদি জানো তবে মিথ্যে এই কবিতা বানানো"[১৯] ("পথে বিপথে" ৬২)। তিনি স্পষ্ট করে দেন কবিতা লেখা তাঁর কাছে জীবন যাপনের সমান- কোনো সাময়িক রোমাঞ্চের মনোতুষ্টি নয়। তাই সুদীর্ঘ জীবনে কখনো কবিতা লেখায় ভাঁটা আসেনি। 'যৌবন বাউল'-এর বিভাব কবিতায় ঘোষণা করেন, "মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর/ ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না"[২০]।

এই ভাবে রাবিন্দ্রীক 'আনন্দ- বোধ'-এর এক উত্তরসাধক হয়ে উঠেছেন ক্রমশঃ। তাঁর অনুভবে এই জাগতিক সমস্ত কলুষ, কালিমা, হিংসার একমাত্র রোগহর হোলো 'আনন্দ' তাই তিনি লেখেন, "অন্ধকার থেকে অন্ধকারে / প্রাণের আনন্দ যাও, প্রাণের আনন্দ/আমি একা, নাও গো আমারে"[২২]। এই অন্ধকার 'আলোর অধিক'; এই 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো' তাঁকে পথ দেখাবে। কবিতাযাপন তাই কবির কাছে বোধি লাভের মতো। ক্রমান্বয়ে তিনি অর্জন করে নিয়েছেন অস্তিত্বের চূড়ান্ত দর্শন গভীর অনুধ্যানে। বৌদ্ধিক ধ্যানমগ্নতায়, গম্ভীর আত্মসংযমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন আগত অনিশ্চয়তার জন্য। তিনি প্রস্তুত, তিনি জানেন, "অল্প কথাও ভাঙতে পারে/পাহাড় দিয়ে পাহাড়"[২৩] ("কুয়োতলায়" ১১৩)। এই 'মিতভাষ' চয়ন তাঁর সচেতন এক প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি কবির শেষ বয়সের গদ্য কবিতার বিশ্লেষণে এক প্রাণিধানযোগ্য মন্তব্য করেন, "রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও বিষয়ীর অনতিরিক্ত, মিতাক্ষর সংযম আয়ত্ত করে নিতে পারছেন না; তাঁর রচনায় তীক্ষ্ণ বাঙময়তার বদলে এসে যাচ্ছে বদান্য কথকতার সুর কবিতার বাইরে সরে এসে নিজের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে ফেলেছেন"[২৪] ("মাঘের সূর্য

উত্তরায়ণে"২০)। এইভাবে রবীন্দ্র-সমালোচনা হয়তো অলোকরঞ্জনই পারেন; রবীন্দ্রনাথের লেখার একনিষ্ঠ পাঠক, যিনি লেখককে ঠাকুরের বেদীমুলে বসিয়ে নয়, এক শিক্ষিত আলোচকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেন তাঁর সম্পুর্ণ পাঠের সাবলীল অভিজ্ঞানে। একজন লেখক সম্পূর্ণ হয় তার নিবেদিত পাঠকের সাহচর্য্যে। অলোকরঞ্জন নিজেও তার খেয়াল রেখে গেছেন সারাজীবন। রবীন্দ্রনাথের "শেষ সপ্তক" কবিতার বিশ্লেষণে তিনি দেখাচ্ছেন :

"ছ'লাইনের মধ্যে 'আমিত্বে'র ব্যবহার ঘটে গিয়েছে সাতবার, অহংকারহীনতার দাবি থাকলেও egotistical sublime বা মহান-অহংয়ের এই অস্বস্তিকর পৌনঃপুনিকতার ফলে এখানে না ফুটেছে ব্যক্তিসত্তার অমীমাংসিত অনাশ্রয়িতা, না ফুটে উঠেছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ অমসৃণ পরিপার্শ।"[২৫]

তাঁর এই আলোচনা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের রোম্যান্টিক পিরিয়ডের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর কথা স্মরণ করায়। জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১) তার এক চিঠিতে সমসাময়িক বিশিষ্ট কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) এর কবিতার (বিশেষত একটি নির্দিষ্ট সীমবদ্ধতার) প্রসঙ্গে "egotistical sublime" শব্দবন্ধের সূচনা করেন। বরেণ্য কবির সঙ্গে নিজের লেখার পার্থক্য করতে গিয়ে তিনি খেয়াল করেন যে দুই জনের লেখার ভেতরে একটি চরিত্রগত পার্থক্য থেকে গেছে, "As to the poetical Character itself I mean that sort of which– if I am anything– I am a Member— that sort distinguished from the wordsworthian or egotistical sublime— which is a thing per se and stands alone"[২৬] ("john-keats.com")। তিনি লক্ষ্য করেন পূর্বজ কবি ভীষণ ভাবে নিজেকে প্রবিষ্ট করে দেন লেখালিখির ভেতরে, নিজেই চরিত্র হয়ে উঠে আসেন। যেখানে অন্যদিকে কিটস নিজের 'poetical character' হিসেবে তুলে ধরেন তার অমোঘ ভাবনা যা ভীষণ ভাবে আধুনিক, যা ভবিষ্যতের আধুনিক সময়ের এলিয়টের কবিতার ভাবধারার পূর্বসুরী :

নিজেকে 'Camelion (Chameleon) Poet' হিসেবে তুলে ধরেন, যার নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিগত চরিত্র নেই, কবিতার প্রয়োজনে বারবার নিজেকে যে পালটে ফেলতে পারে, অনেকটা তরল পদার্থের মতো, "A Poet is the most unpoetical of anything in existence— because he has no Identity-he is continually in for and filling some other Body"[২৮] ("john-keats.com")। নিজেকে একেবারে লুকিয়ে ফেলার যে ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন, যার তাত্ত্বিক নামকরণ করেন "negative capability"। অহংসর্বস্ব 'আমিত্ব' বর্জন করার এই মানসিকতা তিনি সেক্সপিয়রের মধ্যেও দেখেছিলেন, যা প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বগ্রাসী এক লেখক সত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সর্বস্ব গ্রহণ করে সর্বস্বের ভিতর নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া কোনো

ব্যক্তিত্ব-সূচক চিহ্নের লেশমাত্র না রেখে — এই লিখন শৈলী অলোকরঞ্জনেরও করায়ত্ত। তাই তাঁর যেকোনো প্রস্তাবেই এই মতামত উঠে আসে, "আমার কি ভয়? আমার শরীর বলে/ কিছুই তো নেই, আমার শরীর বাতাসে আলপনা, আমার শরীর শুধু এই ডানহাত; / এই হাতে কবিতা লিখব ("কনকঅম্বরম ফুল, আগে এর নাম তো শুনিনি)"[২৯]। রূপকার্থে লেখা এই কবিতায় রক্ত মাংসের এই সঘন অস্তিত্বকে (যার ওপর নাম অহং) সগৌরবে অস্বীকার করে দেওয়াই তাঁর অর্জিত প্রজ্ঞা।

উপরিউক্ত রবীন্দ্র-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বিবর্তনের একটি সামান্য দিক যাকে নজরে আনতে গিয়ে অলোকরঞ্জন যেমন তাঁর শেষ পর্বের লেখালেখিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বারোপের কথা বলেছেন, ঠিক সেই সময়েই আবার সমালোচক আবিষ্কার করছেন চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে যিনি তাঁর ছবির ছায়াতে-আলোতে ভীষণ ভাবে নৈর্ব্যক্তিক। অলোকরঞ্জনের এই আলোচনা যতোটা না রবীন্দ্রনাথের এই 'ambivalence' কে চেনাতে সাহায্য করে; তার চেয়েও বেশী নিজের কবি-জন্মের অভিমুখ কে সর্বদা যেন এই "objective" বাতাবরণের ওপর সুস্থির রাখার চেষ্টা। নিজেকে কতটা তিনি সচেতন ভাবে বিবিক্ত রাখেন অর্থহীন স্বার্থমগ্নতা থেকে তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বিনিময়' কবিতা। ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যমাত্রা যখন কবিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির করেন তাঁর সমস্ত যান্ত্রিক পাণ্ডিত্য লাভের আধার — বইসমূহ-:

নিম্নদরে

"পুরনো বইয়ের কোনো দোকানীকে দিয়ে দেব ডেকে
মাঝে মাঝে এক-একটা বই
ধার করে নিয়ে পড়ব তার কাছ থেকে:
তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলব ব্যস্ত সে যতই"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের "তোতাকাহিনী"-র মতো কেঠো, যান্ত্রিক সবজান্তাভাবের আড়ালে মানুষ যখন ক্রমাগত সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে (আধুনিক সময়ের দুরারোগ্য ব্যাধির মতো), আত্মম্ভরিতার মুখোশের পেছনে নিজস্বতা চাপা পড়ে যেতে থাকে, ঠিক তখনই তো সব ছেড়ে ছুড়ে ভিড়ের ভেতরে এসে বসার সময়। বহমান সময় কে অতিক্রম করে কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপ হওয়ার বাসনা তাঁর কখনো ছিলো না। আবার এটাও ঠিক যে তাঁর এই ভাবনাচিন্তার প্যাটার্নের ভিতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা কে কখনো অস্বীকার করেন নি। তিনি জানেন এবং মানেন রবীন্দ্রনাথের মতো, "ইন্দ্রিয়ের দ্বার/রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার"[৩১] (tagoreweb-in)। একেবারে অস্তিত্বের নির্বাপনে , ব্যক্তিগত কামনা বাসনার পরিত্যাগে, জীবন তৃষ্ণার যথোপযুক্ত চাহিদা না মিটিয়ে থাকা সততার পরিচয়ায়ক নয়। তাই "যা সংসার সেই-তো নির্বাণ" এ লেখেন:

"আমি কিন্তু নির্বাণ ভালোবাসি না
ভারতবর্ষের, আমি বিশেষত কলকাতার ভাটিয়ালি ছেলে
নির্বাণ ভালোবাসি না, আমি আজ
ভবানীপুরের পার্কে রক্তজবা দুই হাতে সংকলন করি।"[৩২] (২০২)

কবিতার এই আমি কিন্তু ভীষণ ভাবেই কবি নিজেই। কিন্তু এই 'আমি'র মাধ্যমের প্রয়োজন বোধ করেছেন জীবনের উপান্তে এসে নিজের 'দাঁড়াবার জায়গা' টা পাঠকের কাছে পরিস্কার করে দেওয়ার জন্য। সারাজীবনের শেষে এসে নিজেকে জাহির নয়, বরং এক অস্থির সংকোচের মতো জেনে নিতে চাইছেন পাঠক তাঁকে ভুল বুঝে গেলো না তো আজীবন? যে সমাজমনস্কতার জন্য তিনি আত্মমগ্নতা ছেড়েছেন, পাঠক এমন যেন না ভাবে যে তিনি আবেগী নন। "দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে, / কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি"[৩৩] ('দৃশ্য-কাব্য'১০৯) - তার অর্থ কিন্তু এটা নয় যে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করে শুধু সমসাময়িকতার চর্চা করেন কবিতার ভিতরে; তার কবিতা কোনো ম্যানিফেস্টো নয়, নয় কোনো তাত্ত্বিক দর্শনের আঁতুড়ঘর। প্রজ্ঞাচর্চার সঙ্গে তিনি পাগলামিও রাখেন; হয়তো বয়ানের ধরণ টা আলাদা। তাই উপরিউক্ত কবিতায় পাঠক কে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন তাঁর অবস্থান-ভারতবর্ষ থেকে কলকাতা হয়ে একেবারে ভবানীপুরের ক্রম-ক্ষুদ্র হয়ে আসা গলির মোড়ের নেমে এসে পাঠকের খুব কাছে এসে দাঁড়ান। যেন ফরাসী কবি ব্যোদলেয়রের মতো বলে উঠবেন, "Hypocrite readerœ You! My twin! My brother!"[৩৪] ('fleursdumal.org')-যেখানে পাঠকের সঙ্গে আন্তরিক যোগসূত্র সাধিত হওয়াটা খুব জরুরী। তাঁর রিডার রা যেন তাঁকে নিজের বলে চেনে, নিজেদের প্রতিফলন তাঁর ভেতরে ফুটে ওঠা দেখতে পায়। কিন্তু আবার তিনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, শিল্পী, কবি — একটা নান্দনিক ব্যাল্যান্স তিনি বজায় রাখেন, "যা সংসার সে-ই তো নির্বাণ-/ এই মনে করে আমি স্থির হতে থাকি/ দু-দলের খেলা দেখি সব-কিছু বাসনা থামিয়ে"[৩৫] (২০২)। শিল্পী সত্তার প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী 'দেখা'র কাজটি সম্পাদন করেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে। এই নিরপেক্ষতাবোধ অলোকরঞ্জন কে যুগোত্তীর্ণ কবিতে পরিণত করে। ব্যক্তিগত লাভ, লোকসান, কামনা , বাসনা থেকে দূরে থেকে তিনি ঘোষণা করেন, " তার চেয়ে বরং / তোমাদের মাঝখানেই / গচ্ছিত করে দিই আমাকে"[৩৬] ('মানুষের কাছে' ২২৩)। 'তোমাদের' আর 'আমার'এই সম্পর্ক একেবারে স্ফটিকস্বচ্ছ। তিনি তার আত্ম-কেন্দ্রিক অহংবোধ কে সমূল বিনাশ করতে পেরেছেন সে বিষয়ে তাঁর কবিতাই শেষ কথা। যদিও কবি সত্তার এই অহঙ্কার কবির কাছে মূল্যবান এক অলঙ্কারের মতো, তবু এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আধুনিক নিরাশাবাদের বিরুদ্ধে কবি — প্রকৃত দ্রষ্টা- হয়ে উঠতে গেলে আদপেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রয়োজন। তাঁর মতে:

"কবি (কে) আজ, বিংশ শতাব্দীর প্রায়ান্ধকার এই অদ্রিচূড়ান্তে সভ্যতার সমস্ত কিছুর

জন্য দায়ী হতে হবে। সেজন্য প্রথম দায়ভাগ বোধহয় নিজের অহংকে নির্বাপিত করে ফেলা। এ প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, অহং চলে গেলে কবির আর কীই বা বাকি থাকল! বাকি থাকল, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে স্পন্দমান তাঁর মনুষ্যত্ব, কবিতা নামক মূল্যবোধ এবং অপরাপর কবির প্রতি অনপনেয় বিশ্বস্ততা যাদের অভাবে হয়তো উৎরে যাওয়া কবিতা লিখে ওঠা যায়, কিন্তু উত্তীর্ণ কবিতা লেখা সম্ভব হয় না।"[৩৭] ('মৌলতা, মৌলিকতা'৪৭৯)

নিজেকে কতটা নমনীয় করে তোলা গেলে, কতটা 'ego'-রহিত করা গেলে এই প্রগাঢ় অনুভব সঞ্চারিত হয় কবিতার শিরায় শিরায়, তাঁর অমোঘ উদাহরণ অলোকরঞ্জন নিজেই। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহারে 'অনপনেয় বিশ্বস্ততা' —বোধ থেকে সঞ্জাত কয়েকটি পঙক্তি কবির কবিতাকে অবশেষে 'উত্তীর্ণ' করে দিয়ে যায়ঃ

"আমি সকলেরে
স্পষ্টত বলেছি, যদি যেতে হয়, তাহলে তোমরা
আমার ভিতরখানি ফুঁড়ে ঝাঁঝরা করে ওদিকের
দিগ্বলয়ে যেতে পারো বহিত্র চালিয়ে; এইভাবে
যাবার পথটা বড়ো হতে-হতে আমার শরীরে
মহাশূন্য গড়ে উঠবে- দ্বিতীয় আকাশ যেরকম—
এবং ওদিককার দিগন্তদর্পণে মাথা ঠুকে
আমার ভিতর দিয়ে ফিরে আসবে তোমরাও একদিন!" [৩৮] ('আমার ভিতর দিয়ে বহিত্র চলুক তোমাদের' ৪০)

তথ্যসূত্র :

১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৪
২. https-tagoreweb.in.Versesùkhapchhara.117.utsargo.3637
৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৫৯
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২০
৭. ঐ
৮. সুজিত সরকার। নশ্বর কবি অবিনশ্বর কবিতা। বিয়ন্ড হরাইজেন পাবলিকেশন, আলিপুরদুয়ার, ২০২২
৯. সরস সাহিত্যচর্চা। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। অবভাস, কলকাতা, ২০০৮
১০. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬

১১. সুজিত সরকার। নশ্বর কবি অবিনশ্বর কবিতা। বিয়ন্ড হরাইজেন পাবলিকেশন, আলিপুরদুয়ার, ২০২২
১২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭
১৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গদ্যসমগ্র , ১ম খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১
১৪. ঐ
১৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
১৬. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গদ্যসমগ্র , ২য় খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১
১৭. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গদ্যসমগ্র , ১ম খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১
১৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২০
১৯. ঐ
২০. ঐ
২১. ঐ
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গদ্যসমগ্র , ২য় খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১
২৫. ঐ
২৬. http-www.john-keats.com.briefe.271018.htm
২৭. ঐ
২৮. ঐ
২৯. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২০
৩০. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
৩১. https-tagoreweb.in.Verses.naibedyo-43-boiraagyasaadhane-mukti-se-aamaarnay3284
৩২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
৩৩. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২০
৩৪. leursdumal.org-poem-099
৩৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
৩৬. ঐ
৩৭. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গদ্যসমগ্র , ২য় খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা, ২০২১
৩৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবিতাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭

স্ব প ন প্রা মা ণি ক

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে সংকট ও উত্তরণ

বাংলা কাব্যসাহিত্যে ষাটের দশক তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের গুণ-লক্ষণ থেকে অনেকটা আলাদা। চল্লিশের সময়কালের বিশ্বযুদ্ধ ও তার বিশ্বব্যাপী অনিবার্য প্রতিক্রিয়া কিংবা বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলায় দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশবিভাগ-ছিন্নমূল জীবনযাপন ও বিপর্যস্ত মানসিকতার চিত্র ছয়ের দশকের কালকে প্রভাবিত করেনি। বরং এই সময়ে সমাজে কিছুটা সুস্থিতি ফিরে আসে। ষাটের কবিদের কাছে ছিলো না কোনো বড় মাপের প্রাতিষ্ঠানিক অনুগ্রহ। বিশুদ্ধ জীবনচর্চা ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনার দিকে অগ্রসর হয়েছিল কবিমন। এই পর্বে তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একমাত্র শ্রমিক কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে লিখেছে—

"কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুর কারখানার একজন শ্রমিক কবি।"[১]

তিনি শ্রমিক। শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতি তাঁর গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে লেখনীতে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কর্মসূত্রে অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন শ্রমিক জীবনের হালহকিকত। তাঁর কাব্যের পরতে পরতে রূপায়িত হয়েছে শ্রমিক জীবনের দিনলিপি। দুর্গাপুর অঞ্চলে তিনি 'কেষ্ট মামা' নামে সুপরিচিত।

নানান প্রতিকূলতায় কবির স্কুলের গণ্ডী পার করা সম্ভব হয়নি ঠিকই, তবে গভীর প্রত্যয়ে স্ব-শিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হয়েছিলেন। বাল্য-কালে ফুটবল খেলা আর গান শোনার ঝোঁক ছিল ভীষণ। কবিতা লেখার সূত্রপাত বারাসাতের নবপল্লীতে থাককালীন। সেই সময় কিছুদিন শিশুদের পাততাড়িতে কাজ করেন। এরপর দুর্গাপুরে কর্ম জীবনেই কবিতা লেখার একটা গভীর ভাবাবেগ কাজ করে। এর অনুপ্রেরণা হয়ত চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কারখানার সাধারণ শ্রমিকদের জীবনচিত্র, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিষণ্ণতা গ্রাস করেছিল তাঁকে। তিনি বিষাদে নিমজ্জিত হননি। সেখান থেকে উত্তরণের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, দুঃখ থেকে আনন্দের, ভাঙা থেকে গড়ার সংগীত লিখে গেছেন অবিরত। একজন সহজ-সরল-দৃঢ়চেতা কবির সৃষ্টি ভাষাও অত্যন্ত সহজ-সরল। সাবলীল ছন্দ ও কাব্যময় ভঙ্গিতে জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। বক্তব্য বিষয়কে অকারণে শব্দের নির্মানে ধোঁয়াশা সৃষ্টি বা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি।

তিনি মানবতার পদস্খলনকে মানতে পারেননি। সুবিধাবাদকে ঘৃণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানবিক মূল্যবোধের পথ হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। পরিবর্তে সুবিধাবাদের পথ গ্রাস করছে অহোরাত্র। সকলেই প্রাপ্তি চাইছে। এর মধ্যে একদল অর্থের দিকে ছুটে চলেছে। অন্যপ্রান্তে যৎসামান্য কাজ করেই নাম-যশের কাঙাল হয়ে পড়ছে। মানুষের কথা ভাবছে

না।"[২] এই মানুষকে নিয়েই কবির চিন্তা-চেতনা। মানুষের মুক্তিই যেন তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল।

৭০-এর দশকে বন্ধুকের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকা মজুরদের স্থায়ীকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি সমাধান করেছেন। জীবনে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন। এই দশকেই দুর্গাপুরের ৬/৮ রাণাপ্রতাপ রোডের বাসায় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অফিস বসে। সন্ত্রাসকালেও সেই সংঘের দরজা কোনওদিন বন্ধ থাকেনি। সংগঠনের কিংবা সংসারের কাজ চালানোর জন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। মাইনে, প্রভিডেন্টের টাকা এবং স্ত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের রোজগারের অর্থেই এসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হত। এতকিছু দেখতে গিয়ে বাড়ির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। একদিন বাড়ি বিক্রি করে ভাড়া বাড়িতে থাকার সংস্থান হয়। পরবর্তিকালে সল্টলেকে নিজস্ব বাড়ি হয়, ঠিকানা আই-এ/২৮৪ সল্টলেক, কলকাতা-৯৭। পেনশন না থাকায় আজও একটা অর্থের বিষণ্ণতা কাজ করে। তবুও তিনি মচাকাননি। একে একে লিখে চলেছেন জীবনের জয়গান। বিষণ্ণতা তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় ছাপ ফেলতে পারেনি, রুদ্ধ করতে পারেনি সৃষ্টিশীল মনকে। এখনও পর্যন্ত তাঁর ২৩টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত।

কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে তাঁর অবিচল আস্থা। ছোটবেলায় বাড়ির পরিবেশ, ভগ্নিপতি কমরেড ড. নরেশ ব্যানার্জী, দাদা জ্যোতিবিকাশ এদের সান্নিধ্যে মার্কসীয় দর্শনকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট আর্দশ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "আসলে কমিউনিস্ট কালচারটা আয়ত্ত করতে গেলে অনেক সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হয়। মানবিক হতে হয়। এই বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ী একটি পক্রিয়া।"[৩] ইস্পাত কারখানার কঠিন শ্রমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে একজন শ্রমিকের অন্তরে কবিতা লেখার কোনও ভাব আসা অসম্ভব। অদম্য ইচ্ছায় সেই অসম্ভবের বেড়া ভেঙে সুযোগ পেলেই তিনি লিখতেন দু'চার ছত্র। হয়ত কবিদের বাজারে তিনি নাম পান না, তবুও লিখে চলেছেন অবিরত। তিনি বলেছেন, "এতদ সত্বেও—আমরা লিখি এবং বই প্রকাশ করি। এও এক লড়াই। যা মানুষের জন্য। এবং মানুষের জয়ের জন্যই। জয় হোক, মানুষের জয়।"[৪] মানুষের বিষণ্ণতা থেকে জীবনের জয়লাভ, উত্তরণের কথা তিনি বারবার বলেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে কখনও সমান্তরালভাবে এই দুই বিষয় থেকেছে। কোথাও কাব্যের শুরুতে বিষণ্ণতা তো শেষে গিয়ে জীবন সংগীত রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

১৯৭২ সালে কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শরিক না হলে' প্রকাশিত হয়। তখন তিনি ইস্পাত কারখানার স্থায়ী কর্মী। থাকছেন দুর্গাপুরে রাণাপ্রতাপ রোডের বাসায়। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। একই বছরে বন্ধু অনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতায় যান, লেখক-শিল্পীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। এসমস্ত কিছু সামলেও তিনি লিখছেন কবিতা। যার মধ্যে সময়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিষণ্ণতা আর তা থেকে বেরিয়ে আসা জীবন সংগীত। 'শরিক না হলে' কাব্যের 'অন্য হাতে' কবিতায় এই দুইয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত—

"এক হাতে বিষাদ নিভাই
বিলোলিত স্মৃতির প্রদীপ
অন্য হাতে জ্বালাই আলোক
গড়ি শুধু জীবন সংগীত।"[৫]

সময় যতই গড়িয়েছে ততই এই মিলিত ভাবনা নব নব রূপে কাব্যের মধ্যে কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন। 'শরিক না হলে' নাম কবিতায় কবি যে 'সুখে নেই' তার উল্লেখ করেছেন। তবুও কবিতার শেষে বলেছেন—"আছি বেশ, দুঃখের এ যন্ত্রণায় আকাশ কাঁপিয়ে দিন হতে দিনে।"[৬] কবি যেন শরিক হয়েছেন মানুষের দুঃখের।

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কবিতার পটভূমি সংবাদ'। কবিতার পটভূমিতে তিনি যে সংবাদ পরিবেশন করতে চেয়েছেন তাতে রয়েছে অনেক জিজ্ঞাসা। বিষাদ পিছু ছাড়েনি। কমরেড রমেন দাসকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'সব পথ ঘুরে ' কবিতায় লিখেছেন—

"এ আকাশ মেঘ-চারিদিকে শুধু অন্ধকার
ভয়ার্ত মূর্তিরা থাকে জড়িয়ে বলয়
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে; পিঠেতে দেওয়াল
অতএব কোথায় উপায়
কোনো পথ খোলা নেই...।"[৭]

ওই কবিতায় পরক্ষণেই তিনি আলোর দিশা দেখিয়েছেন—

"...একমাত্র পথ এই—
আনো গভীর বিশ্বাসে প্রচন্ড প্রলয়
ভাঙো
ভাঙো,
ভেঙে আনো মৃত্যুঞ্জয়ী আলো।"[৮]

না ভাঙতে পারলে শোষকের নিগড়, কোনওদিনই অধিকার বুঝে নেওয়া সম্ভব নয়। এই দূরদৃষ্টি তাঁর চোখে বারম্বার উদ্ভাসিত। আমলাতন্ত্রের সুবিধাবাদী-স্বার্থপরতা, লুটেরার ঘৃণ্য স্বভাবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এই কাব্যের মধ্যে।

১৯৬৬ সালের ৫ই অগাস্ট। দুর্গাপুরের বুকে শুরু হয় ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলন। নতুন অফিসের সামনে বোনাস ও ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করার শ্লোগান ঘিরে জমায়েত। একটু অন্ধকার হতেই শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। পুলিশের গুলিতে পরের দিন মারা যায় জব্বর। তবুও কবি দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি। শহিদ জব্বরের প্রতি নিবেদন করে লিখলেন, 'কিছু দিনের পর' কবিতাটি। 'অতঃপর চৌচির করে দিলে মাথা।'[৯] আর কবিতার শেষাংশে আছে, 'কিছু দিনের পর/ফুল ফুটবে..।'[১০] কিংবা 'দিন আসবেই' কবিতায় লিখেছেন—

"দিন আসবেই
শ্রমিকের ঘাম ঝরে
জংধরা পাষাণ শিকলে
তা ভাঙবে ভাঙবেই
সারা বুক জুড়ে
ফুটপাত-এর শিশু হাসবেই
দিন আসবেই।"[১১]

এত এক মানবদরদী, শ্রমিকদরদী কবিরই চিন্তনের ফসল। ব্যুরোক্র্যাট, 'নিঃস্ব আছি সারাজীবন' এর মতো কবিতায় জীবনের গান উচ্চারিত।

'স্বাধীনের এই স্বাদ' (১৯৭৬) কাব্যের মধ্যে নিজেকে চিনে নেওয়া, সময়কে বুঝে নেওয়ার প্রসঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে বিষাদ ও জয়গানের মিলিত সুর। 'চিনে নিতে হয়' কবিতায় তিনি উচ্ছেদের প্রসঙ্গ আনলেন—

"রাত যায় হানাদারি অন্ধকার নিয়ে
কলে-কারকানায় আপিসে চলে উচ্ছেদ...।"[১২]

আর পরক্ষণেই লিখেছেন, "অতঃপর প্রতিদিন, অলক্ষ্যে নিভৃতে, রচনার শিকড়ে শিকড়ে/সৃষ্টি হয় আলোর ফাল্গুন।"[১৩]

শহর থেকে বহুদূরে দুর্গাপুরে কবি লিখেছেন তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মনে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। কবিতার ভাব-ভঙ্গিতে কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্ত্বার আভাস পাওয়া যায়। 'সময় আসছে' কবিতায় সেটা বেশ স্পষ্ট —

"পরোয়া কিসের মরণ-বাঁচন
দাঁড়াও এবার রুখে।
নাই-বা বাঁচে এ প্রাণ এখন
বস্তিবাড়ি শহরতলির
চাকরি কোথায়-হালের জমিন
আগুন জ্বলছে রে।"[১৪]

প্রাপ্যটুকু পেতে যখন চোখের সামনে জব্বর-আশিসের মতো শ্রমিকের মৃত্যুকে দেখেন, তখন তিনি চুপ থাকতে পারেন না। বিদ্রোহের লেখনীও তখন সচল হয়।

"মরণবাঁচন আসেই আসুক
মরি মরবই-তাও।"[১৫]

শয়তানি ভাঙার জন্য তিনি আগুন চেয়েছেন। 'সময়ের পদচিহ্ন' কাব্যগ্রন্থের 'যায় না হে' কবিতায় লিখেছেন—

"তুমি
আমার গায়ে কাদা ছুঁড়লে
আমি তা দাঁড়িয়ে দেখব
সে বান্দা আমি নই।"[১৬]

কী স্পষ্ট উক্তি। সত্য কথা জোরাল ভাবে বলতে তিনি কখনও আগে পিছে তাকাননি। প্রতিবাদ করেছেন সামনে থেকে।

১৯৯৭ এর ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশ পায় কবির বহু চর্চিত কাব্যগ্রন্থ 'কমরেডস্ লাইনটা সোজা করুন'। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্টের সতর্কবার্তা। 'ভ্রান্তি' কবিতায় লিখেছেন—

"এখন জানা ও বোঝার মধ্যে বহু গলদ থেকে যাচ্ছে
মাটি চিনতে ভুল হচ্ছে ভীষণভাবে

যারা রোদ-জলে মাঠে কাজ করে, যারা কারখানায় ঘাম ফেলে
তাদের দেখছো না কেউ।"[১৭]

মানুষের জন্য বারবার ভাবতে অনুরোধ করেছেন—

"একটু ব্যর্থতাকে দেখো, যাও, মাটির কাছে যাও
মানুষের জন্য ভাবো, তারা বড়ো কষ্টে আছে।"[১৮]

এই মানুষের জন্য ভাবনাই তাঁকে ব্যথিত করেছে প্রতিনিয়ত। সেই সময় দুর্গাপুর অঞ্চলে একমাত্র সাহিত্য পত্রিকা 'স্বগত'। মার্কসবাদ যার আদর্শ। সেখানেও লেখা পাঠাচ্ছেন। কখনও কমরেড বিমান বসুকে নিবেদন আবার কখনও সলিল কেশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবিতা লিখে চলেছেন। সঙ্গে আছে সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্মের বন্ধন। একে একে কাব্য প্রকাশিত হচ্ছে। 'কিছু যে কথা আছে, কাজ আছে', 'কবি কারও দাস নয়' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে দিয়ে গেয়ে চলেছেন মানুষের জয়গান। 'দিন ঐ ডাকছে' কবিতায় লিখেছেন, "কি বা আছে শৃঙ্খল ছাড়া আর/ভাঙো সব যন্ত্রটা শোষণের।"[১৯] কিংবা 'ঝড় আসছে' কবিতায় লিখছেন, "জীবনটা তো মসৃণ নয়-কুসুম বিছানোও নয়/ভয়াবহ দিন আসছে। হামলা আসছে। এর জন্য মোকাবিলা করতে হবে...।"[২০] এতো কবি জীবনেরই ছবি। মসৃন ছিল না জীবনযাত্রা। ভয়াবহ দিন এসেছে, হামলাও হয়েছে। কিন্তু তিনি শক্ত পেশিতে তার মোকাবিলা করেছেন। সফলও হয়েছেন। মানুষকেও এভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। কবিতাটি পরবর্তীকালে গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪ সালে তিনি দুর্গাপুরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৭ বিধানসভা নির্বাচন। শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে কমরেড দিলীপ মজুমদারের গলায় জয়মাল্য পড়ে। এবছরই কবি কালচার বিভাগের কনভেনার হন। যদিও এই বিভাগের আয়ু

ছিল মেরেকেটে বছর দুয়েক। ১৯৭২-৭৭ সময়কাল পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। এই পরিবেশেই শিল্পী সংঘের দায়িত্ব যেমন সামলাচ্ছেন তেমনি 'হরফ', 'স্বগত', 'রূপায়ণ' প্রভৃতির পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছেন। 'সময়ের পদচিহ্ন'(১৯৮৩) কাব্যের মধ্যে এই সময়কার পরিবেশ ধরা আছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ যেমন, 'আমাদেরও বাড়ি ছিলো', 'বিপন্ন সময়', 'ভীষণ উদ্বগে আছি', 'দিন অস্ত্র দিন', 'শ্রমিক কবির প্রতিবাদী কবিতা' প্রভৃতির মধ্যে যেমন উদ্বেগ-বিষণ্ণতা প্রকাশিত, আছে সেখান থেকে আছে উত্তরণের ভাষা। ২০১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত তাঁর আরও একটি ভিন্নধর্মী কাব্যগ্রন্থ 'আমাদের কাজের মাসি' প্রকাশিত হয়। তিনি যে শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আজও জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছেন তার খাঁটি দৃষ্টান্ত কাব্যটি। কাজের মাসিদের নিয়ে এমন মানবিক ভাবনা বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিরল। স্বপ্ন দেখে কাজের মাসিরাও। ছেলে পড়াশোনা শিখে অফিস যাবে। চাঁদ আসবে ঘরে। অসুখ-বিসুখ তো নিত্যদিন। ছেলের অসুখ, কিন্তু পরের বাড়িতে কাজের সময় বয়ে যায়। ছুটি নেওয়া যায় না বেশিদিন। বর্ষায় বাড়ির চাল উড়ে গেছে, তবুও বাঁচতে হবে। জীবনের এই সংগীতই কবির এই কাব্যে উজ্জ্বল। যেমন, 'বেঁচে যাবে' কবিতায় লিখেছেন—

"দেশের বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে
উড়ে যাচ্ছে খড়ের চাল
এ বর্ষায় সারাতে হবে
নইলে হবে খারাপ হাল।"[২১]

কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, জীবনের তাগিদে প্রাণ বাঁচাতে উপায় খোঁজে তারা। তারপরেই লিখেছেন-

"বাবুর কাছে ধার চাইব
শোধ করব প্রতি মাসে
বেঁচে যাবে নাতি-পুতি
পড়বে বসে মায়ের পাশে।"[২২]

এই বিষণ্ণতা-বেদনা-দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আশার স্বপ্ন দেখাই মাসিদের জীবনকাহিনী। সহজ-সরল ভাষায় অনবদ্য এই কাব্যটি।

১৯৯০ সালে কর্ম থেকে স্বেচ্ছাবসরের পর তাঁর কাব্যচর্চা নদীর ফল্গুধারার মতো বইতে থাকে। শ্রমিকসত্ত্বার মধ্যে আরও দৃঢ় হয় মানবিক চিন্তন। আজও তিনি মানুষের পাশে। তাঁর কাব্যের নাম সঙ্গত কারণেই 'মানুষের সঙ্গ ছাড়িনি'(২০১৪)। শুরুতেই লিখেছেন—

"দুঃখের তাপে পুড়ছে হৃদয়
দাউ দাউ করে জ্বলছে

তবুও মানুষ সচল এখনো
চলছে শুধুই চলছে।"[২৩]

বিপন্ন বোধ করেছেন ঠিকই, তবে থেমে থাকেননি। তাঁর অবিচল উন্নত মস্তক কারও কাছে ঝোঁকাননি। কলকাতায় আসার পর মানুষের দলাদলি, রঙের কোন্দল, বিভাজন, আর্দশ থেকে বিচ্যুতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। গুরুত্ব পায়নি তাঁর লেখা। তবে তার জন্য তিনি কাউকে তোষামোদও করেননি। বই প্রকাশ করেছেন নিজের টাকায়। গ্রন্থ তুলে উপহার হিসেবে। তাতেও পিছন থেকে টিপ্পনী কাটতে ছাড়েনি একদল। সম্মান যে পানানি তা নয়। দুর্গাপুর পুর নিগম, মাধুকরী সাহিত্য পত্রিকা, কফি হাউস পত্রিকা, দুর্গাপুর স্টিল ইন্ডিয়া লিমিটেড বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। 'দেবলা' সাহিত্য পত্রিকা ২০১৭ সালে বাংলা অ্যাকাদেমি সভাগৃহে সম্মান প্রদান করে। ২০২৩ সালে সাহিত্য অঙ্গন সাহিত্য সম্মান লাভ করেন। বিদগ্ধজনেরা তাঁকে বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করেছেন। নন্দ চৌধুরী বলেছেন 'আত্মবিশ্বাসের কবি', ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রতিবাদী কবি', 'আপসহীন শ্রমিক কবি' বলেছেন তারক লাহিড়ী। তিনি এখনও বৃহত্তর অংশে প্রচার পাননি। যদিও কবি খ্যাতির ধার ধারেন না। তিনি যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মানুষের জয়গান গেয়ে যাবেন আমৃত্যু। আর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের জয় হবেই। সুদিন ফিরবেই।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, (সম্পাঃ), কবিতা সংগ্রহ ও বিদগ্ধজনের মতামত, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪।
২. তদেব, পৃষ্ঠা ৫। ৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৫। ৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৬।
৫. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২২। ৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১। ৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩১।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩২। ১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৩। ১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭।
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৫। ১৩. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬। ১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৭।
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৮। ১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।
১৭. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, কমরেডস্ লাইনটা সোজা করুন, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫১।
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৬০।
১৯. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ, নবজাতক প্রকাশন, পৃষ্ঠা ৭৯।
২০. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৮।
২১. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, আমাদের কাজের মাসি, একুশ শতক, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪৩।
২২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩।
২৩. চট্টোপাধ্যায়, কেষ্ট, মানুষের সঙ্গ ছাড়িনি, শ্রমশ্রী প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১০।

ফাল্গুনী তপাদার

প্রসঙ্গ হাংরি আন্দোলন : প্রথাভাঙার গল্প

ষাটের দশককে বাংলা ছোটগল্পের দিক থেকে দেখলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চল্লিশের উত্তাল সময় পেরিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ধারা ক্রমশ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পঞ্চাশের দশকে বিষয়রীতির নবীকরণে ও বিমল করের মতো কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্প ক্রমাগত নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করছিল। তারই প্রতিষ্ঠিত রূপ আমরা দেখতে পাব ষাটের দশকে এসে।

ষাটের দশক একটি আন্দোলনের দশক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একের পর এক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিমল করের 'ছোটগল্প নূতন রীতি'র পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পাশাপাশি আরো কয়েকটি আন্দোলনের জন্ম হচ্ছে এই দশকে। ১৯৬৪ সালে তীব্র চীৎকারে গড়ে ওঠা হাংরি আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের শ্রুতি আন্দোলন অথবা ১৯৬৬-র শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন— সবই পুঞ্জীভূত হচ্ছে এই দশকে। এই আন্দোলনের ধারা সম্প্রসারিত হচ্ছে সত্তর-আশির দশকেও। জন্ম নিচ্ছে নতুন আন্দোলন। ইতিপূর্বে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'কবিতা' কিংবা 'কৃত্তিবাস'কে ঘিরে আলোড়নের কথা জেনেছি। হাংরি আন্দোলনও সাহিত্যে একটা নতুন মাত্রা যোগ করল। হাংরি আন্দোলনের প্রথম ইস্তেহার প্রসঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন :

"প্রথম হাংরি বুলেটিনের প্রকাশকাল নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৬১ ধরে নেওয়া যায়।[১]

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সূচনাপর্ব ১৯৬১-৬২। হাংরির প্রতিশব্দ হিসেবে তাঁরা 'ক্ষুধিত', 'ক্ষুধাতুর' কিংবা 'ক্ষুধার্ত'-র মত শব্দগুলি ব্যবহার করছিলেন। যুক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সাহিত্যকে মুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার মাধ্যমে তাঁরা সাহিত্য রচনা করলেন; রচনার অর্থনির্ধারণের দায়ভার দিলেন পাঠককে। আমেরিকার 'বিট জেনারেশন' ও ব্রিটেনের 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' গোষ্ঠির লেখকেরা যেমনভাবে মূল ধারার সাহিত্যে আঘাত করে জনপ্রিয় হয়েছেন, হাংরি জেনারেশনের কবি লেখকেরাও তাঁদের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করলেন বিট জেনারেশন থেকে। ১৯৬১ সালে পাটনা থেকে ইস্তেহার ছাপিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন মলয় রায়চৌধুরী :

"যা ক্ষমতার নন্দনতত্ত্বে সাহিত্য হিসাবে গণ্য ছিল না তাকেই যারা সাহিত্য করে তুলেছিল, তারা ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়। হাংরি জেনারেশন। ... বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই হাংরি আন্দোলন। ক্ষমতার ভাষাকে ধ্বংস করে নিজের ভাষা আবিষ্কারের পদ্ধতিই ক্ষুধার্ত সাহিত্যের পদ্ধতি।"[২]

'হাংরি' শব্দটি মলয় রায়চৌধুরী প্রথম পেয়েছিলেন জিত্তফ্রে চসারের 'In the swore of hungry time' বাক্যটি থেকে। এই শব্দটিকেই ব্যবহার করা হল আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে :

"বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে মলয়ের তখনো পরিচয় নিবিড় নয়। এই সময়ে হঠাৎ ইংরেজ কবি চসারের 'In the swore of hungry time' পংক্তিটি ঘিরে ধরল তাঁকে। এখান থেকে তুলে নিলেন হাংরি শব্দটি। অসওয়াল্ডে স্পেংলারের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বিষয়ক কনসেপ্টে খুঁজে পেলেন হাংরি শব্দের দার্শনিক ভিত্তি। ... দাদার বন্ধু শক্তিকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করে ১৯৬২-র এপ্রিলে বের করলেন 'হাংরি জেনারেশন।"[৩]

পরিকল্পনা অনুসারে বুলেটিন সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দেবী রায়, নেতৃত্বে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন সমীর রায়চৌধুরী ও মলয় রায়চৌধুরী। পাটনার দরিয়াপুরে এঁরা আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে পাটনা থেকে ইংরেজিতে প্রথম হাংরি আন্দোলনের বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ সেসময় পাটনায় বাংলা ছাপানোর কোনো প্রেস ছিল না। ১৯৬২ সালে প্রথম বাংলা বুলেটিন প্রকাশিত হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বুলেটিন লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে। প্রকাশ করেন দেবী রায়। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত হাংরি আন্দোলনের একশোর বেশি বুলেটিন প্রকাশিত হয়। তবে তার মধ্যে অধিকাংশ বুলেটিনই সংরক্ষণ করা যায়নি। বুলেটিন পরবর্তীকালে পত্রিকার আকার নেয়। ১৯৬২-৬৩ সময়পর্বে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে — সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, ফাল্গুনী রায়, বাসুদেব দাশগুপ্তের মতো লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হাংরি গদ্য রচনার মাধ্যমে এই কবিতা আন্দোলনে অন্যমাত্রা যোগ করেছেন। শুধু বাংলা নয় হিন্দি, নেপালী প্রভৃতি ভাষাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লাতিন আমেরিকাসহ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হাংরি আন্দোলন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। হাংরি মূলত কবিতাকেন্দ্রিক আন্দোলন হলেও এর বুলেটিনে আমরা গদ্য, ছোটগল্প প্রভৃতিও পেয়েছি। বুলেটিনগুলো হ্যাণ্ডবিলের মতো কলেজস্ট্রিট, কফিহাউস প্রভৃতি অঞ্চলে বিতরণ করার ফলে খুব দ্রুত এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে চলেছিল হাংরি আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর, গ্রেফতারী চার্জশিট প্রদান শুরু হয়েছিল। মুচলেকা দিয়ে আন্দোলন থেকে সরেও গিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। হাংরি জেনারেশনের অষ্টম সংখ্যার লেখকেরা প্রত্যেকেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে লেখার মধ্যে অশ্লীলতা থাকার জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মাত্র ছ'জন। ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দীর্ঘদিন এই মামলা চলতে থাকে। ১৯৬৫তে মলয় রায়চৌধুরী ছাড়া প্রত্যেকেই রেহাই পান। ১৯৬৭তে রেহাই পাওয়ার পর মলয় রায়চৌধুরী তাঁর নিজের সম্পাদনায় হাংরি জেনারেশনের নবম ও দশম সংখ্যা প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন 'জেব্রা'। 'জেব্রা-১'-এ সুবিমল বসাকের 'গেরিলা আক্রোশ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই সময় হাংরি লেখকেরা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। প্রকাশিত হতে থাকে 'ক্ষুধার্ত', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'স্বকাল', 'চিহ্ন', 'আর্তনাদ' প্রভৃতি পত্রিকা। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন সুভাষ ঘোষ, দেবী রায় কিংবা সুবিমল বসাকের মতো লেখকেরা। ১৯৬৫ থেকেই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু

করে। যদিও ১৯৭০-এর পর উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বেশ কিছু সাহিত্যিক নিজেদের হাংরি আন্দোলনকারী হিসেবে ঘোষণা করেন। তবুও মূল আন্দোলনের সঙ্গে এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

হাংরি আন্দোলন বাংলা গল্পের সমস্ত পূর্ব ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ভেঙে ফেলেছে গল্পের বিষয়, গল্প-গঠনের সমস্ত রীতি, শব্দ, অর্থ, বাক্যবিন্যাস এমনকী বানানও। প্রসঙ্গত বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা', 'বসন্ত উতব', 'রিপুতাড়িত', 'আনন্দবাজার ও গোয়েন্দা রিপ রিপ', 'দেবতাদের কয়েক মিনিট'—সুভাষ ঘোষের 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট', 'গোপালের নয়নতারা', 'হাঁসেদের প্রতি'—সুবো আচার্যের 'মড়ক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের একটি বক্তব্য স্মরণে আসে :

"বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা সাহিত্যের বা গল্পের পর পুরুষ নন। পুলিশ, হাকিম, প্রকাশক পত্রিকা, সার্টিফিকেট সই করা গেজেটেড সাহিত্যিকরা সবই বিপরীত সাক্ষ্য দিন, বাসুদেব ও সুভাষ এই সময়ের পক্ষে নিতান্ত জরুরি লেখক। আর মাত্র এই কটি লেখাতেই বাসুদেব ও সুভাষ বাংলা গদ্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন তাদের লেখার জোরে।"[৪]

মলয় রায়চৌধুরীর 'ইস্তেহার সংকলন'-এর তৃতীয় রচনা 'ছোটগল্প' (১৯৬২)। এখানে ছোটগল্প প্রসঙ্গে তিনি বলছেন:

"ছোটগল্প আসলে বর্ণনা বিরোধী সূক্ষ্ম একরকমের চোট, মানুষের ছোঁকপ্রবৃত্তির প্রসার। ... ঠুনকো জীবনের আচ্ছন্ন সক্রিয় অরাজকতার স্ফটিক হয়ে উঠবে ছোটগল্প।"[৫]

যদিও হাংরি আন্দোলন মূলত কবিতাকেন্দ্রিক আন্দোলন, কিন্তু এখানে বেশ কিছু গদ্য বা ছোটগল্পের দেখা মেলে। মূলত তিনজনকে আমরা পাচ্ছি — বাসুদেব দাশগুপ্তের, সুভাষ ঘোষ ও সুবিমল বসাক। তাঁদের ছোটগল্প হাংরি আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করছে। তাঁর গল্প পড়ে আমাদের ম্যাজিক রিয়ালিজমের কথা মনে পড়ে। ১৯৬৩ সালে বাসুদেব দাশগুপ্ত বিখ্যাত গল্প 'রন্ধনশালা', 'উপদ্রুত'তে প্রকাশিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে তাঁর বিভিন্ন গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। রতনপুর (দেশ, ১৯৬৪), 'রিপুতাড়িত' (জেব্রা ১৯৬৫), 'অভিরামের চলাফেরা' (জেব্রা, ১৯৬৫), 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' (১৯৬৮, গল্প কবিতা) প্রভৃতি গল্প ষাটের দশকে প্রকাশিত হয়।

বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' খুব উল্লেখযোগ্য একটি গল্প। একটি ভেড়ার বাচ্ছাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা ও তাকে রান্না করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পটি লেখা হয়েছে। শুধু তার মাংস খেয়েই তাঁরা তৃপ্ত হননি; তার নাড়িভুড়ি, শিং, চামড়া কোনোটাই ফেলা যায়নি। এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধার গল্প বলে 'রন্ধনশালা', "দুজনে মিলে খেতে থাকি, ভেড়ার শিং, মাথা, নাড়িভুঁড়ি, চামড়া এইসব।" শুধু ক্ষুধা নয়, নৃশংসতা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় গল্পটিতে, "আমার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের কাছের ছোটো ছোটো কচি কচি হাড়গুলো ভেঙে যাবার শব্দ শুনতে পাই—মুটমুট মুড় মুড় মুড়, আর সেই সঙ্গে খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগে আমার মুখে, ঠোঁটে, নাকের ডগায়।" পাশাপাশি বিকট চেহারার

এক পাখির কান্না, অচেনা মানুষের আক্রমণে গল্পটিতে যেন আরও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। গল্পটি প্রসঙ্গে শৈলেশ্বর ঘোষের একটি বক্তব্য স্মরণে আসে :

"বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' গল্পে সেইসব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ লেখা এককথায় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাবে ক্ষুধা সম্পর্কে অতি সীমিত যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল বাসুদেব এই লেখায় তাকে সুদূরপ্রসারী করে দেন।"[৬]

গল্পটিতে ক্ষুধার নগ্ন রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। গল্পটি যে সময় লেখা হয়েছে ঠিক তার আগেই ঘটে গিয়েছে খাদ্য আন্দোলন। ১৯৫৮-৫৯-এর খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। রাজ্য জুড়ে অনাহার, অর্ধাহার ও ক্ষুধার্ত মানুষের চিৎকার শোনা গিয়েছিল গ্রাম-শহর নির্বিশেষে। মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। গল্পটিতে দেখানো ক্ষুধার ছবি যেন খাদ্য আন্দোলনের স্মৃতিকেই উস্কে দিয়েছে। অন্যদিকে বাসুদেবের 'রতনপুর' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। গল্পটিতে একধরনের ফ্যান্টাসি ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো নায়ককে সাধারণ মানুষ মনে হয় যে গ্রামের তরুণদের কাছে মার খায়, আবার কখনো মনে হয় অস্বাভাবিক। নায়কের প্রেমিকা চুমকি তাকে চুলের মধ্যে সহজেই গুঁজে ফেলে। কখনো সে চুল থেকে গড়িয়ে পড়ে —গাড়ি করে চলে যায়। গল্পে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে দোলাচলতা কাজ করে। কখনো কফিহাউস হয়ে ওঠে রতনপুর গ্রাম :

"বাসুদেবের পরাবাস্তবতার জগতে একবার ঢুকে পড়লে বেরিয়ে আসা কঠিন। ... প্রকৃতপক্ষেই বাসুদেব স্বপ্ন বাস্তবের স্রষ্টা।"[৭]

অতি সহজেই 'একটি প্রেমের গল্পকে প্রস্রাবের গল্পে' রূপান্তরিত করতে পারেন বাসুদেব। প্রেমের যে রোমান্টিক রূপ বাংলা সাহিত্যে বহুদিন ধরে চলে আসছে তাকে 'রিপুতাড়িত' গল্পে একেবারে নস্যাৎ করে দেন লেখক। গল্পে প্রেম কিংবা যৌনতা থাকলেও তা গৌণ করে ওঠে। মুখ্য হয় প্রস্রাবের মত দৈন্যন্দিন কাজ। এই দৈন্যন্দিন কাজের কাছে প্রেমও যে তুচ্ছ হয়ে যায় তাই দেখানো হয়েছে গল্পটিতে। কথক নানাস্থানে গায়িকা তরলার সঙ্গলাভ করার পর শেষপর্যন্ত তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সেসময় তাঁর তীব্র প্রস্রাবের বেগ চলে আসে। তিনি বাধ্য হয়ে তরলাকে অপেক্ষারত অবস্থায় রেখে শহরের এদিক ওদিক জায়গা খুঁজতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি একটি পার্কে এসে পৌঁছলেন যেখানে ঝোপের ধারে এক প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমলীলায় মগ্ন। কথক ঐ ঝোপের ধারেই প্রস্রাব করেন। পরস্পরই নিজেদের কিছু বলেন। প্রেম ও প্রস্রাবকে পাশাপাশি রেখে গল্পের সমাপ্তি ঘটান লেখক। এতদিন ধরে বাংলা গল্পে যে রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হয়েছে তাকে যেন নিমেষেই নস্যাৎ করে দেন লেখক।

'অভিরামের চলাফেরা' গল্পে অভিরামের ভয়-ই হয়ে উঠেছে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। 'লেনিব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' গল্পে বস্তিজীবনের নানাদিক উঠে এসেছে।

এবার চলে আসি সুভাষ ঘোষের গল্প প্রসঙ্গে। সুভাষ ঘোষের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম

'আমার চাবি'। এটি ক্ষুধার্ত প্রকাশনী থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আশির দশকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সুভাষ ঘোষের 'হাঁসেদের প্রতি', 'থ্রু গাড়ির টিকিট', 'গোপালের নয়নতারা', 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প। তাঁর গল্পে সাধারণত কোনো কাহিনি থাকে না। সমালোচক বলছেন :

"সুভাষের লেখায় কোনো গল্প নেই। গল্পকে খুন করেছেন তিনি তাঁর গদ্যে।"[৮]

তাঁর প্রথম গল্প 'হাঁসেদের প্রতি' শুধু ছবির সমাহার। কোনো কাহিনি নেই। কলকাতার রাস্তার চারিদিকে হাঁস। তাদের পাখা, পালক। তারা পরস্পর পদ্মফুল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। কথক নীল শিশি বের করে তরল ছুঁড়ে দেন তাদের গায়ে। তারা কথকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কথকের মনে হতে থাকে কী উপায়ে তাদের কাছ থেকে বেশি সংখ্যক ডিম পাওয়া যেতে পারে। গল্পে যেন উঠে আসে একটুকরো পরাবাস্তবতার জগৎ।

সুভাষ ঘোষের 'নৈশ টেলিগ্রাম' গল্প যেন মৃত্যুর হাতছানি। গল্পে ফ্যান্টাসির জগৎ তৈরি করা হয়। গল্পটি এক যুবকের গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা বলে। গন্তব্যটি হল মনুমেন্টের পাদদেশ। সেখানে নীরা অপেক্ষারত। কিন্তু যুবকটি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে নীরাকে খুঁজে পায় না। এরপরই গল্পের দ্বিতীয়াংশে একটি রুমালের প্রসঙ্গ চলে আসে। চাঁদ যেন নানা টুকরো হয়ে যায়। এরকম একটি অদ্ভুত কাল্পনিক জগৎ তৈরি করেন গল্পকার।

সুবিমল বসাক এই পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর বেশিরভাগ গল্প হাংরি জেনারেশন পত্রিকায়, জেব্রা, গল্প কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। সুবিমল বসাকের প্রথম গল্প 'গেরিলা আক্রোশ' ১৯৬৫ তে জেব্রা-১ সংকলনে প্রকাশিত হয়। একজন তরুণের অস্থিরতার ছবি ফুটে উঠেছে গল্পটিতে। গল্পটিতে হাংরি গল্পকারদের ভাবনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। একটি ডায়েরি, একটি বেতারকথা ও একজন যুবককে কেন্দ্র করে আধুনিক নিঃসঙ্গ জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলেন গল্পকার।

সুবিমল বসাকের 'আগ্রাসী অপকর্ম' (প্রতিদ্বন্দ্বী, ১৯৬১) গল্পটিও ষাটের দশকে প্রকাশিত। গল্পের বিষয় শব্দদূষণ। রহস্যময় শব্দ ও জীবনের একঘেয়েমির দ্বান্দ্বিকতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটি।

বিচ্ছিন্নতাবোধ কিংবা একাকীত্ব বারবার ফুটে উঠেছে সুবিমলের গল্পে। তিনি হাংরি আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। শুধু লেখকই নন, তিনি হাংরি আন্দোলন নিয়ে গড়ে ওঠা আইনী সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আদালতেও যেতেন :

"কেসের হাওয়া দেখে মনে হচ্ছে—আমাদেরই জিৎ হবে। দেখা যাক কফিহাউসে কারো কারো মুখে আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখা যেতে শুরু করেছে।"[৯]

সুবিমল বসাক ছাড়াও সুবো আচার্য, ফাল্গুনী রায়, অবনী ধর, সমীরণ ঘোষ, স্বপন ঘোষের মতো লেখকের কাছ থেকে আমরা হাংরির গদ্য পাচ্ছি। বাসুদেব দাশগুপ্ত। সুভাষ ঘোষ কিংবা সুবিমল বসাকের গল্পে অস্থির জীবনের ছবি ফুটে উঠছে। সময়ের অস্থিরতাকে তাঁরা গল্পে অস্বীকার করতে পারেননি। বহিঃজগতের পাশাপাশি কখনো অন্তর্জগতের কথাও উঠে

এসেছে। কখনো গুরুত্ব পেয়েছে যৌনতা। বাংলা গল্পে এঁদের অবদান বড় কম নয়। সমালোচকের কথার সূত্র ধরে বলা যায় :

"গল্পের বিষয় হিসেবে নিজেদের ও শুধুমাত্র যেন নিজেদেরই উপস্থিত করে অনেক কুসংস্কার দূর করেছেন। গল্পকে আত্মবিষয়ী করে তুলতে পেরেছেন। গল্পের উপকরণের ব্যবহারের উপর তাদের কর্তৃত্বের কোনো সংশয়ের অপেক্ষা নেই।"[১০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. মলয় রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ৫৮।
২. বিমল কর, এই দশকের গল্প, পলাশী, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃ. ১২।
৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, ক্ষুধার্ত সংকলন, দে'জ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৭।
৪. তদেব।
৫. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৮।
৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ. ২৬।
৭. সব্যসাচী সেন, দ্র. হাংরি জেনারেশন রচনা সংগ্রহ সব্যসাচী সেন সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৪।
৮. তদেব, পৃ. ২৫।
৯. সমীর রায়চৌধুরীকে লেখা সুবিমল বসাকের চিঠি (৭.১১.৬৫), দ্র. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত হাংরি সাহিত্য আন্দোলন তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, প্রতিভাস, কলকাতা-০২, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৪৯।
১০. দেবেশ রায়, বিলম্বিত সওয়াল, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা ১৯৭২-৭৩।

প ঞ্চা ন ন ন স্ক র

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রত্যক্ষ জীবন ও চিত্রময়তা

মণীন্দ্র গুপ্ত পাঁচের দশকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বীক্ষার কবি। জীবনকে যিনি সম্পূর্ণ নিজের মত করে দেখেছেন, যাপন করেছেন, অনুরূপভাবে কবিতাকেও। তাঁর কবিতাগুলিতে এক নিঃসঙ্গ, নির্জন, একাকীত্বময় সত্তার উন্মোচন লক্ষ্য করা যায়, যা তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে গভীর সংশ্লিষ্ট। তিনি সম্পূর্ণ ধ্যানময়তার জগতে, গভীর অন্তর্মুখীনতায় ডুবে থেকে এক রকম নতুনতর হয়ে ওঠার কথা বলেন। এভাবেই তাঁর কবিতার দর্শন পাঁচের দশকে বাংলা কবিতার মেধাবী পাঠকের ভাবনা ও মনন জগতকে বিশেষভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা আলোচনার সময় আমরা তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ জীবন, শব্দ নির্মাণ, বাকপ্রতিমা, চিত্রময়তার কথাই বলি। তাঁর কবিতা প্রবহমান জীবন, প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে থেকে তাঁর কবিতা উঠে আসে। আর সেজন্য তিনি কোনো সময় চিত্রকর, কোনো সময় হয়ে ওঠেন জীবন-কথক। আসলে কবির চেতন-বিশ্বে এমন এক বোধশক্তি কাজ করে, যা তাঁর সৃষ্টিমূলকে তুলে আনে। কবি কাব্য-প্রজ্ঞা দিয়ে এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর কবিতা যেমন চিত্র-প্রাণিত, তাঁর চিত্রবোধও কাব্য-চেতনা থেকে উৎসারিত।

জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে দেহবাদ থেকে নিসর্গতা, দার্শনিকতা থেকে জীবনাকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস, পুরাণ সব কিছুর মধ্যেই তিনি ছড়িয়ে রয়েছেন। এক ব্যাপক জীবনচর্চার পরিচয় তাঁর সমস্ত কাব্যরেণুতে ছড়িয়ে রয়েছে 'আমরা তিনজন', 'নীল পাথরের আকাশ', 'আমার রাত্রি', 'মৌপোকাদের গ্রাম', 'লাল স্কুলবাড়ি', 'ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষে', 'শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু', 'অগ্রন্থিত কবিতা—১', 'নমেরু মানে রুদ্রাক্ষ', 'টুং টাং শব্দ নিঃশব্দ', 'বনে আজ কনচের্টো', 'মৌচুষি যায় ছাদনাতলায়', 'একশিশি গন্ধহীন ফ্রেইগানস', 'নিরক্ষর আকবর', 'অগ্রন্থিত কবিতা—২', 'বাড়ির কপালে চাঁদ', 'অগ্রন্থিত কবিতা—৩', সম্পাদনা করেছেন 'পরমা' পত্রিকা। তাঁরই সম্পাদিত গ্রন্থ 'আবহমান বাংলা কবিতা', 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। কবিতাকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে এমন পরিশ্রম সম্ভব নয়।

কবিতা অক্ষরে আঁকা ছবি। কবিতা আর ছবি এবং কবি আর শিল্পীর মধ্যে তাই গভীর আর নিবিড় একাত্মতার সম্পর্ক চিরকালের, দুটো মাধ্যমেই অতীব নৈর্ব্যক্তিকতায় অনুভূতি ও চেতনার নিবিড় অভিনিবেশ ঘটে। পিকাসো বলেছিলেন, "কবিতা শিল্পকলারই পরিপূরক। যে কথা রঙে বলা যায় না, সেটা ভাষার অক্ষরে বলা সম্ভব"।[১] কবিতার ভিতরে নিহিত চিত্রময়তা বিষয়ে জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন, "কবিতা রসেরই ব্যাপার। কিন্তু একধরনের উৎকৃষ্ট চিত্রের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস শুদ্ধ কল্পনা বা বুদ্ধির রস নয়"।[২] কবিতা বাকতিমাভিত্তিক শিল্প, আর ছবি চিত্রপ্রতিমা বা দৃশ্যপ্রতিভা

নির্ভর শিল্প। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় চিত্রকল্প আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়। তবে মণীন্দ্র কাব্যে চিত্রকল্প আলোচনার পূর্বে কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

কবিচিত্তের সংবেদনার প্রতিবিম্ব, তাঁর ভাবচেতনার বাঙ্ময় চিত্রই হলো 'ইমেজ' বা চিত্রকল্প। চিত্রকল্পের মাধ্যমে ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবিহৃদয়ের আবেগ এবং সংরাগ পালন করে মুখ্য ভূমিকা। এ প্রসঙ্গে Lewis বলেছেন "A poetic image is a word picture changed with emotion and passion."[৩] চিত্রকল্পের সাহায্যে কবির ব্যক্তিক অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ উপলব্ধি করা যায়। সার্থক যে চিত্রকল্প রঙে রেখায়, শব্দে বর্ণে একাত্ম হয়ে নির্মাণ করে কবিতার মূল সত্তা ও চারিত্র্য সৌন্দর্য। কবিতার প্রতিটি চিত্রকল্প একটি বিশেষ ভাব বহণ করে। প্রতিটি চিত্রকল্পে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটো সত্তা থাকে। এই দুই সত্তার মধ্যে ব্যঞ্জনার রঙ মিশিয়ে কবি সৃষ্টি করেন সার্থক চিত্রকল্প। প্রতিটি চিত্রকল্পের শরীরে ও সত্তায় থাকে নিম্নোক্ত চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য ক. প্রাণময়তা খ. আত্যন্তিকতা গ. উদ্দীপনশৈলী।

কাব্যচেতনার সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগ আত্মিক। কবিতার প্রতিটি ইমেজ বা চিত্রকল্প কবির স্মৃতি-অভিজ্ঞতা-অনুভব-জীবনেরই রূপান্তরিত শিল্প প্রতিমা। পাশ্চাত্যে ইমেজিস্ট আন্দোলনের ফলে ইমেজ বা চিত্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এজরা পাউণ্ড ১৯১৩ খ্রি. Poetry পত্রিকায় লিখেছেন "An Image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time."[৪]

প্রসঙ্গত বলা যায়, চিত্রকল্প শুধু দৃশ্যগ্রাহ্য নয়, স্পর্শময়, শ্রুতিময়, স্বাদময় হতে পারে। অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর মতে "প্রতিটি ইমেজ যেন ইম্যাজিনেশনে পৌঁছবার রাস্তা"। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্রকল্পের সমারোহ দেখে তাঁর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত এই গৌরচন্দ্রিকার শেষে মণীন্দ্র গুপ্তের নিজের কবিতার চিত্রকল্পের স্তরান্বিত প্রয়োগের আলোচনায় আসা যাক।

কবিতা ব্যক্তি-মানুষের বিশ্বকাজ, সসীম ব্যক্তির অসীমতার ধারণা। এমন অনেক জিনিসকে শুধু একপলকে দেখে নেওয়া, কখনো কখনো তাকে প্রকাশ করা হয় চিত্রকল্পে, চিত্রকলায়। একজন মহৎ কবি প্রতিমুহূর্তে জীবন-মৃত্যুর উন্মথিত সংগ্রামের গুরুভার নিজে বহন করে তাকে পালটে দেন কবিতায়, চিত্রকল্পে, মানবিক উচ্চারণে। যেমন করেছেন গ্যোয়েটে, কীটস রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও আরও অনেক মহৎ কবি। উত্তর-রৈবিক বাংলা কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতাভাবনা এক স্বচিহ্নিত মাইলফলক। তাঁর কবিতায় রয়েছে জাগতিক-মহাজাগতিক নানা আলোর উদ্ভাস। তাঁর কবিতার ক্রমান্বয় পাঠ থেকে বোঝা যায় নির্জন ও মেধাবী এই কবি মুখ্যত দেশ, ভাষা ও শিকড়সন্ধানী। তাঁর চিত্রকল্প রচনার শৈলী আমাদের আরও স্পষ্টভাবে তাঁর কবিতার অন্তর্দৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহায্য করে। তাঁর কবিতা যেন বহু চিত্রকল্পের এক মহাসম্মিলন। আশৈশব কল্পনাপ্রবণ কবি সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ

করেন নিটোলভাবে, অনুপুঙ্খে। তিনি যখন কবিতা লেখেন সেখানে ছবি ফুটে ওঠে:

"ওই বাঁশঝাড়তলে, ওই তারাবন নিয়ে কোলে,
আমার শৈশব বন্দী হয়ে শুয়ে থাকে, খেলে, ঘোরে।
চুপি চুপি রাঙা মুখে বাঁশবনের মগডালে চড়ে,
ঘরে ফেরা কাকের গলায় শুনি হঠাৎ সন্ধ্যার কলরব।"[৫]

কবি মণীন্দ্র জীবনের সমস্ত দৃষ্টি এবং তুষ্টি লাভ করেছেন প্রকৃতি থেকে, তাই তাঁর বোধে বা চেতনায় প্রথমে আসে ছবির ভাবনা। সেজন্য তাঁর কবিতার চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়, অন্য অনেক কিছুর ভাসক:

"হনুমান বুক চিরে দেখালেন, সেখানে রাম সীতা লেখা রয়েছে।
আমি আকাশে দেখলাম তখন দিঙাগের মতো সন্ধ্যার মেঘ
শুঁড়ে পেঁচিয়ে ধরেছে অস্তগামী সূর্য্যকে।
বীর হনুমান দু পা ফাঁক করে বুকের দু দিকের চামড়া
দু হাতে সবলে টেনে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।
ডান দিকে বাঁ দিকে বা গলায় লেখা রাম সীতা।"[৬]

এইসব কবিতার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাঠকের অনুভব হয় যথার্থ উপমা চিত্রকল্প কোনো অলংকরণ নয়, ভাবের এক গহন সূচিমুখ।

তাঁর কবিতায় মহাজীবন চিত্রিত হয়েছে ছবির পর ছবিতে। যে চিত্রে পৌরাণিক-আধুনিক, লৌকিক-অলৌকিক সবই উপস্থিত। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা পড়লেই বোঝা যায় তিনি জল, অগ্নি, গুহা, বন, সমুদ্র, নীলিমা, ফড়িঙ নিয়ে সম্পূর্ণতই এক আদিমানব। এভাবেই সময়ক্রমে চেতন-অচেতনে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছে গহন মনোলোকের মগ্ন অনুভূতি প্রকাশক্ষম চৈতন্যময় চিত্রকল্পের প্রসার। একটি সঙ্গত উদাহরণ:

"কলাবাগানের মধ্যে বাড়ি। চাঁদ উঠে ঘুম ভাঙিয়েছে।
কলাবাদুড়ের বিয়ে দেখতে তাই বাইরে এসেছি
টোপরটি ভরে আছে ফুলে ফুলে টগরের গাছে।
কলার মোচাটি শুধু মধু দেয় ফিকে সন্ধে থেকে মধ্যরাত,
তারপর ঠোঁট বন্ধ। শুধু কোরকের অন্ধকার
পাতায় জড়িয়ে নড়েচড়ে।"[৭]

পঙিগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় লোকায়ত অনুষঙ্গ আমাদেরকে শিকড়ে বাঁধে, সাংস্কৃতিক নোঙরে বাঁধে। জীবনের দোলাচলকে বোঝাতে কবি ব্যবহার করেছেন চাঁদ, কলা, মোচা, টগর, মধু, কোরক চিত্রকল্পগুলি। কবির স্বীকারোক্তি: "অনেক সময় এমন হয়েছে, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ, যবন, কিরাত, ভিনদেশী সহজেই এসেছে, কথা বলেছে আমার কবিতায়।"[৮] এইরূপ বিষয় শব্দ সহাবস্থান তাঁর কবিতায় অন্যস্বাদের চিত্রকল্প সংযোজন

করেছে। এজরা পাউণ্ডের থেকে আমরা তো জেনেছি চিত্রকল্প যদি না একটি দর্শন হয়ে ওঠে, তাহলে সেই চিত্রকল্প কেবল অভিনব দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তাঁর চিত্রকল্পগুলির মধ্যে আছে নিজস্ব শিকড়সন্ধানী এক চোখ, যা বিচিত্র সব ছবি এঁকে যায় মানসপটে। সে ছবি কোনো অন্ধকার গুহার আবার গ্রামীণ সংস্কৃতিরও। এই সহজ-সরলতা নিয়েই তিনি জীবন ও কবিতায় থেকেছেন। তাঁর এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার নির্মিতিতে বরিশালের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটাই দায়ী। এরপর পার্থিব জগতের অধিবাসী হয়ে অপার্থিব জগতের শব্দ-নিঃশব্দকে ধরতে চেয়েছেন।

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় চিত্রকল্প এক আদিপুরাতন অস্তিত্বের প্রত্ন সংরূপ নিয়ে ধরা দেয়। চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয় চেতনার পরা দিক তাঁর কবিতাকে গভীর হতে সাহায্য করেছে। যুগ ও কালের নিরিখে গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব জগৎ। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আলো আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র চিত্রকল্প' গ্রন্থে বলেছেন:

"কবির প্রতিটি চিত্রকল্প কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন ও জগৎকে তিনি যে ভালোবেসেছেন এবং অনুভব করছেন, তার সাক্ষ্য তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পরাশিতে। তাঁর জীবনকে ভালোবাসার এবং অনুভবের অনন্য মূল্যকে উপলব্ধি করার জন্যই তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পের, রূপকের বা প্রতীকের আলোচনার আবশ্যকতা। ফলতঃ চিত্রকল্পের আলোচনা ব্যতীত একজন কবির মনোলোকের সমগ্র সৃজনী ক্রিয়াটির তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার অন্য কোনো পন্থা নেই।"[৯]

কবি মণীন্দ্রের দার্শনিক প্রত্যয়ই তাকে মনোলোকের সন্ধানে ব্রতী হয়ে চিত্রকল্পসঞ্জাত নির্মাণকে সম্ভবপর করে তুলেছে। তাঁর কবিতায় এমন কিছু চিত্রকল্প রয়েছে যা কবিতার ভাববিশ্বের পাশাপাশি শৈলীগতভাবে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। চিত্রকল্প কতটা অনুপুঙ্খ, শেকড়গভীর এবং অনাস্বাদিত হতে পারে। নিচের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয় হতে পারে:

১. 'অন্তরীক্ষে। ঝামরী ভ্রামরী নক্ষত্রেরা, দিশাহারা পুঞ্জিত জোনাকি সঙ্গিনী-বিষাদ এল নিয়ে।'[১০]

২. 'সদ্যোজায়মান মেঘ যেন এক দৈত্যের আঙরাখা, উড়ে এল সমুদ্রের গুপ্ত গুহা থেকে।'[১১]

৩. 'প্রতিমা-ডোবানো পচা বিমর্ষ জলের চক্রবালে দেখা যায়
পতঞ্জলি, শংকরের লঘু ভারতীয় তনু সাদা অ্যালবাট্রসের মতো ওড়ে'[১২]

৪. 'ইভ, নিউটন আর আমার এই প্লেটের আপেল
যথাক্রমে পাপ, জ্ঞান, সৌন্দর্য ছড়িয়ে আজ শূন্যে চিরস্থির।'[১৩]

এইরকম বহু কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে চিত্রকল্পের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। এই গদ্যবাহী কবিতা ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নতুন পথে নিয়ে গেছে। চিত্রকল্প দিয়েই

মণীন্দ্র গুপ্ত অপর বিশ্বের স্থাপনা করেছেন। কবি যত প্রাজ্ঞ হয়েছেন, চিত্রকল্পে সমর্পিত হয়েছে তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো নতুন নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ। সংহত চিত্রকল্প একদিকে যেমন ছবির সাহায্যে কবিতার অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে; অন্যদিকে চিত্রকল্পের নিজস্ব রহস্যময়তার গুণেই অনেকসময় থাকে ছবি ভাঙার প্রক্রিয়াও। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুয়ের মিশ্রণেই চিত্রকল্পের সৌন্দর্য।

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রত্যক্ষ, পরিচিত ইমেজারি যেমন আছে, তেমনি আছে অপ্রত্যক্ষ, রহস্যময় বাকতিমা। সেইসঙ্গে পরাবাস্তব চিত্রকল্পের অনুষঙ্গ সফল ব্যবহার করেছেন। কিছু চিত্রকল্প চোখে পড়ার মতো:

১. 'বাঁকানো গাছের ত্বক গোপালমূর্তির মতো কালো ও কোমল।'[১৪]

২. 'শান্ত ককপিটে কফি হাতে নিয়ে বৈমানিক দেখলেন: নারদের ঢেঁকি আসছে।'[১৫]

৩. 'এই লাল ধুলো ঝোপঝাড়, এই গাছেরই পল্লবে ছিল বিষ্ণুপদ।'

৪. 'ওপারের আকাশে যমের মোষের মতো রাগ জমে।'[১৬]

তাঁর কবিতায় এভাবেই কতশত চিত্রকল্প চিত্রিত শব্দ পঙ্কিতে পুরাণ, ইতিহাসের ধূসর জগতের কথা উঠে এসেছে। প্রকৃতিকেন্দ্রিক বর্ণনায় যে সমস্ত চিত্রকল্প তাঁর লেখায় পাই:

১. 'পৌর্ণমাসী রাতের রুপোলী মেঘের পাড় বেয়ে বেড়ালেরা এসেছিল
নখে আঁচড়ে আঁচড়ে সুতো সুতো করে গেছে তাকে।'[১৭]

২. 'পর্দায় অলৌকিক ছবি, তারাদের ছাইচাপা আলো, বহুদূর দিগন্তসরণী,
এ জন্মের পূর্বাভাস, বিগত জন্মের রেশ-অতিপ্রাকৃতিক স্তব্ধ ধ্বনি।'[১৮]

মণীন্দ্র গুপ্ত যখন তাঁর কবিতায় রং-কে ব্যবহার করেছেন তা ছুঁয়ে গেছে অপরাপর চিন্তাকে—

১. 'ঘুম জনস্রোতের মতো চেতনার উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে
যৌনতা ধুয়ে নীলাভ বালক'[১৯]

২. 'সবুজ সর সরে গিয়ে পুকুরের জল
বিকেলের মন্দাকিনীর মতো ঝলকায়।'[২০]

৩. 'পুরনো জন্মের পর নতুন এই জন্ম লাল আলতা ধুয়ে ধুয়ে
সেখানে নীল স্নিগ্ধ আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।'[২১]

মণীন্দ্র কবিতায় চিত্রময়তা এক আদি পুরাতন অস্তিত্বের প্রত্ন সংরূপ নিয়ে ধরা দেয়। কবিতায় ব্যবহৃত রং এক আদিলগ্নের স্ফুরণকে ধরে রেখেছে। যেন প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজীব হয়ে ওঠে চিত্ররূপ অনুভবগম্য প্রকাশে। তাঁর কবিতাবিশ্বে অধিক সময়েই ভূত-প্রেত, রাক্ষস, লোকদেবতায় বিশ্বাস রেখেছেন। এই অভিনিবেশে তিনি তাঁর কবিতার অতিপ্রাকৃত শক্তিকে প্রত্যক্ষ জীবন ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন:

১. 'ষোড়শোপাচারে ভাত কোথা থেকে আসে!

এই ভাত, অতি আদিম গোত্রের বীজধান,'[২২]

২. 'দুই বাটি পিত্তরং জল, কিন্তু মাথায় চড়ছে রক্ত এখনি উগরবেলাল জবা।'[২৩]

পুরাণাশ্রিত কিছু চিত্র-ধর্মের সন্ধান পাই—রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ, আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পুরাণ এসেছে কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে :

১. 'বিষ্ণুর সুবিশাল কালো পাথরের জানুর মতো
তার মূর্তিতে ক্ষিপ্রতা স্তব্ধ হয়ে আছে।'[২৪]

২. 'আমিও পাটনির নৌকো চুরি করে ক্ষণস্থায়ী এপার ওপার করেছি।'[২৫]

৩. 'শালভঞ্জিকার মূর্তি গাঁথা আছে মনে।'[২৬]

প্রত্যক্ষ জীবনের মগ্নচৈতন্যে ধরা পড়া চিত্রময়তা অনুসরণ করলে মনে হয় তিনি এজরা পাউণ্ড কথিত 'emotional complex in an instant of time'-কে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তাঁর প্রতিটি চিত্র-দর্পণ কবিতার মৌল-অন্বিষ্টের সংকেতবাহী। চিত্ররূপের শরীর ও সত্তায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে কবি-আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। জীবনচিত্র অঙ্কন তাঁর কবি-চৈতন্যের ক্রমবিকাশকে যেন নির্ভুলভাবে ধারণ করে আছে।

তাঁর কবিতায় সারল্য, ইন্দ্রীয় সংবেদনশীলতা অনুভবেদ্য, বাংলা কাব্যের আর এক বরিশালী। তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হতে দেখি গ্রাম্য চিত্রময়তা— বসন্তের রক্তিম পলাশ, বেতফল, সজল জলে ভাসা শাপলা, তেঁতুল, নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে চনমনে রোদ্দুর, জোনাকির ছায়ামাখা শান্ত বনানীতে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে ভরপুর ধূসর শান্ত গ্রামের নিস্তরঙ্গ দৃশ্যময়তা। কবিতায় এভাবেই বিবিধ ইন্দ্রীয় সংবেদ চিত্রময়তার ব্যবহার ঘটেছে। তাঁর কবিতা যে চিত্ররূপময়— এর মূলে রয়েছে প্রখর সমাজ চেতনা, ইতিহাসবোধ, সাহিত্য, মিথ ও পুরাণ চেতনার ভিত্তিভূমি। তাঁর কবিতায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প, চিত্রময়তা পাঠককে আলোড়িত করে। এভাবেই কবিতা থেকে কবিতায়, কাব্যগ্রন্থ থেকে কাব্যগ্রন্থে সর্বোপরি নানা বিষয়ের গদ্যে, উপন্যাসে তিনি অসাধারণভাবে জীবন ও চিত্রময়তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় এভাবেই তিনি নিজস্ব অবস্থানকে দৃঢ় ও অনতিক্রম্য করে তুলেছেন।

স্বা গ তা প তি
ইতিহাস ও ধর্মীয় উপাসনার মিলনসাগর : রাধা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত। বীরভূমের রুক্ষলাল মাটির স্পন্দন তাঁর মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত। আর সেই গভীর নিষ্ঠা ও মমতার প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় চয়ন করে উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'রাধা', তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলির থেকে একটু ভিন্ন মতাদর্শের।

'রাধা' উপন্যাসের একপ্রান্তে রয়েছে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্বের আভাসে আভাসিত শ্রী চৈতন্যধর্মের রূপান্তরের ইতিবৃত্ত যাকে আবৃত করে রেখেছে মাধবানন্দের রাধাবিহীন কৃষ্ণ উপাসনার সংস্কার যা বাংলাদেশের বৈষ্ণবগণের পরকীয়া মতবাদের বিপরীতধর্মী। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তাল রাজনৈতিক সংঘাত, বর্গীর আক্রমণ এবং তৎজনিত নৃশংস অত্যাচার ও অনাচারের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের সংকট।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কয়েকটি শর্ত রয়েছে—প্রথমত, মূল ঘটনাবর্ত ও ইতিহাসের নথিবদ্ধ তথ্য দ্বারা ঐতিহাসিকতা বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে ইতিহাসের চরিত্র নির্ভর। তৃতীয়ত, উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার করতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে সেই সময় যেমন তুলে ধরতে হবে তেমনই তুলে ধরতে হবে সাধারণ মানুষের অবস্থানকেও। চতুর্থত, ইতিহাসের সত্য যেমন বজায় থাকবে, তেমনই সাধারণ মানুষকে দেখাতে হবে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে।

আলোচ্য 'রাধা' উপন্যাসের বিষয় গড়ে উঠেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের তথা বাংলার বিশেষ সময়ের ইতিহাসকে নির্ভর করে। ঔপন্যাসিক তাঁর মননদক্ষতায় যে ভাবে সর্বভারতীয় ঘটনাকে বিবৃত করেছেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করব 'রাধা' উপন্যাসের অন্দরে ইতিহাসের তথ্য কতখানি সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সেই পরিমণ্ডলে ধর্মসাধনার কেন্দ্রবিন্দু রূপে উপন্যাসটির মাধুর্যতা কতখানি? ঐতিহাসিক উপন্যাস একইসঙ্গে দেশ ও কালের সত্যকে তুলে ধরে। কেননা ইতিহাস গড়ে ওঠে দেশ ও কালকেন্দ্রিক। রাধা উপন্যাসের কালপর্ব হল সুবা বাংলার নবাবী আমল- ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এখানে কাল খুবই স্পষ্ট। দেশ বলতে সমগ্র উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত পটভূমিকা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। তবে তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন বীরভূমের ইলামবাজার অঞ্চলের ওপর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সমাজজীবনের বাস্তব ছবি এখানে উঠে এসেছে নিখুঁতভাবে এসেছে সেই পরিমন্ডল, পরিস্থিতি, সংকট। আসলে ভারতবর্ষ তথা তৎকালীন বাংলাদেশের বৃহৎকালের রাজনৈতিক, সামাজিক ও

অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যময় সময়ের ক্রান্তদর্শী উপন্যাসকার তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে অখণ্ড জীবনাদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়, পরবর্তী প্রজন্মের একমাত্র তারাশঙ্করের উপন্যাসেই বিশাল ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট, অগণিত বিচিত্র মানুষের অবিরল যাওয়া আসা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি আশ্রয় করেছেন রাঢ়ভূমির আঞ্চলিকতাকে কিন্ত মহত্তর জীবনের প্রতিভাস গড়ে তুলে অঞ্চলের উর্ধ্বে খণ্ডতাকে অতিক্রম করে অখন্ড জীবনবোধে উন্নীত হয়েছেন। এরকম প্রত্যয় ভূমি বাংলা উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। 'রাধা' উপন্যাস অবশ্যই ঔপন্যাসিকের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা, 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসগুলির সমতুল্য নয়, তবু অধঃপতিত চৈতন্যধর্মের বিকৃতির জীবনবিন্যাসে ভারতের ইতিহাসের দীর্ঘসময়ের নানান ওঠা পড়ার জীবনবেদ 'রাধা' উপন্যাসটি।

ঔপন্যাসিক কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির তাগিদে কলম ধরেননি, তিনি চৈতন্যধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে বীরভূম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের জনজীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করার প্রয়াস নিয়ে 'রাধা' উপন্যাসের কাহিনি বুনেছেন। বীরভূম জেলার সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামী একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, বর্গী আক্রমণ, প্রতিরোধেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং তার সুরক্ষিত গৃহাশ্রমে ইলামবাজারের বৈষ্ণবেরা সকলেই আশ্রয় নিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা অতীত দিনের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। আনন্দচাঁদ সমবেত জনতাকে সংগঠিত করে বর্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করেছে। এই কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কাহিনি 'রাধা' উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে - শেরিনা হাফেজের কাহিনি। দিল্লির সুলতানের কন্যা আমিনার সঙ্গে ওসমান নামক একজন ওমরাহ পুত্রের বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু আমিনা হাফিজকে ভালোবেসে পালিয়ে যায় এবং শ্যামরূপার জঙ্গল হয়ে হাতেমপুরের হাতেম খাঁর আশ্রয় নেয়, ওসমান বর্গীদের সাহায্য নিয়ে হাতেমপুর আক্রমণ করে, হাফেজ যুদ্ধে নিহত হয়, আমিনা আত্মহত্যা করে। তারাশঙ্কর ওসমান, আমিনা ইত্যাদি নামের কিছু বদল করে 'রাধা'-র কাহিনিতে মাধবানন্দ, কেশবানন্দ, কয়োর সঙ্গে শেরিনা—হাফেজ কাহিনির সংযোগ ঘটিয়েছেন। ঔপন্যাসিক সেই সময়ের ইতিহাসের ঘটনাগুলি সত্যনিষ্ঠ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। কেননা শেরিনা বিবির কবর, সুপুরের আনন্দচাঁদের ভাঙা পাঁচিল, ইছাই ঘোষের দেউল আজো সেদিনের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

"রাধা উপন্যাসের একদিকে আছে আঠারো শতকের নবাবী আমলের ক্ষমতা দখলের বিবরণ, অন্যদিকে রয়েছে বর্গী আক্রমণের ইতিহাস। বাংলাদেশে বর্গীরা এসেছে পাঁচ বার, ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দী খাঁর লড়াই চলেছে বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত — 'বৈশাখী অগ্নিদাহের মতো সমস্ত দেশকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে।" মাধবানন্দের কল্পানায় যে বিস্তৃত বর্গী আক্রমণের দৃশ্য তা ইলামবাজার হাতেমপুরের বর্গী আক্রমণের খণ্ডচিত্রগুলিতে স্পষ্ট।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'রাধা' উপন্যাসের গোড়াতেই অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব সাধনার বিকার ও বিভ্রান্তির উল্লেখ করেছেন লেখক। তিনি লিখেছেন, "বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল জীবনকে সাগরসঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতধারায় মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশজীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মতো।' সেই বিলের কাদায় মানুষ কেমনভাবে ডুবছিল তার পরিচয় উঠে এসেছে মূলত বৈষ্ণবধর্মের স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বের বিরোধী ভিন্নমুখী চিন্তাধারার আড়ালে। সেকালের পরকীয়া সাধনের স্বরূপ উপন্যাসকার বিস্তৃতভাবেই তুলে ধরেছেন — "পরকীয়া সাধন কিশোরী ভজন দেশে চলছিল। কিন্তু সে চলছিল গোপনে, চলছিল গুরুদেবের ইশারায়"। ইলামবাজারের এমন অনেক ভ্রষ্ট মানুষদের মধ্যে কৃষ্ণদাসী অন্যতম। চরিত্রটি অঙ্কনে স্রষ্টা সেকালের পরকীয়া সাধনার বিকৃত রূপকেই দেখাতে চেয়েছেন। মহাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব একসময় স্বকীয়া মতবাদের প্রচার করতে গিয়ে বিচারে পরাজিত হয়ে পরকীয়া মতবাদের দীক্ষা নেন। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দ সেই দীক্ষা না নিয়ে চলে যান। যদিও উপন্যাসটিতে মাধবানন্দের পরকীয়া তত্ত্বের বিরোধিতাই কাহিনিকে গতিদান করেছে। উপন্যাসের পরিণামে অবশ্য মাধবানন্দ রাধাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মাধবানন্দের এই অনুভব ভাষারূপ পেয়েছে — "এ সাধনা বিকৃত হলে যে কী পরিণতি হয় তা তিনি জানেন, চোখে দেখেছেন। মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। আসলে মাধবানন্দ যে আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন সেখানে ছিল ধ্যানী, জ্ঞানী, কর্মীর সমাবেশ। তাঁর সংগ্রাম মূলত সমাজ বিকৃতির বিরুদ্ধে তাই তিনি শক্তিকে জাগাতে চেয়েছেন, আবার কৃষ্ণদাসীর ডাকিনী বিদ্যাও সেকালের ধর্ম সাধনার উল্লেখযোগ্য দিকরূপে প্রতিভাত হয়েছে"।

আসলে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের নানান রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তরের কালপর্বকে ঔপন্যাসিক তাঁর 'রাধা' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্য দিয়ে এক জাতীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল বৈষ্ণবধর্মে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় বিভূতি রূপান্তরিত হয়েছিল মাধূর্যের স্বরূপময়তায়। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যসম্প্রদায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতির কালে প্রেমাবতারের ভাবের প্লাবন দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে যে রূপান্তর ঘটেছে তাতে শুদ্ধতার অবনমন ঘটেছিল সঙ্গত কারণেই। 'রাধা' উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তারাশঙ্কর যেমন তাঁর রূপবদলের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তেমনই এই অতুল ঐশ্বর্যময় ধর্মানুভূতি ক্রম ক্ষীয়মান পর্বটিকে উপন্যাসীয় মানবজীবনের ইতিকথায় বিস্তৃত করতে চেয়েছেন।

সুতরাং 'রাধা' উপন্যাসে আমরা যেমন ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য জানতে পেরেছি তেমনই অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব ধর্মসাধনার বিচিত্র রূপও উঠে এসেছে। মাধবানন্দের দ্বিধাসংকট,

কৃষ্ণদাসীর চরিত্রে আশ্রম পরিচালিকার ব্যক্তিত্ব সেবাদাসীর ভূমিকা, মাতৃহৃদয়ের স্নেহ, মোহিনীর প্রেম ও নিবিড় আত্মনিবেদন সবই অত্যন্ত কুশলবিন্যাসে ঔপন্যাসিক জীবন্ত করেছেন। সর্বোপরি ইতিহাসের ভাবধারায় শ্রীচৈতন্য ধর্মের বিবর্তন, অবক্ষয়ের মধ্যেও মানুষকে সঞ্জীবিত করে রাখে যে প্রেম তাকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন মাধবানন্দ। এখানেই প্রেমধর্মের জয়, কালের অমোঘ প্রভাব, আঘাত সত্ত্বেও যা ধ্রুব অক্ষয় তাই উড্ডীন হয়েছে প্রেমধর্মের ধ্বজারুপে। একদিকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অন্যদিকে এই ভাঙনের যুগে প্রেমধর্মের বাতি প্রজ্জ্বলনের গুরুত্বে উপন্যাসটির গুরুত্ব আজও বহমান।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - রাধা

২. মজুমদার, সমরেশ - তারাশঙ্করের রাধা দর্শন ও জীবনে। ১ম প্রকাশ, ১৪১২

অ ঞ্জু মা হা ত

মণীন্দ্রলাল বসুর ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা

সমাজ-সাহিত্য-জীবন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজ মানুষের মন ও ব্যক্তিত্বকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। সমাজের ভালো-মন্দ, রীতি-নীতি, বাধানিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন সবকিছুই মানুষের জীবনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাহিত্যে এই সামাজিক জীবের কথাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই সাহিত্যকে জীবন ও সমাজের দর্পণ বলা হয়ে থাকে। মণীন্দ্রলাল বসুর সাহিত্যেও সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। মনীন্দ্রলাল বসু তাঁর বিভিন্ন গল্পে সমাজ বাস্তবতার নানা খুঁটিনাটি দিক নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অবিশ্বাস, প্রচলিত আর্থিক পরিকাঠামোর ভাঙনের ফলে সমাজের মধ্যে একটা অস্থিরতা, অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মনীন্দ্রলাল ব্যক্তিগত জীবনে শহুরে উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হওয়ায়, তাঁর সঙ্গে মফঃস্বল বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্দশা, দারিদ্র্য, ক্ষুধিত অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্তদের জীবনের যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান, হতাশা জর্জরিত অবসাদগ্রস্ততা দেখা দিয়েছিল তা মণীন্দ্রলাল বসুর ছোটগল্পে মোটেই উপেক্ষিত হয়নি, বরং তাঁর লেখার উপাদান হয়ে উঠেছিল। সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সম্পর্কে কোনো বিশেষ জীবন-পটভূমির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না সত্য, কিন্তু সেকালের মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও নৈতিক আর্দশ-বুদ্ধির অবসাদ সম্বন্ধে একনিষ্ঠ সচেতনতার অভাব তাঁর মধ্যে কোনোকালে ঘটেনি। বরং সেই বিনষ্টির পীড়া ব্যক্তি, তথা শিল্পী, মণীন্দ্রলালের অন্তরকে গোপনে গোপনে কাতর করেছে।"[১] মণীন্দ্রলাল বসুর লেখা প্রথম গল্প 'অরুণ' 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২৬ বঙ্গাব্দে গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে। এই গল্পের নায়ক অরুণ বন্ধনমুক্ত, চঞ্চল, সুদূরপিয়াসী, যৌবনরসে সিক্ত বিশ্বপথিক। অরুণের মনে হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকা নির্দয় যন্ত্র সভ্যতার ভয়ংকর অভিশাপ বহন করে চলেছে —"আমেরিকার নগরে নগরে যখন ঘুরেছিলুম তখন মনে হয়েছিল গারদখানা দেখে বেড়াচ্ছি,—সেখানে হাজারে হাজারে মানুষ মিলেছে বেচাকেনার জন্যে, লোহার কল ঘুরছে, চিমনীর ধোঁয়া উড়ছে, পায়রার খোপের মত ত্রিশ-চল্লিশ-তলা বাড়ীতে ইলেকট্রিকের আলো আর হাওয়ায় মানুষ বেঁচে আছে; নগর-লক্ষী স্বর্ণপদ্মে ডলার-পাপড়ির ওপর তাঁর কোটিপতি বরপুত্রদের নিয়ে বসে আছেন।"[২] অরুণ প্যারিসেও নব্য সভ্যতার রূপ দেখেছে। সে বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধপীড়িত প্যারিস চায় না, সে হুগোর প্যারিস, বালজাকের প্যারিস, ইউজি-সুর প্যারিস দেখতে চায়।

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ সচেতন বাঙালিদের মতো তরুণ মণীন্দ্রলালও সাধুবাদ জানিয়েছিলেন 'বলশেভিকবাদ'-এর। রাশিয়ার সমাজ-বিপ্লব, নতুন জীবনের অঙ্গীকারকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং তার গুরুত্ব স্বীকার করে তিনি 'অরুণ' গল্পে লিখেছেন- "আজ রুসিয়ার চোখে কান্না নেই, আজ সে ক্ষুব্ধ, সে গর্জন করছে। নিষ্পেষিত রুসিয়া মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—ফরাসী-বিপ্লবের চেয়েও তা ভীষণ, অগ্নুৎপাতের চেয়েও তা নির্দয়, সমুদ্রঝঞ্ঝার চেয়েও তা ধ্বংসকারী। বলশেভিকের রুদ্ররূপ দেখলুম—এ যেন অমানিশায় মহাদেবের তান্ডবনৃত্য। কিন্তু নবসৃষ্টির অরুণোদয় শীঘ্রই হবে।"[৩] অরুণ শেষ পর্যন্ত পুরাতনকে ভেঙে নবসৃষ্টির অরুণোদয় ঘটানোর জন্য রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের রণপ্রান্তরে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল স্বপ্নমুগ্ধ বিদ্রোহীর মতো। মণীন্দ্রলালের দেশ-কাল-সমাজ সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রথম গল্পেই।

'মায়াপুরী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মা' গল্পটি সম্পর্কে শ্রী ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, "মধ্যবিত্ত জীবনে আর্থিক অবক্ষয়ের পরিণামে মহত্তম আদর্শচেতনার ও বিনষ্টির এক রুক্ষ ট্রাজিক রূপ এঁকেছেন শিল্পী এই গল্পে।"[৪] দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বিভার বিয়ে হয়েছে কলকাতা থেকে অনেক দূরে। স্বামী দূরে চা বাগানের সামান্য বেতনভোগী কর্মী, বিভাকে সাথে নিয়ে যান না, বছরে এক-দুবার বাড়ি আসেন। দরিদ্র জর্জরিত সংসারে শাশুড়িকে নিয়ে সে একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকে। দুটি পুত্র সন্তান নষ্ট হওয়ার পর একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছিল বিভার সব অপূর্ণ আশার সান্ত্বনা হয়ে। কিন্তু কিছুদিন যেতেই সন্তানটির দুরারোগ্যব্যাধি দেখা দিল। পাশের বাড়ির সখীর ডাক্তার স্বামী বিনামূল্যে বিভার সন্তানের চিকিৎসা করেন। কিন্তু বহুমূল্য ঔষুধের খরচ জোটানোও গরীব পরিবারের কাছে অসাধ্য। চিকিৎসার খরচ দেখে বিভার শাশুড়ি বিরক্ত প্রকাশ করলেও বিভা ঔষধপথ্য জোগাড় করতে ত্রুটি রাখেনি। শত চেষ্টা করেও বিভার সন্তানকে বাঁচানো যায়নি।

একদিন বিভা সখীর ছোটো ছেলেটিকে আদর করতে গিয়ে সখী ও তার ডাক্তার স্বামীর কথোপকথন আড়াল থেকে শুনে জানতে পারে যে বিভার স্বামী ব্যাভিচারী, আর তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সন্তানকে। সেই দিন থেকে বিভা প্রায় উন্মাদিনী, ফিট এর অসুখ দেখা দেয়। দেড় বছর পর বিভার স্বামী ফিরে এলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিভাকে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়। বিভার স্বামী আবার কর্মস্থলে ফিরে যায়, আর বিভা প্রতিদিন তুলসীতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে তার আগত সন্তান যেন মৃত হয় সেই কামনা করতে থাকে। গল্পটি পড়লে এক প্রগাঢ় শূন্যতা ও নীরব আর্তনাদ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সাহিত্য সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর মতে, "গল্পের সমাপ্তি মৃত মানুষের আর্ত কঙ্কালের দেহ ঘিরে প্রবৃত্তি-পশুর এক আদিম ক্রীড়া-রূপকে যেন আশ্চর্য এপিক গাঢ়তায়, অনবদ্য এক ট্রাজেডির আকারে কালোপাথরের মতো জমাট করে তুলেছে; অথচ শিল্পীর ভাষা-ভঙ্গি আদ্যন্ত রোমান্স-লিরিকের মায়া-সুরভিত। এ গাঢ়তা শিল্পী-প্রাণের,—নিজের রুচিসূক্ষ্ম আত্মাটিকে যেন মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের ট্রাজিক মূর্তি-রূপ দিয়েছেন তিনি।"[৫]

'রক্তকমল' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অশোক' গল্পে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদ থেকে অহিংস সত্যাগ্রহের আন্দোলনের পথে অশোকের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেদিনের তরুণ সমাজের প্রত্যয়ের একটা বাস্তব রুপ দেখা যায়। জমিদারের ছেলে অশোক যৌবনে জ্যোৎস্নার প্রেমে পড়ে। কিন্তু সে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ধ্বংসের লীলায় মেতেছিল। পরবর্তী সময়ে হতাশায় অশোক যখন আত্মহত্যার কথা ভাবছে তখন তার পরিচয় হয় ছাত্রজীবনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ব্যারিস্টার সুরেশের শ্যালিকা অতসীর সঙ্গে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সংগ্রামের যাবতীয় সংবাদ, দেশ-বিদেশের ইতিহাস, রাজনীতি-সমাজনীতির কঠিন তত্ত্বে অতসীর প্রবল আগ্রহ, দেশের জন্য কাজ করতে চায় সে। তৎকালীন বণিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের ধ্বংসে ইচ্ছুক যে পৃথিবী জোড়া বিপ্লবকারী দল আছে তাতে অশোক যোগদান করল। ধূমকেতুর মতো পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ধাবিত হতে লাগল। সে যখন ফিরল তখন মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন "মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অন্ধপ্রথা ও প্রভুত্ব-পীড়িত ভারতের ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভগীরথ স্বাধীনতার শঙ্খ বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যুজয়ী অমর আত্মার অমৃতলোক হতে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করলেন— মৃতমূক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠল।"[৬] অশোক এই অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে।

অশোক সভা করে সমিতি গড়ে, প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দিনরাত গান্ধীর বাণী প্রচার করতে লাগল। বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা দিতে গেলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। জেল খেটে অশোক যখন ফিরল তখন তার শরীর ভেঙ্গে গেছে। সে সাথে করে জ্যোৎস্নার ছেলেকেও নিয়ে এসেছে। অশোক একটু সুস্থ হয়েই আবার গ্রামে ফিরল কারণ তার মতে, "সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত অন্ধ মুর্খ ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই আমার কাজ।"[৭] প্রত্যন্ত গ্রামে বিপুল জনসেবার মাঝে যখন অশোকের জীবন দীপটি নিভতে এলো তখনও ব্রহ্মচারিণী অতসী রইল তার শয্যা পার্শে। এই গল্পটি থেকে তৎকালীন সমাজ রাজনীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা পাই।

'খেয়াঘাটে' গল্পটিতে আছে কালাজ্বরের রোগী মৃত্যু-পথযাত্রী উনিশ বছরের তরুণ চিত্রকরের কথা। সমাজ ও অর্থবল তার চোখের সামনে দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেছে সুধাকে। "হিন্দুসমাজে জাতিভেদ বলে বিশ্রী জিনিষটা যদি না থাকতো; দেখো, নগ্নবর্বরতার যুগে অসভ্য মানুষদের ব্যবস্থা ছিলো যার গায়ে জোর বেশী নারী তার, যে তাকে বাহুবলে জয় করে নিতে পারবে তারি সে উপভোগ্যা। আর এ সভ্যবর্বরতার যুগে মানুষের ব্যবস্থা দেখছি, যার সিন্দুকে টাকা বেশী নারী তার, যে তাকে সোনা দিয়ে কিনে নিতে পারবে।"[৮]—কথকের এই উক্তিতে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নগ্ন রূপটি ফুটে উঠেছে। তরুণ চিত্রকর অর্থের অভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তাই আক্ষেপের সুরে

বলেছেন—"যদি আমার টাকা থাকতো, একবার দেখে নিতুম রোগটাকে।"[৯] এই গল্পে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় সমাজের কলুষিত রূপ, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ।

'অতিথি' গল্পটিতে তিন নম্বর বাড়িতে আগত অতিথিকে ঘিরে গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে। গল্পটি থেকে জানা যায় তৎকালীন সময়ে অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা গেলেও কিছু কিছু চাকুরী, ব্যবসার প্রসার ভালো ছিল। যেমন এই গল্পে উকিলদের রোজগার সম্পর্কে বলা হয়েছে-"উকিল কর্তাটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশ পসার-বেশ রোজগার করেন।"[১০]

'সোনার হরিণ' গল্পগ্রন্থের 'দার্জিলিংঙে' গল্পের মূল বিষয়বস্তু প্রেম, শকুন্তলা-রণেন আর প্রভাতের ত্রিকোণ প্রেম। এই গল্পে আমরা তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি লক্ষ্য করি। রণেন ও প্রভাতের কথোপকথন থেকে জানা যায় তারা দুজনই উচ্চশিক্ষিত- "তা তুমি এবার এম.এ. দিচ্ছো? গেল বছরই ত লেকচার কমপ্লিট হয়ে গেছল, এবার দিলেই পার। একা ত আছ, পড়াশুনা কিছু হচ্ছে?

তোমার কি বল না, ফার্স্ট ক্লাস এম.এসসি হয়ে বসে আছ, সবাইকে এ্যাডভাইস গ্রাটিস দিচ্ছ। ইংরাজীতে এম.এ. পড়া কি বাবুগিরি জান না ত।"[১১]

রণেন ও প্রভাতের উপরোক্ত কথোপকথন লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে তৎকালীন সমাজে যুবকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়েই জ্ঞান আহরণের ক্ষুধা যুব সমাজের মধ্যে বর্তমান। শুধুমাত্র ছেলেদের ক্ষেত্রেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। গল্পে উপস্থিত শকুন্তলাও পরোক্ষভাবে উল্লেখ—নারী চরিত্রের কলেজে যাওয়া প্রমাণ করে যে মেয়েদের মধ্যেও তখন শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গল্পে গান গাওয়া, গান শেখার প্রসঙ্গও বহুবার এসেছে। তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে সাহিত্য—চর্চার প্রতি আগ্রহের সাথে সাথে সংগীতচর্চা ও অবসরে আমোদনের জন্য সংগীত-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গল্পটিতে দেখা যায় প্রভাত তার বন্ধু রণেনের জন্য নিজের প্রেমের ত্যাগ করেছিল। গল্পের শেষাংশে আমরা প্রভাতের বিদেশযাত্রার প্রসঙ্গ পাই-"এক জার্মান না কি আমার থিওরি নিয়ে কাজ করছে, বিলেতে গিয়ে ঠিক খবর পাবো, তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই।"[১২] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেখানে বিলেতযাত্রা অশুভ বলে মনে করা হতো সেখানে প্রভাতের নিজের ইচ্ছায় বিদেশে পাড়ি দেওয়া প্রমাণ করে যে সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে সমাজের মধ্যে থাকা কিছু অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের অবলুপ্তি ঘটেছে।

মণীন্দ্রলাল বসুর 'বেনামী' গল্পটিতে কথকের ব্যর্থ ভালোবাসা এবং ভালোবাসার নারী ও বন্ধুর জন্য ত্যাগ, উপকার বর্ণিত। তৎকালীন বাঙালি সমাজের যুবকদের বই পড়ার প্রবল নেশা কথকের এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়—"আমার বাড়ী যে দেখিয়াছে, সেই বলিয়াছে এ থাকিবার বাড়ী নয়, এ বইয়ের গুদাম।"[১৩] গল্পে আধুনিকতার অনেক লক্ষণ রয়েছে, যেমন—ইলেক্ট্রিক

স্টোভের ব্যবহার, বায়োস্কোপে ফিল্ম দেখার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এই গল্পটিতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকের সাথে উচ্চবিত্ত সমাজের যুবকের জীবনযাত্রার তুলনা দেখানো হয়েছে—"সে ছিল ধনী ব্যবসাদারের ছেলে, আর আমি গরীব স্কুল মাষ্টারের; সে থাকিত প্রকান্ড প্রাসাদে ইলেকট্রিক আলোশোভিত গৃহে, আর আমি থাকতাম মেসের ভাঙ্গা তক্তায়, ভাঙ্গা টিনের বাক্সের ওপর কেরোসিনের আলো জ্বালাইয়া। সে ছিল অতি সৌখীন, ফিতেওয়ালা জুতা ব্যবহার করিতে, কোট, সার্ট বা মিলের ধুতি পরিতে তাহাকে কোন দিন দেখি নাই; জুতা-জামা সম্বন্ধে জাতি-বিচার করা আমার মত ছিল না, থাকিলেও সামর্থ্যে কুলাইত না।"[১৪] বিদেশী সাহিত্য পাঠের প্রতি আগ্রহ তৎকালীন সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গল্পেও বারবার উঠে এসেছে বিদেশী সাহিত্য পাঠ এর প্রসঙ্গ-"আমি পড়িতাম, যাঁহারা জীবনের উদার রাজপথে সাহিত্যসুধার ভান্ড হাতে করিয়া অমৃতরস চিরদিনের জন্য দান করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যেমন, ব্যালজাক ডিকেন্স, টলস্টয়। আর সুরেন পড়িত, যাঁহারা প্রাণের নির্মল পথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ বক্র গলিতে মদের বোতল হাতে করিয়া একটুকু সাহিত্যরসের সহিত প্রচুর কামরস মিশাইয়া জিনিষটা উগ্রতীব্র করিয়া অতি সস্তাদরে বেচিয়া গিয়াছেন, যেমন- বেনল্ডস, ভিক্টোরিয়া ক্রস।"[১৫]

'কল্পলতা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'লতিফের গান' গল্পের লতিফ নামের অনাথ কিশোরটি কাজ করে ছাপাখানায়। যখন ছাপারকল চলে না তখন সে বাতিল কাগজ তুলে পড়ে, কাগজে কবিতা বা গান থাকলে সে মুখস্ত করে, গানটা ভালো লাগলে সে কাগজের টুকরো নিজের ঘরে নিয়ে যায়। গানটির অর্থবোধ না হলেও, সুর না জানলেও, তার হৃদয়ের বিভায় আলোকিত হয়ে তা নতুন রূপ লাভ করত। বস্তির পঙ্কিলতার মধ্যেও জীবনসৌন্দর্যের মহিমা তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, এবং সেটাই তার কণ্ঠের বেসুরো গানে ঝরে পড়ে। আর সেই গানের মহিমায় দুর্ভাগা বধূ আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করে জীবনকে বরণ করে নেয়, অবিশ্বাসী প্রেমিক প্রেমকে ফিরে পায়, হতাশ কবি আনন্দকে আবিষ্কার করে। সমালোচক স্বস্তি মন্ডল বলেছেন-"মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পটিতে যন্ত্রণাময় দারিদ্রের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ও কথার জাদু বাস্তবকল্পনার দ্বন্দময় জগতে আনন্দ শান্তি ও মুক্তি এনেছে।"[১৬]

ক্ষয়রোগে-এর মতো মরণান্তিক রোগ এর কথা আছে 'ফাঁকি' গল্পটিতে। মরণোন্মুখ তরুণী সুধার ব্যাকুল জীবনাকাঙ্ক্ষাকে মিথ্যা আশ্বাসের ছলে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন বৃদ্ধ দাদামশাই। সুধা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলে তার মাতাল স্বামী ও শাশুড়ীর অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পে—"সুধা যখন সুস্থ, সবল ছিল তখন তাহাকে দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়া চলিত, কিন্তু এখন এ রুগ্না, অকর্মণ্যার জন্য শুধু ঝি-র খরচ নয়, ডাক্তারের খরচও বাড়িয়াছে, একটা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সেটাকে দূর করিয়া লোকে নূতন যন্ত্রের অর্ডার দেয়, সুধার শাশুড়ী তেমনি সুধাকে বিদায় দিয়া, তাহার এক নূতন কর্মপরায়ণা বধূর দরকার একথা ঘটকীমহলে জানাইয়া দিলেন।"[১৭] গল্পে সুধার সকরুণ জীবনের পরিচয় আমরা পাই। সুধার স্বামী আর ফিরে আসার জন্য পত্র পাঠায় না, স্নেহের সন্তানটিকেও

ফিরিয়ে দেয় না তার কোলে। মর্মান্তিক সেই লুকোচুরি খেলার শেষে সুধা জানতে পারে, তার শিশুটিও মৃত্যু পথযাত্রী। ফুরিয়ে যায় তার জীবনপিপাসা। মাতা ও সন্তানের রহস্যময় বন্ধন তাকে জানিয়ে দেয় মৃত্যুর আমোঘ পদসঞ্চারেই এসেছে মাতা-পুত্রের মিলনক্ষণ, "খোকা আসছে.....কার সঙ্গে সে আসছে জান, সে মিথ্যা নয়, সে ফাঁকি নয়, সে মৃত্যু, সে স্বয়ং যম।"[১৮] মণীন্দ্রলাল বিশ শতকের দীর্ণ বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। হতাশা-নীতিহীনতা, জীর্ণতা, অমানবিকতা সব মিলিয়ে গড়ে ওঠা সমাজের অবক্ষয় ছিল সে যুগের মধ্যবিত্ত জীবনের চরম উপসর্গ।

'ঋতুপর্ণ' গল্পগ্রন্থের 'নিমাই' গল্পে দেখি নিমাই-এর জন্মের ক'দিন পর নিমাই-এর মা' মারা যায়। এরপর সে বাড়িতে অবহেলায় বড় হতে থাকে। কিন্তু সে কোনো স্থানে বেশিদিন থাকতে পারে না, তার ভাগ্যে সেটা সয় না। সে যাত্রা দলে যোগ দেয় কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা নিমাই-এর ভালো লাগে না। এরপর সে জমিদারের কন্যা লক্ষ্মী-এর জন্য জমিদার বাড়িতে স্থান পেল, কিন্তু লক্ষ্মীর বিয়ের পর সে সেই স্থান ত্যাগ করে কলকাতায় এল। সেখানে কমলা নামের একটি মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় চাইল। কমলার পিতা এই কন্যাদায়গ্রস্ত যুগে ছেলেটি কোনো কাজে আসতে পারে সেই ভেবে তাকে আশ্রয় দিল। "এ কন্যাদায়গ্রস্থ যুগে সে পরে কাজে লাগিতেও পারে।"[১৯] —কমলার বাবার এই উক্তি থেকে ধারণা করা যায় তৎকালীন যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে কন্যাদায় চিন্তার বিষয় ছিল। যদিও এই চিন্তার প্রকট প্রতিটি যুগেই ছিল, এখানে অদ্ভুত এক সময় চিত্রিত। নিমাইকে খারাপ পথে যেতে দেখে কমলার বাবা তাকে তাড়িয়ে দিলে সে মাধুরী দিদির কাছে আশ্রয় নেয় এবং মাধুরী দিদির শাসনে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হয়। মাধুরী দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিমাই দেশের সেবা কর্মে নিযুক্ত হয়। "কোথায় দুর্ভিক্ষ, কোথায় বন্যা, কোথায় মহামারী বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে সে ঘুরিয়া দেশমাতার সেবা করিয়া বেড়াইত।'[২০] গ্রামের গরীব মানুষদের দুর্দশার কথা এই গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন পরোক্ষভাবে।

মণীন্দ্রলাল বসুর প্রায় সব গল্পেই কমবেশি সমাজ বাস্তবতা, সমকাল, মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার কথা রূপায়িত। তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যেই প্রথম দেখা যায় বিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিহত জীবনযাত্রার অবসাদগ্রস্ত চিত্র। এই প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রী ভূদেব চৌধুরী যা বলেছেন তা এই প্রবন্ধের সারাৎসার রূপে তুলে ধরতে পারি- "বিশ শতকের অবধারিত মধ্যবিত্ত জীবন-বেদনা ও জীবন-বাসনার প্রথম সার্থক গল্পকার কবি ইনি।"[২১]

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট

লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০০৭৩, পুনমুর্দণ: ২০২১-২০২২, পৃষ্ঠা নং- ৩০৯।

২। বসু, মণীন্দ্রলাল, 'মায়াপুরী', নিউ আর্টিষ্টীক প্রেস, ১এ রামকিষন দাসের লেন, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩০, পৃষ্ঠা নং-৫

৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫

৪। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০০৭৩, পুনমুর্দণ: ২০২১-২০২২, পৃষ্ঠা নং- ৩১০

৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৩১০।

৬। বসু, মণীন্দ্রলাল, 'রক্তকমল' বরদা এজেন্সী, ১২/১, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৩১, পৃষ্ঠা নং-২৫

৭। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ২৮

৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৯৪

৯। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ১০৭

১০। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৬৬

১১। বসু, মণীন্দ্রলাল, 'সোনার হরিণ' মডার্ণ পাবলিশিং সিন্ডিকেট, ১৬-১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩১, পৃষ্ঠা নং —৪

১২। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৬৬

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৬৮

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৭৭

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৭৮

১৬। মন্ডল, স্বস্তি, 'মণীন্দ্রলাল বসু', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা নং-২৯

১৭। বসু, মণীন্দ্রলাল, 'কল্পলতা' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিসস্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৩৪১, পৃষ্ঠা নং-৮০

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং — ৯০

১৯। বসু, মণীন্দ্রলাল, মণীন্দ্রলাল বসু নির্বাচিত রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, এম.সি. সরকার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং — ২৯২

২০। তদেব, পৃষ্ঠা নং- ২৯৫

২১। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০০৭৩, পুনমুর্দণ: ২০২১-২০২২, পৃষ্ঠা নং- ৩১৩

পু তু ল বৈ দ্য

বনফুলের 'তাজমহল' : শাশ্বত প্রেমের বাস্তব রূপায়ণ

'বনফুল বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। লোককান্ত। রসিকচিত্ত-চমৎকারকারী। সাহিত্যের চতুরং-বর্তে কলাকুশল জীবন-শিল্পী তিনি। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ছোটগল্পে তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেমন অক্লান্ত তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাও তেমনি অন্তহীন। প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর লেখনী অজস্রবর্ষী। শিল্পরূপায়ণে নব নব রীতি ও রূপনির্মাণে তাঁর তুলনা নেই। জীবনের গবেষণাগারে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের যেমন তাঁর শেষ নেই, সাহিত্যের রূপকর্মশালায় বাণীলক্ষ্মীর নব নব রত্নাভরণ-রচনাতেও তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই।'[১] এই স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে আজও এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ব্যতিক্রমী বাচনভঙ্গী, বিস্ময়কর বাক্-রীতি, স্বল্পভাষায় গভীরতর ব্যঞ্জনায় জীবনবোধের উপলব্ধিতে তিনি অনন্য। মানবজীবনের বাস্তব চিত্র তাঁর মতো কেউ আর অঙ্কন করতে পারেননি। চোখের সামনে যা দেখেন তাকে নতুন করে আবিষ্কার করেন যিনি, তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। সার্থক তাঁর ছদ্মনাম বনফুল যার গন্ধ কেউ জানে না কিংবা চিনতে পারে না হঠাৎ করে কেউ। তাঁর ছোটগল্পের কাহিনি ও চরিত্রগুলি সেরকম এক একটা বনফুল। লেখকের (১৮৯৯-১৯৭৯) পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ও পেশায় ছিলেন ডাক্তার। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবিতা লেখার প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। যৌবনকালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়তে আসা। এবং তাঁর শিক্ষাগুরু বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় সাহিত্য জগতে পদার্পণ ঘটে। তাঁর ছোটগল্পগুলি যেন মানবজীবনের অন্তর্নিহিত জীবনসত্যের বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। মানবজীবনের বাস্তব সত্যকে তিনি অত্যাশ্চর্য মহিমায় অভিব্যঞ্জিত করেছেন, জীবনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে গল্পের উপপাদ্য করেছেন, আর পাঁচ জনের চোখ এড়িয়ে যাওয়া সামান্য বিষয়কে অসামান্য সাহিত্য মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তাঁর দৃষ্টি যেন কোন কিছু এড়িয়ে যায় না।

তীক্ষ্ণ জীবনঘনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ রহস্যানুভূতি, বুদ্ধিবাদী মনোলোকের জীবনসত্যের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তাঁর গল্পগুলিকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পের মধ্যে বাস্তব মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। তা কোথাও ক্রুর কিংবা ব্যঙ্গাত্মক। আবার কোথাও অসহায়তার বা জীবনের নিষ্ঠুর সত্য। তিনি জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। 'বনফুলের এই ব্যক্তিত্ব একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই উদ্ভূত। তাঁর কল্পনামূলে জীবনের কোনো অতিবাস্তব আদর্শের প্রতি আসক্তি ছিল না। কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে উৎসারিত প্রাণপ্রাচুর্যময় জীবন-চৈতন্য তাঁর শিল্পী-মানস সমুদ্ভাসিত। বনফুল সাহিত্যে এই স্বাস্থ্য ও প্রাণবত্তারই উদগাতা। তাঁর কল্পনালোকে একটি পূর্ণমানবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেহধারী প্রাকৃতিক নিয়ম শাসিত মানুষের পঞ্চসত্তা অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় সত্তার স্বাভাবিক তাঁর জীবনবেদও বলা যেতে পারে। মানবদেহে

প্রাণলীলার অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ স্বাভাবিক প্রকাশকে তিনি প্রণতি জানিয়েছেন। কিন্তু যেখানে তার অত্যাচার বা অনাচার ঘটেছে, দেখা দিয়েছে জীবনের রুগ্ন ব্যাধিত রূপ, যেখানে মানুষের দুর্বলতা ও মূঢ়তায়, তার অত্যাসক্তি ও অতিলোলুপতায় প্রাণধর্ম স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়ে বিকারগ্রস্ত ও স্বভাববিচ্যুত, সেখানেই তাঁর প্রাণপুরুষের ওষ্ঠাধারে দেখা দিয়েছে ঘৃণাদ্বেষক্রোধপ্রদীপ্ত বক্রহাসি। সে হাসি কখনো ভ্রূকুটি-কুটিল, কখনো ওষ্ঠাধার-প্রান্তলগ্ন; কখনো তাতে আছে ক্রোধোদ্দীপ্ত রুদ্রের বহ্নিদাহন, কখনো আছে করুণাকাতর স্রষ্টার কমনীয় অনুকম্পা। মানুষের স্খলনে ও পতনে, তাঁর আচার-আচরণের মূঢ়তায় ও আত্যন্তিকতায়, তাঁর দুর্নিবার নিয়তি ও স্বকর্মার্জিত দুর্গতিপ্রাপ্তিতে স্রষ্টার এই হাসি বনফুলের ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ।"[২]

বস্তুত পক্ষে বনফুল চোখ এড়ানো প্রতিদিনের জলজ্যান্ত-বাস্তব কাহিনিকে তাঁর ছোটগল্পের বিষয় করেছেন। যা তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে গভীর মর্মস্পর্শী এবং ব্যঞ্জনাময়। বনফুলের ছোটগল্পের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতির বিশ্লেষণ করতে গিতে বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে, তার নির্মম নিপুণ ব্যবহার হয়েছে ছোটগল্পে মানবজীবনের বিশ্লেষণে। পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা-মহত্ত্ব-ওউদার্য তাঁর বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পড়েছে। অতিপ্রাকৃত রস সৃষ্টিতে, মানুষের হীনতা-নীচতার নির্মম বিশ্লেষণে, বিজ্ঞানদৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে, দূরপ্রসারী সদা অতৃপ্ত কৌতূহলের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর ছোটগল্পগুলি হীরের টুকরোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বনফুলের শিল্পসামর্থ্য কেবল 'to open out the soul of little and familiar things' নয়, সেইসঙ্গে ব্যঙ্গের দর্পণে নির্মম উন্মোচনে ব্যাপৃত।"[৩]

বনফুলের 'অদৃশ্যলোকে'(১৯৪৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গল্প 'তাজমহল'। এই গল্পে ছোটগল্পকার নতুনতর প্রেমের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। গল্পটি আপন সঙ্গিনীর জন্য আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত। শাশ্বত ভালোবাসার জীবনরহস্যের দ্যোতনায় অভিব্যঞ্জিত 'তাজমহল' গল্পটি। ছোটগল্পটি এককথায় ব্যঞ্জনাধর্মী। সংক্ষিপ্ত কাহিনি অথচ গভীর ভাবনা জাগায় মানব-হৃদয়ে। গল্পটি উত্তম পুরষে বর্ণিত। স্বয়ং ডাক্তার-লেখক এই গল্পের কথক। লেখকের প্রথম আগ্রাতে আসা। তাজমহল দেখা। প্রথম যখন তিনি দিনের আলোতে ট্রেন থেকে তাজমহল দেখেছেন তখন তাজমহলকে একটা সাধারণ চুনকাম করা মসজিদের মতো মনে হয়েছে। কিন্তু একটি পূর্ণিমার রাত্তিরে মায়াবী জ্যোৎস্নালোকে তিনি তাজমহলকে দেখে এক অলৌকিক অপার বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করেন—

"পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউবীথি

থেকে নয় মনে হল, যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মর-ধ্বনি নয় যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মত স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেনা পটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহানমহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।"[৪]

এই সুদূর অতীতের চাপা-কান্না আসলেই কী? তা যেন সম্রাজ্ঞী মমতাজের প্রতি শাজাহানের কিংবা শাজাহানের প্রতি মমতাজের প্রেমের-বিরহের অহরহ ক্রন্দন ধ্বনি। যা নিঃশব্দে বহমান নদীর জলপ্রবাহের মতো। সম্রাটের কোষাগার শূন্য করে বানানো চোখ ধাঁধানো স্মৃতিসৌধ প্রেমের নিশান। কিংবা বলা যায়, সম্রাজ্ঞীর প্রেমের প্রতি সম্রাটের সম্মান-চিহ্ন।

অন্য মানুষজনের মতো তাজমহলের সৌন্দর্যময়তায় বিমুগ্ধ লেখকের মুগ্ধতার মায়াবী পর্দা দু'চোখ থেকে সরে যায়। যখন তিনি আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে আসেন। প্রতিদিন তাজমহল দেখতে দেখতে লেখকের স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তাজমহলের নস্টালজিয়া বাস্তবতার কাছে হার মেনে যায়। তাজমহল নিয়ে লেখকের আর কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু গল্পের মোড় হঠাৎ করে পালটে দেন লেখক। কর্মব্যস্ততার মাঝে একদিন ডাক্তার-লেখক চিকিৎসালয়ের আউটডোর সেরে বারান্দা থেকে নামছেন, তখন এক বৃদ্ধ মুসলমান পিঠে এক প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নিজের বেগমকে বয়ে এনেছে তাঁকে দেখাবার জন্য। নিতান্ত গরীব সে। বাড়িতে ফি দিয়ে ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। তাই হাসপাতালের আউটডোরে নিয়ে এসেছে। হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোরখা খুলতেই ডাক্তার দেখলেন—

"কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল ক্যাংক্রামঅরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডান দিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না।"[৫]

"এই দূরারোগ্য ব্যাধি সারার নয়। বীভৎস দুর্গন্ধে, অন্য রোগীদের আপত্তিতে হাসপাতালের বারান্দাতেও তার জায়গা মিলল না। অবশেষে হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছের তলায় রেখে ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা চলছিল ডাক্তারের সহানুভূতি এবং সাহচর্যে। একদিন প্রবল বৃষ্টিতে ডাক্তার কল থেকে ফিরছেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পান বৃদ্ধ মানুষটি একটা চাদরে দু'টো খুঁট গাছের ডালে বেঁধে বাকি দু'টো খুঁট নিজ হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে। বৃদ্ধের স্ত্রী আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরেছে তা সত্ত্বেও

বৃদ্ধ বয়সে তার প্রতি স্বামীর এই ভালোবাসায় প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও আধখানা মুখে হাসি লেগে থাকতে দেখেন লেখক। এই বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ করে জানতে চায় তার স্ত্রীর আদৌ বাঁচার কোন আশা আছে কিনা। অবশেষে বৃদ্ধ সত্যি কথা জানতে পারে। এরপর বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। একদিন লেখক ঝাঁ ঝাঁ রোদের এক দুপুরে দেখতে পান আরও কয়েকদিন পরে। সেদিনও কল থেকে ফিরছি একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা দিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে! কি হচ্ছে এসব মিঞা সাহেব? বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে। বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর! কবর? হ্যাঁ হুজুর। চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তির নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম তুমি থাক কোথায়?

আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-পরবয়। দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার? ফকির শা-জাহান! নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।"[৬]

ফকির শাজাহান হৃদয়ের বেদনা দিয়ে নির্মাণ করছেন 'ক্যাংক্রাম অরিসে' আক্রান্ত তাঁর বেগমের জন্য ভালোবাসার তাজমহল। যে তাজমহলের নেই কোন জৌলুস। নেই কোন আতিশয্য কিংবা আত্মদম্ভের স্ফুরণ। রয়েছে কেবল ফকির শাজাহানের একনিষ্ঠ নিখাদ পত্নী প্রেম। 'তাজমহল' গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক জগদীশ ভট্টাচার্য খুব সুন্দর মন্তব্য করেছেন :

"এই 'পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা'বশেই বেগম-মণ্ডলী-পরিবৃত সম্রাট সাজাহানের তাজমহলের ঐশ্বর্য-সমারোহে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু ফকির-সাজাহানের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের মহিমা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। .....কিন্তু সম্রাটের মত প্রিয়ার সমাধিকে 'মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' সাজিয়ে দেবার শক্তি তার নেই, তাই কতকগুলো ভাঙা ইট আর কাদা দিয়েই ফকির সাজাহানের 'তাজমহল' গড়া হয়। সম্রাটের অমর কীর্তির পাশে এ চেষ্টা মানুষের কাছে যেমন নগণ্য তেমন হাস্যকর। বনফুল মানুষের দৃষ্টির এই নিপুণতার সঙ্গেই ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।"[৭]

এখানেই 'তাজমহল' গল্পের সার্থকতা। তাজমহলের জন্য অমর প্রেমিক সম্রাট শাজাহানের ঠাঁই হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এই তাজমহলও সম্রাটের অর্থের আড়ম্বর, ঐশ্বর্যের গরিমা কিংবা তাঁর প্রেমের অহংকারকে সদম্ভে ঘোষণা করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সম্রাট নির্মিত তাজমহলের পাশে হতদরিদ্র এক ভিখারী প্রেমিক শাজাহানের এক ফাঁকা-হাহাকারময়-বিবর্ণ-বিষণ্ণ প্রান্তরে কাদা-ইটের এক সামান্য কবরের চিত্র। কিন্তু সেই কবরে নেই কোনো অর্থের আড়ম্বর-ঐশ্বর্যের গরিমা; আছে শুধু সম্রাট শাজাহানের মতোই কিংবা তাঁর চেয়েও বেশি প্রেমিক হৃদয়ের বেদনাঝরা কান্না এবং এক অনন্ত দীর্ঘশ্বাস। সৌন্দর্যময়ী

সম্রাজ্ঞীর জন্য নির্মিত চোখ ধাঁধানো তাজমহলের পাশে কুৎসিত-বীভৎস-পচা শরীরের বেগম সাহেবার জন্য ফকির সাজাহানের নির্মিত সামান্য কবর আরও বেশি খাঁটি। আসলে বনফুল 'তাজমহল' গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ভালোবাসা বা প্রেমের জন্য কেবলমাত্র বাইরের ঐশ্বর্য-দাম্ভিকতা কিংবা অর্থের আড়ম্বরই বড় নয়। তার জন্য চাই অন্তরের নিখাদ ভালোবাসা। একজন ফকির মানুষের প্রেমিকার প্রতি, প্রেমের প্রতি সম্মানবোধ লেখককে তথা পাঠককেও বিস্মিত করে। এই সম্মানবোধের প্রতীক হল ফকির শাজাহানের হাতে তৈরি ইট-কাদার কবর।

প্রেমের জন্য মানুষ জীবনের সব কষ্ট স্বীকার করতে পারে। ফকির শাজাহানের কাছেও প্রেম এমন এক আবেগ যার কোন বিকল্প নেই। যারা সুগন্ধ মেখে প্রেমিকার মন জয় করতে চায়, সে তাদের দলভুক্ত নয়। কিংবা যারা কথায় কথায় সুমধুর বাক্যবাণে প্রেমিকার মন জয় করতে চায়, সে তাদের দলভুক্ত নয়। ফকির শাজাহান মনে প্রাণে বিশ্বাস করে হৃদয়ের আকুতির মাধ্যমেই প্রিয়ার মন জয় করা যায়। যে ভালোবাসার মধ্যে কোন প্রতারণা থাকবে না। থাকবে না কোন কৃত্রিমতা বা লোক দেখানো আবেগ প্রদর্শন।

লেখক বনফুল 'তাজমহল' গল্পে প্রেমিক সম্রাট শাজাহান এবং ফকির শাজাহানের প্রেমের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের দু'জনের ভালোবাসার-প্রেমের প্রতীক চোখ ধাঁধানো তাজমহল এবং ইট-কাদার তাজমহল। সম্রাটের প্রেমের সঙ্গে মিশে আছে ঐশ্বর্য ও অর্থের আড়ম্বর। মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবার আশ্চর্য চাহিদা। বিপরীতে ফকিরের প্রেম একেবারে ঐশ্বর্যহীন নিখাদ ভালোবাসা। যা মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। কেননা এই ফকির শাজাহানের প্রেমের মধ্যে কোন প্রকার ছলনা নেই। ভালোবাসার জন্য ফকির শাজাহানের শুধুমাত্র অন্তরের অন্তঃস্থলে সত্যিকারের শাশ্বত প্রেম জাগ্রত রয়েছে। লায়লা-মজনু কিংবা শাজাহান-মমতাজের প্রেমের কথা যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ফকির শাজাহানের পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না। মানব সমাজে ফকিরের প্রেমের মতো এইরকম সাধারণ প্রেমকে কেউ মনে রাখতে চায় না। কথা সাহিত্যিক ডাক্তার-বনফুল তাঁর শব ব্যবচ্ছেদের ছুরি কাঁচি দিয়ে মানুষের চোখে সাধারণ প্রেমকে করে তুলেছেন অনির্বচনীয়। সম্রাটের তাজমহলের চেয়ে ফকিরের তাজমহল কোন অংশে কম নয়। পার্থক্য শুধুমাত্র অর্থের দাম্ভিকতায়। কিন্তু দু'টো তাজমহলের অভ্যন্তরে ঝরে নিরন্তর প্রেমিক মনের বেদনার কান্না। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং প্রেমের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসব মিলিয়ে ফকিরে সত্তা সম্রাটের সত্তার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এক ফকির শাজাহানের প্রেমিক শাজাহান হয়ে ওঠাকে লেখক সুন্দরভাবে পরিস্ফুটন করেছেন। মানব সংসারে এরকম ভুরি ভুরি ফকির শাজাহানের অকৃত্রিম প্রেমের খবর কেউ রাখে না। এবং তাদের প্রেম যে কোনো কোনো সময় সম্রাটের প্রেমের চেয়েও ভাস্বর ও খাঁটি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রেমের সোপান বেয়ে নারী-পুরুষের পার্থিব জীবনের অবতরণের সূচনা হয়েছে। যুগে যুগে জনপ্রিয় প্রেম কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্রগুলির সিংহভাগই কোন না কোন বিখ্যাত বা ক্ষমতাবান মানুষের। যেগুলি মানুষের অন্তরে দাগ কেটে যায় চিরকাল। পার্থিব জৌলুস ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভালোবাসার পাশাপাশিও অনাড়ম্বর জীবনেও প্রেম থাকতে পারে তার খোঁজ সাধারণত কেউ রাখে না। নিত্যদিনের দারিদ্র্যতার মাঝে দু'টো মানুষের অন্তরের টানকে কেউই পাত্তা দেয় না। মানব হৃদয়ের কুঠুরিতে প্রেমের বসবাস। সে মানুষ হোক সম্রাট কিংবা ফকির। কথাসাহিত্যিক বনফুল বাস্তব জীবনের আড়ালে থাকা মানুষের জৌলুসহীন অকৃত্রিম ভালোবাসাকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছেন। তিনি সমাজের অতি সাধারণ বিষয়কে তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পরীতির মৌলিকতায় অসাধারণ করে তুলেছেন। সম্রাট শাজাহানের প্রেমের তুলনায় ফকির শাজাহানের পত্নীর প্রতি প্রেম যে কোন অংশে কম নয়তা তিনি তুলে ধরেছেন। মানবজীবনের হৃদয়ের নিউক্লিয়াস হল প্রেম। সেখানে কোন প্রকার বিভেদ নেই। বনফুলের এই ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা এবং জীবনোপলব্ধি বাংলা সাহিত্যে তাঁকে উজ্জ্বল স্থান দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'ভূমিকা'-জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

২. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'ভূমিকা'-জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮-৯। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের পুত্তলিকা: বাংলা ছোটগল্পের এক শ দশ বছর: ১৮৯১-২০০০। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৭। দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্কণ, এপ্রিল-২০০৪। কলকাতা।

৪. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'তাজমহল' গল্প। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬১। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

৫. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'তাজমহল' গল্প। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬২। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

৬. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'তাজমহল' গল্প। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৩। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

৭. বনফুল। বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প। 'ভূমিকা'-জগদীশ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪। দ্বিতীয় বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১। কলকাতা।

মি ঠু রা য়

বনফুলের ছোটগল্পে (নির্বাচিত) মানবজীবন ও নারী

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বনফুল জীবন-রসিক জীবন-শিল্পী। বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ মানুষটি তাঁর শিল্পসাহিত্য নতুন নতুন রূপ নির্মাণ করেছেন। ডাক্তার হবার সুবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। গ্রামীণ ও শহুরে জীবন-দর্পণ তাঁর ছোট গল্পগুলোকে ঋদ্ধ করেছে। আমাদের চিরচেনা সংসারে পরিচিত মানুষের হীনতা, শঠতা, নিচতা, মহত্ত, ঔদার্য, ধরা পড়েছে তাঁর লেখনীতে। হিন্দু মুসলমান, সাঁওতাল, ভিল, ভিখারি, ফকির, হকার থেকে ডাক্তার, মোক্তার, জমিদার, নায়েব, কেরানি, তাঁর গল্পে যেন বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালা। নারী পুরুষ তাঁর গল্পে সহজ সাবলীল। গল্পের চরিত্রেরা চলনে-বলনে, আচার ব্যবহার, আবেগ-বিবেক, চিন্তন-মননে, অভিনব চমৎকার। মানুষের সুস্থতা মন মানসিকতা ভালো থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানমনস্ক এই মানুষটি চিকিৎসক জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। স্বভাবতই তার ছোটগল্পে মানব জীবনের বহুরূপী চিত্রটি বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে। কখনো তা সুন্দর, কখনো কুৎসিত, কখনো উদার-মহৎ, কখনো হীন, কখনো আত্মসুখ পরায়ণতায় সংকীর্ণ, কখনো উৎসর্গে মহিমান্বিত। লেখকের কোন অতিন্দ্রীয় মোহ ছিল না, ছিল না কোন আদর্শের আকর্ষণ। তাঁর লেখনীতে মানুষ মানুষই। মানুষই জীবনে ভুল করে, অন্যায় করে, সেই আবার প্রায়শ্চিত্ত করে। তাঁর কাছে মানুষ দেবতাও নয়, শয়তানও নয়। মানব জীবনে নারী পুরুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিচিত্ররূপে বিরাজমান।

বাস্তব সমাজ জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। মানবিক বোধ ও সুস্থ চিন্তা-ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। মানব জীবনের আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা স্বরূপসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের আরও গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। 'সমাধান' গল্পে কালো কুৎসিত মেয়ের জীবনের চালচিত্র যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। আজও আমাদের সমাজে সুন্দরী নারীর কদর বেশি। কালো কুৎসিত মেয়েরা সমাজে অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত। বুঁচি জন্মানোর পর শুধু বাড়িতে নয় সমাজেও রীতিমতো তার রূপ নিয়ে আলোচিত। "মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রং তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তাছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের- মুখে সর্বদা লালা ঝরে! পুষ্প মঞ্জুরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক"[১]। কালো কুৎসিত রূপ নিয়ে জন্মানো যেন অন্যায়, পাপ। সবাই সুন্দরের পূজারী। সুন্দরী বউ, সুন্দরী পুত্রবধূ কামনা করে। সুন্দরের পূজা করতে গিয়ে অসুন্দরকে নির্দ্বিধায় হারিয়ে দেয়। মেয়ের বাপকে মোটা টাকার বিনিময়ে জামাই কিনতে হয়। সেটাও কম কষ্টের নয়। এভাবেই কালো কুৎসিত মেয়েগুলো সমাজে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত।

'তিলোত্তমা' গল্পে দেখি কালো কুৎসিত মেয়ে ও যৌতুকের কারবার। বকেয়া যৌতুক, রুচি বিরুদ্ধ, মতবিরুদ্ধ সত্ত্বেও বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সমাজ বাস্তবতায় চরম অসহায়ত্বে দুর্দিন যাপন করে কালো কুৎসিত মেয়েগুলো। তারা স্বামীর সঙ্গ দিতে অপারগ। তিলোত্তমাও পারেনি। কারণ সুদর্শন, ধনী, নাট্যশিল্পী, গোকুলের অযোগ্য। তিলোত্তমা-"না জানে লেখাপড়া, না জানে গান বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুন। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে"[২]। "একটা চাকরাণীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়"![৩] স্বভাবতই বাড়ির সকলে দ্বিতীয় বিয়ে দিতে চায়। মেয়ের মায়ের দোষ থাকা সত্ত্বেও দশ হাজার টাকা পণ ও রূপসী ঊষার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় গোকুলের পিতা। আর্শীবাদের সময় তিলোত্তমার শঙ্খ বাদনে গোকুল আর বিয়ে করেনি। দেরিতে হলোও তার বিবেক জাগ্রত হয়েছে।

রাধার জীবনেও কামনা ও প্রাপ্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল। মানুষের মধ্যেও সেই আশা আর প্রাপ্তির অমিল থাকা সত্ত্বেও জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছে। 'সুলেখার ক্রন্দন' গল্পেও আমরা তা দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বনফুল নারীর মন ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারাকে বলেছেন অদ্ভুত। "নারীর মন বিচিত্র তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে চট করিয়া কোনও মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুত স্ত্রী জাতির সম্বন্ধে কোনও কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য"[৪]। একজন ষোড়শী তন্বী সুলেখা জ্যোৎস্না প্লাবিত গভীর রাত্রিতে কাঁদছে। কবিকল্পনায় প্রশ্ন 'কেন এই ক্রন্দন'? এই কান্নার কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন—সুলেখার প্রথম সন্তান ডিপথিরিয়ায় মারা গেছে। মাতৃত্বের শোক সুলেখার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। চিরকালের জন্য সব হারিয়ে পুত্রশোকে সুলেখা উন্মাদ। বেরসিক স্বামী, তন্বী সুন্দরী স্ত্রীকে সিনেমা দেখাতে না নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিমান। শাড়ির পাড় পছন্দ করা নিয়ে মতভেদ এবং পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতায় স্বামীর জয়লাভ। চাঁদনী রাতের কৈশোরের অপ্রস্ফুটিত পূর্বরাগ। "সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধা স্বপ্নবিহ্বল। চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার পাথর! এমন দুর্লভ ক্ষণে অরুণদার কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব; না, অপরাধ?"[৫] এই কল্পিত কাব্যের জাল বুনতে বুনতেই ক্রন্দনের সত্য উদঘাটিত হলো। সুলেখা দাঁতের ব্যথায় কাঁদছে।

'অমলা' গল্পে অমলা যেন প্রতীকী চরিত্র। অমলা ভারতীয় সমাজে অবিবাহিত কন্যাদের মনের অনুরণন, চিন্তা-স্বপ্ন-চেতনাকে দোলা দেয়। ঘরে কুমারী মেয়েদের নিয়ে পিতামাতার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বিয়ে দিতে পারলেই দায় সারা। বাবা মায়ের চিন্তা কতক্ষণে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারবে। এদিকে যৌতুক ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। পাত্রপক্ষের সঙ্গে দরদামের বনিবনায় হারিয়ে যায় অমলার মতো শত শত নারীর স্বামীর ঘর করার বাসনা, স্বপ্ন। "অমলাকে আজ দেখতে আসবে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁকলে। সুন্দর, সুশ্রী,

যুবা, বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবি সুন্দর সুপুরুষ। অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এলো। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাবলে 'আমার ঠাকুরপো'। মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সেই রাত্রেই স্বপ্নই দেখলে। "বিয়ে কিন্তু হলো না— দরে বনল না"[৬]। পাত্রী পছন্দ হলেই হয় না, সঙ্গে লাগে মোটা অংকের টাকা। এখানে বিয়ের নামে চলে কেনাবেচা। এবার পাত্র স্বয়ং হেমচন্দ্র। দাবিদাওয়া ঠিক হলেও পাত্রী পছন্দ হল না। শেষে মেয়েও পছন্দ। দাবিদাওয়াও ঠিক হল, অমলার স্বপ্ন পূরণ হলো। কিন্তু অমলার পাত্র পছন্দ কিনা কেউ খবর নেয়নি। শুভদৃষ্টির সময় অমলার মায়ার মায়ায় বুক ভরে উঠলো। সে এখন সুখেই আছে।

'অদ্বিতীয়া' গল্পে নারী পুরুষের সাধারণ ধারণাকে পরীক্ষা করেছে। পুরুষের নারীর প্রতি আসক্তি বা দ্বিতীয় বিবাহে যে আপত্তি থাকে না তা প্রমাণ করেছে। প্রভাবতীর ধারণা ছিল সে তার স্বামীর জীবনে অদ্বিতীয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তা সত্যি নয়। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পাবার মাস তিনেকের মধ্যে পত্নীব্রত স্বামী দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হয়েছে। তার যুক্তি—"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদা মনে পড়ে। কিন্তু দেখো সেজদি, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে তো সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিকই চলছে এবং চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয় এটাই ঠিক। তাছাড়া দেখো আমরা 'মা ফলেষু কদাচন' দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়"।[৭] গোঁফ কামিয়ে তরুণ সেজে যথাসময়ে বিবাহ হলো। রহস্যের উন্মোচন হলো ফুলশয্যার রাতে। মিলনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকে দেখলেন ছেলে পুলে নিয়ে প্রথম স্ত্রী প্রভাবতী বসে আছে। শালিকার ষড়যন্ত্রে ও বাজি রাখা রসিকতায় পুরুষজাতির মনোভাব ফুটে উঠেছে।

নারী মনস্তত্ত্বের আলো ছায়াময় একটি দিক ফুটে উঠতে দেখি 'ছেলে-মেয়ে' গল্পে। দুই অসম বয়সী নারী। আন্নাকালী ও নমিতা। দুইজন আসন্ন প্রসবা নারী হাসপাতালে পাশাপাশি খাটে। বয়স ও রুপের তারতম্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব জন্মে। দেখা গেল উভয়ে পুরুষ বিদ্বেষী। পুরুষ জাতির নানাবিধ দোষ কীর্তন করতে উভয়েই পঞ্চমুখ। শেষে নিজ নিজ স্বামীর দোষ গুণের গুষ্টি উদ্ধার করে ছাড়ে। দুজনেই সন্তান প্রসব করলে দেখা গেল আন্নাকালী অষ্টম সন্তান মেয়ে। নমিতা একটি পুত্র সন্তানের জননী গৌরব অর্জন করে ধন্য হলো। আন্নাকালী কন্যা সন্তান দেখে ক্ষিপ্ত হল। মেয়ে তার হতে পারে না, তার বিশ্বাস তার ছেলে হয়েছে। তাছাড়া জ্যোতিষ বলেছে তার ছেলে হবে। নার্সরা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র করে শিশু অদল-বদল করে দিয়েছে। আন্নাকালীর প্রতিবাদ নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে চিৎকার করতে লাগল। লেখক পুরুষ-বিদ্বেষী নারীর পুত্র সন্তান লাভের দিকটিকে বক্র দৃষ্টি ও কৌতুকাবহ করে তুলেছে।

একজন চির কুমারী নারীর সকলের মা হয়ে ওঠার কাহিনী 'বীরজুর মা' গল্পটি। সে ছিল গোয়ালিনী। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কোনো না কোনো ছেলে মেয়ে থাকিত। কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কারো নাকে সিকনি, কার চোখে পিঁচুটি, কারো মাথায় তেল নেই, তো কারো মুখে ঘা। আসলে বিরজুর মা একজন চিরকুমারী। তার আসল নাম সোহাগ। সোহাগের বিবাহ স্থির হয়েছিল বীরজুর বাবার সাথে। কোন কারণে সেই বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বীরজুর বাবার অন্যত্র বিবাহ হলে তার প্রথম সন্তান বিরজুকে সোহাগের হাতে তুলে দেয়। কিছুদিন পর সে মারা যায়। সেই থেকে সোহাগ হয়ে যায় বিরজুর মা। ধীরে ধীরে বীরজুর মা হয়ে যায় সার্বজনীন মা। তাঁর মৃত্যুতে সারা গাঁ যেন অনাথ হয়ে যায়। "বিরজুর মায়ের শবের পিছনে গ্রাম শুদ্ধ লোক চলিয়াছে। সব বয়সের লোক। এক পাল ছেলে মেয়ে। সকলে আকুল ভাবে কাঁদিতেছে"।[৮]

নারীর কাছে দুঃসাধ্য বলে কিছু নেই। নারী ছলনাময়ী। নারী তার যৌবনের হিল্লোলে যে কোন পুরুষের বুকে তরঙ্গ তুলতে পারে। তা যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে কোন কথাই নয়। সেই রকমই একটি গল্প 'নিপুণিকা'। নিজ দেশের জন্য স্পাই হয়ে নিজের জীবন বাজি রাখে। কঠিন হৃদয়ের সেনাপতি যুদ্ধে সামান্য আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। "লীলাময়ী তন্বী রূপসী। খঞ্জননয়নের চটুল চাহনি, পীবরবক্ষের সংযত অসংযম, লাস্য-চপল- ললিত গমন ভঙ্গিমা, মিষ্টি কণ্ঠে রজত নিক্কনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্মকোপ-কমনীয় ভূভঙ্গি পাষাণকেও উতলা করিয়া তোলে"।[৯] এইরূপ নার্সের সেবায় সেনাপতি কাম-বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাকে পাওয়ার বাসনায় উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শেষে সেনাপতির সহায়তায় পুরুষের রূপ ধারণ করে নার্স রূপী স্পাই হাজির হয় সেনা ছাউনিতে। রাতের অন্ধকারে মান অভিমানে, ভোগের বাসনায় যুদ্ধের কৌশল জেনে নেয় নার্স। তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই যুদ্ধের প্ল্যান কাগজে লিখে খেয়ে ফেলে। নিজেকে এবং নিজের শরীরকে বিলিয়ে দেয় সেনাপতির কাছে। সেনাপতির গুলিতে তার মৃত্যু হয়। টেবিলে লেখা চিঠিতে সেনাপতিকে ভালোবাসার কথা বলে তার দেহকে শত্রুপক্ষের শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। কারণ তার পেটের মধ্যেই যুদ্ধের প্ল্যান লেখা ছিল।

বনফুলের 'পরিবর্তন' গল্পে দাম্পত্য প্রণয়ের চরম ট্রেজেডি ফুটে উঠেছে। অন্ধ পতি ভক্তির পরিণাম যে কত শোকাহত বা ট্রাজিক হতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই 'পরিবর্তন' গল্পটি। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত স্বামী হরিমোহন। স্বামীর সেবায় সরমার অক্লান্ত ত্রুটিহীন সেবাযত্ন। ঔষধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে পদসেবা পর্যন্ত। স্ত্রীর সেবা সত্বেও হরিমোহনের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। এই কথা স্বামীর মৃত্যুর নিশ্চিত আশঙ্কা বহন করে আনে। অন্যদিকে সরমা ও গোপনে স্বামীর উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করে। কারণ তার যুক্তি— "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে। উনি যদি না, বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোন? ছেলে মেয়েও যদি একটা থাকতো তাহলেও বা কথা

ছিল"। যার অনিবার্য পরিণাম সরমার মৃত্যু। তার দুটো লাঙ্গই আক্রান্ত হয়,অনেক চিকিৎসার পরও তাকে আর বাঁচানো যায়নি। হরিমোহন কিন্তু বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে যায়। পতিব্রতা, সেবা পরায়ণ, প্রেমনিষ্ঠ সরমাকে ভুলতে পারেনি হরিমোহন। তাই অনেক খুঁজে খুঁজে সরমা নামের মেয়েকেই সে বিয়ে করেছে।

বনফুলের ছোটগল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি রস সৃষ্টিতে। প্রকৃত বিজ্ঞানী অনন্ত রহস্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে যান। জীবন বিজ্ঞানের জীবন-সত্যের সম্মুখে বিস্ময়। মানব মনের অপার রহস্যের বনফুল তল হারিয়ে ফেলেন। 'তিলোত্তমা', 'পরিবর্তন', 'অমলা', 'অদ্বিতীয়া' প্রভৃতি গল্পে নারীর মন বোঝা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে জীবন-রসিক বনফুল রূপ সাধনাতেই জীবন সাধনা করেননি। সমগ্র জীবন-সত্য গল্প-রূপের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'নিমগাছ' গল্পে নিম গাছকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। কেউ সেদ্ধ করে, কেউ শিলে পিষে, কেউ গরম তেলে ভেজে, কেউ দাঁতে চিবিয়ে মুখ পরিষ্কার করে। এর সঙ্গে তুলনীয় গল্পের শেষ পংক্তি— "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটির ঠিক এক দশা"।[১১] আসলে সমাজ বাস্তবতায় লক্ষ্মীবউটির অসহায় কারুণ জীবনের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজের নারীর দুর্দশা।

তথ্যসূত্র :

১। বনফুল- 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প' বাণী শিক্ষা প্রকাশনী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২২।
২। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩৩
৩। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩৩
৪। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩০
৫। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২
৬। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪০
৭। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪১
৮। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৭
৯। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্য-১২০
১০। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯২
১১। তদেব পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৭

র চ না রা য়

প্রথম পার্থ : অন্দর মহলের রাজনীতি

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা পৌরাণিক তথা পুরাণ নির্ভর সাহিত্য রচনা সবচেয়ে বেশি হলেও আধুনিক মননসঞ্জাত করে তাকে প্রথম সাহিত্যে তুলে আনলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কচ ও দেবযানী', 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি নাট্যকাব্যের আধারে পুরাণ রূপায়িত হল নব ভাষ্যে। সেই ধারাকে অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসুর পুরাণ নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রয়াস। অধ্যাপনা সূত্রে কেবল নয়, ছেলেবেলা থেকেই পুরাণ তথা রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের একজন গভীর অনুসন্ধিসু পাঠক হয়েও তিনি ভারতীয় পুরাণকে বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লিখেছেন 'মহাভারত কথা'। এখানে তিনি মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও চরিত্রকে নতুন নতুন ভাবনায় আলোকিত করেছেন। ১৯৩১-এ লিখিত তাঁর প্রথম পুরাণ নির্ভর নাটক 'রাবণ'। যদিও কয়েক বার মহলা দেওয়া সত্ত্বেও তা অভিনয় হয়নি আর প্রকাশিতও হয়নি। পরবর্তী সময়ে পুরাণ নির্ভর অজস্র কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের রূপকার বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করলেন কিছু কালজয়ী কাব্যনাট্য — 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'কালসন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', এবং 'সংক্রান্তি'। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যনাট্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'(১৯৬৬)। এর কাহিনি রামায়ণের হলেও বুদ্ধদেব বসু পাঠ করেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত থেকে, যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণিত ছিল। এ নাটক প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এক জায়গায় জানাচ্ছেন—

"সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তর-তিরিশ।"

তাহলে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি অন্তরে লালন করেছিলেন কাহিনিটিকে এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাট্যরূপ পেয়েছে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। পুরাণকে হুবহু অনুসরণ করেননি বুদ্ধদেব বসু, পরিবর্তে তার মধ্যে সঞ্জাত করেছেন আপন যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র ও আবহমণ্ডলে নাট্যকার আপন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটকটিকে করে তুলেছেন বিংশ শতকের মানুষের উপযোগী করে। নাটকের ভূমিকাংশে নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু জানাচ্ছেন

"...এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত-অর্থাৎ, একটি পুরাণকাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসিকতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই

ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; ....."[১]

এ স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, নাট্যকার 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটিকে কোনো পৌরাণিক নাটক হিসাবে রচনা করতে চাননি, চেয়েছেন পুরাণের ছাঁচে আধুনিক মানুষের মনস্তত্ত্বকে ধরতে। পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গ হয়েছেন উর্বরতার প্রতীক। কিন্তু পুরাণ বা রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনির উল্লেখ থাকলেও নেই তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা যা আছে আধুনিক কবি নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে।

কোন সেই সুদূর কালে রচিত মহাভারতের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে মানব-সভ্যতা, মানব-সমাজ ও মানব-মনস্তত্ত্বের গভীর-জটিল, বহু গ্রন্থিক জীবন ইতিহাস। আধুনিক ইন্টারনেটের যুগে এসেও বিস্মিত হতে হয় মহাভারতের কবির আশ্চর্য জীবন ও মানব মনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতায়। একেই হয়তো বলে মহাকাব্যিক চেতনা। মহাভারত এমন এক জাতীয় মহাকাব্য যা ভারতবাসীর অন্তরের সঙ্গে একাত্ম। বিপুল বিস্তার ও চরিত্রের আধিক্য থাকলেও এর মধ্যে এমন এক মায়াস্পর্শ আছে যাতে কবি-সাহিত্যিকগণ বারবার আকৃষ্ট হয়েছেন মহাভারতের নিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে। এ অনেকটা পুরানো বোতলে নতুন মদ পরিবেশনের মত। কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু কয়েকটি কাব্য নাটক রচনা করেছেন যেখানে মহাভারতের কাহিনির নব ভাষ্য রচিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়, তাঁর কাব্যনাটকটি 'প্রথম পার্থ'। নাটকটি পর্যালোচনা করে, আমরা দেখতে চেষ্টা করব বুদ্ধদেব বসু আধুনিককালের পটভূমিতে কিভাবে মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রগুলোকে স্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করলেন 'প্রথম পার্থ'। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্যের দ্বারা তিনি যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্পূর্ণ অবগাহন করার পর বুদ্ধদেব বসু এ কাহিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে একটু ভিন্ন পথে চালনা করলেন। শুধু কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর আবেগপ্রবণ কথোপকথন নয়, নাট্যকার যুক্ত করলেন আরো দুটি চরিত্র-দ্রৌপদী এবং শ্রীকৃষ্ণকে। নাট্যকার মহাভারতের মূল কাহিনি থেকে কিছুটা সরে এসেছেন হয়তো। কিন্তু কর্ণের সঙ্গে কুন্তী, দ্রৌপদী বা কৃষ্ণের কথোপকথনের উপস্থাপনার দক্ষতায় তা একেবারে যেন মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ' নাট্যকাব্যে দেখিয়েছিলেন মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল স্নেহকাতরতা। পুত্রের মঙ্গলকামনায় কর্ণকে তার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে কর্ণকে পান্ডব পক্ষে যোগদানের জন্য আহ্বান করেছিলেন কুন্তী। কর্ণ বীর, দাতা প্রতিশ্রুতি পরায়ন। বন্ধু দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, পরাজিত হবে জেনেও সে সানন্দে পরাজয়ের গ্লানিকেই বরণ করে গৌরাবান্বিত হতে চেয়েছে। আমরা জানি না, মহাকবি ব্যাসদেবের কলমে এমন কোন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কর্ণ

চরিত্রে ছিল কিনা! কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একেবারেই মানবিক দ্বান্দ্বিকতায়, কোমলে-কাঠোরে, বঞ্চিত-নিষ্ফলের দলভুক্ত করেছেন। ফলে কর্ণ চরিত্রটি বাঙালি পাঠক সমাজে সহানুভূতি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব বসু 'প্রথম পার্থ' নাটকে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবপ্রবণতাকে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু স্বল্পক্ষণের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসু আপন ব্যক্তিগত চিন্তা-চৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাটকে। সামগ্রিক মহাভারত পাঠ অভিজ্ঞতা পর বুদ্ধদেব বসু একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে অতি নমনীয় ও কবি প্রাণ নিয়ে কাব্যনাটকটিকে প্রকাশ করেছেন। প্রধান চরিত্রগুলিকে একটি মানবিক মাত্রা দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণে আমরা মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে যখন 'প্রথম পার্থ' নাটকটি পড়ি তখন কোথাও এদের ধূসর যুগের মানুষ বলে মনে হয় না। আবেগে, বীরত্বে, ছলনায়, তারা মানবিক উষ্ণতায় পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়।

পার্থ। কুন্তীর পুত্র কর্ণ, প্রথম পার্থ নামে পরিচিত। কুন্তীর অপর নাম পৃথা। এই অর্থে তার পুত্র পার্থ। তবে মহাভারতে অর্জুনই পার্থ নামে সমধিক পরিচিত। 'প্রথম' শব্দটি যুক্ত করে নাট্যকার কুন্তীর প্রথম সন্তানকে ইঙ্গিত করেছেন। কর্ণ মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সূর্যপুত্র কর্ণ সুতপুত্র রূপে সমাজে পরিচিত ছিল। কিন্তু তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দুর্যোধন তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছে এবং অঙ্গরাজ্যের রাজার পদে অভিষিক্ত করেছে। এই হিসেবে বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে কর্ণ দুর্যোধনের কাছে আবদ্ধ। নাটকটিকে পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দুজন বৃদ্ধের অবতারণা করেছেন যাঁরা নাটকে সূত্রধরের কাজ করেছেন। প্রথম বৃদ্ধের সংলাপে কর্ণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নাটকের শুরুতে উত্থাপিত হয়েছে :

> "অনেকে কর্ণকে বলে উগ্রস্বভাব, দাম্ভিক,
> কিন্তু কর্ণের নিন্দুকেরা আমার বন্ধু হয়নি কখনো।
> আমি দেখেছি তাঁকে দিনের পর দিন
> এই গঙ্গার তীরে, বনভূমিতে, নিঃসঙ্গ।
> মগয়া তাঁর ব্যসন নয়, নারী তাঁর বিলাস নয়,
> প্রমোদে তিনি উদাসীন, নির্জনতা ভালোবাসেন।
> আমি তাঁকে জানি মহাপ্রাণ ব'লে,
> শুধ অস্ত্রবীর নন, সত্যনিষ্ঠ,
> দানে তিনি সূর্য্যের মতো উদার, ত্যাগে তিনি মহিমান্বিত।"[২]

তবে মূল কাহিনির সূত্রপাত মাতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্ত থেকে। রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাহ্নে (উদ্যোগ পর্বে) গঙ্গাতীরে সূর্য বন্দনারত কর্ণের কাছে মাতা কুন্তীর আবির্ভাব। আমরা দেখি নির্জন গঙ্গা তীরে এক বনভূমির মধ্যে 'বৃক্ষের মতো ছায়া ফেলে কর্ণ দণ্ডায়মান।' সেই সময় মৃদু পায়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অর্জুন জননী কুন্তী এসেছেন তার প্রথম পুত্র কর্ণের

কাছে। কর্ণের জন্মরহস্য উন্মোচন করে তাকে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ যুদ্ধে পান্ডব পক্ষে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মাতৃ পরিচয় পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেও কর্ণ তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। মাতৃ চরণে তার করুণা ও শ্রদ্ধা অর্পণ করে সে বিনীত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে—

"দুর্যোধন আতিথ্য দিয়েছেন আমাকে আমার ঘোষিত হীন জন্ম সত্ত্বেও,
আমারও আছে তাঁর প্রতি কর্তব্য তিনি যেমনই হোন।
আর, আমার জন্মকথা যত না হোক বিস্ময়কর,
রাধা আমার মাতা ব'লে স্বীকার্য, পিতা অধিরথ —
জগতের কাছে — আমার নিজের কাছেও।
— দেবী, আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য। আপনি ফিরে যান।"[৩]

দুর্যোধনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সে অপারগ। অগত্যা বিষণ্ণ হয়ে কুন্তী ফিরে গেছেন নিজ গৃহে।

পরবর্তী সময়ে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ চরণে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখি যাজ্ঞসেনী, দ্রুপদ-কন্যা, পঞ্চপান্ডবপ্রিয়া কৃষ্ণসখী দ্রৌপদীকে। বন্ধুত্বের আহ্বান নিয়ে সে আজ কর্ণের কাছে উপস্থিত। কর্ণ পান্ডবদের শত্রু অর্থাৎ সেই হিসেবে দ্রৌপদী বৈরীপত্নি। তা সত্বেও সমস্ত অপমান, সমস্ত ঘৃণা বুকের মধ্যে আড়াল করে দ্রৌপদী কর্ণের কাছে বন্ধুত্ব স্থাপনের পরামর্শ নিয়ে এসেছে।

"সম্ভব কি নয়, সম্ভব কি নয়
মুহুর্তের জন্য, কয়েক মুহুর্তের জন্য
তোমার আর আমার মধ্যে প্রীতিবিনিময়?"[৪]

সে চেয়েছে কর্ণ যেহেতু কুরু বংশের কেউ নয়, তাই কুরুক্ষেত্রের এই ভয়াবহ যুদ্ধে সে যেন থাকে নির্লিপ্ত। কর্ণের বীরত্ব ব্যতীত দুর্যোধন এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম থেকে বিরত হবে। পাণ্ডব পক্ষের জয় হবে জেনেও, পাঞ্চালির প্রতি তার দুর্বলতা থাকলেও কর্ণ পাঞ্চালির বন্ধুত্বকে সানন্দে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্রৌপদীর সঙ্গে কর্ণের কথোপকথনে আমাদের কোথাও কোথাও মনে হয় কর্ণ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করতে উদ্যোগী। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে বিজিতের দলে যোগদান করছে। মৃত্যুকে সে যেন বড় আপন করে কাছে পেতে চেয়েছে। তাই দ্রৌপদী নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্ষণকাল নীরব থেকে সে আপন মনে বলে—

"না, দ্রৌপদী, আমি উন্মাদ নই
শুধু অপেক্ষামান
সেই মহান, নিষ্করুণ পরীক্ষার জন্য,
যার মধ্য দিয়ে, অবশেষে,
আমি পাবো আমার আত্মপরিচয়,
হে পারব নিজের কাছে প্রকাশিত ও প্রমাণিত।"[৫]

এর পরেই আমরা মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখি মহাভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ভারত-যুদ্ধে অর্জুনের সারথি, কখনো কখনো সে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও ত্রাণকর্তাও বটে। কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। কর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত তিনি জানেন। এমনকি তার আগমনের পূর্বে মাতা কুন্তী ও দ্রৌপদী যে কর্ণের কাছে এসেছিলেন সেকথাও কৃষ্ণের অজানা নয়। কৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের জন্য পুনর্বার আহ্বান করেন। কৃষ্ণ বারবার বলেছে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কর্ণ যদি পান্ডব পক্ষে যোগ দেয় তাহলে যুদ্ধ বন্ধ হবে নিশ্চিত। তাহলে বিপুল সম্পত্তি ও লোকক্ষয় থেকে হস্তিনাপুর রক্ষা পাবে। কেবলমাত্র বৃহত্তর স্বার্থেই কর্ণের পান্ডব পক্ষে যোগদান করা উচিত বলে মনে করেছে কৃষ্ণ—

"আমার উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ।
কর্ণ, তুমি কি দেখছো না।
কুরবংশের এই গৃহবিবাদ
আজ বিস্তীর্ণ হ'লো পৃথিবীতে।
চীন, যবন, বাহ্যিক রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত?
সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে
তেমনি সর্বদেশের সৈন্যদল মিলিত হ'লো
এই ব্রহ্মাবর্তে, কুরুক্ষেত্রে?
আর তারপর —
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎস্যদেশে দুর্ভিক্ষ,
সুদূর কম্বোজপুরে রাষ্ট্রবিপ্লব, চেদিরাজ্য যুবকহীন, সিন্ধুরাজ্যে সধবা নেই
ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত।
এ-ই কি তুমি চাও, কর্ণ —
তুমি, দয়াবান, লোকেরা যাকে দাতা ব'লে জানে?"[৬]

কিন্তু কর্ণ তার বক্তব্যে ও সিদ্ধান্তে অটল। প্রত্যেকের বক্তব্য ও যুক্তিতে কর্ণের অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। একদিকে সে চেয়েছে পরম ভালোবাসায় আপন মানুষগুলোকে কাছে পেতে; অন্যদিকে তার প্রতিবাদী অভিমানী বঞ্চিত হৃদয় চেয়েছে যুদ্ধের সর্বনাশী রক্তনেশা। তাই হাজার উপরোধ, অনুরোধ সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে সে আপন ভ্রাতা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। পরাজয়ের গৌরবে সে যুগ যুগ ধরে মানবহৃদয় জয় করার অভিলাষী।

নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ দক্ষতায় পুরাণের পাতা থেকে যে চারটি চরিত্র তুলে আনলেন তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, অন্তর প্রবণতা, স্বতোৎসারিত মানবিক আবেগ এবং তাদের বক্তব্য যেভাবে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাদের ধূসর ইতিহাসের মানুষ বলে মনে হয় না। বরং আধুনিক যুগের আত্মসচেতন, স্বার্থপর, যুক্তিবাদী মানুষ বলেই মনে

হয়। যে ভাষায় ও যে ভঙ্গিতে কর্ণ সমস্ত লোভ, লালসা, প্ররোচনা উপেক্ষা করে, নিয়তি নির্দিষ্ট ভবিতব্য খন্ডন করতে চেয়েছে, তাতে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। গভীরভাবে সমগ্র মহাভারত পাঠ করে কবি বুদ্ধদেব বসু নাটকের চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের চিরায়ত সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন,

"যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।"

"সব যুদ্ধই অন্যায়। সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা।"

"অহিংসা উত্তম ধর্ম, যদি সকলেই তা মেনে চলে নচেৎ নয়।"

"যুদ্ধহীন কোনো কর্ম নেই জগতে।"

"অন্যায়ের থেকে অন্যায়ের জন্ম আশাতীত নয়।"

"আমরা তাঁকেই শ্রদ্ধেয় বলি, যাঁর স্খলন স্বল্প, সদগুণ প্রচুর।"

"যুদ্ধ দুই পক্ষে, তার আর্তি সর্বজনীন।"

"এ যুদ্ধে সকলেই পরাজিত হবে, কর্ণ /জয়ী, বিজিত, হত, উদ্বৃত্ত সকলেই।"[৭]

মানব মনস্তত্ত্বের এমন জটিল গ্রন্থি মহাভারতের ছত্রে ছত্রে রয়েছে। আধুনিক কবি-নাট্যকার-বুদ্ধদেব বসু তাকেই মহাকাব্যের যুগ থেকে তুলে এনে নতুনভাবে আধুনিকতার মোড়কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মহাভারতের কাহিনি নিয়ে তিনি যখন তাকে নতুন করে মঞ্চে উপস্থাপন করেন বা নাটকের পৃষ্ঠায় তুলে আনেন, তখন তা হয়ে যায় সমকালীন মানুষেরই জীবন ভাষ্য। যুগের দূরত্ব ঘুচিয়ে তা হয়ে যায় আধুনিক মানুষের সম্পদ। এইখানে মহাভারতের মহাকবির সৃষ্টির বিশেষত্ব, আর বুদ্ধদেব বসুর শিল্পীত সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব।

আকর গ্রন্থ :

১. প্রথম পার্থ: বুদ্ধদেব বসু: দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা

২. তপস্বী ও তরঙ্গিণী : বুদ্ধদেব বসু, আনন্দ

তথ্যসূত্র :

১. তপস্বী ও তরঙ্গিণী : বুদ্ধদেব বসু, আনন্দ

২. প্রথম পার্থ: বুদ্ধদেব বসু: দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮

৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯

৪. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৭

৫. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩১

৬. ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৫

৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৯, ১৫২, ১০৩-১০৫, ১১১, ১১৩, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৮, ১৫৫

ভাবনা সহায়ক :

১. কাব্যনাট্য বিভাবনা: তরুণ মুখোপাধ্যায়: সুপ্রিম পাবলিশার্স, বইমেলা ২০০৭, কলকাতা

২. মহাভারতের কথা: বুদ্ধদেব বসু: সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা।

শি খা ক র্ম কা র

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্প : সামাজিক দর্পণে নারীর চরিত্র চিত্রায়ণ

নারীরা স্রষ্টার অনিঃশেষ জিজ্ঞাসার পূর্ণতায় শুধু নারীর অধিকারহীনতা কিংবা সংসারে পুরুষের প্রতি তুলনায় তাদের প্রতি ঘটে যাওয়া নানা অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্নই তোলে না নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিবাদও করে কখনও সোচ্চার তো কখনও নিরুচ্চার ভাবে। আশাপূর্ণা দেবী সেই নারীদের মাধ্যমে কোনও জয় পরাজয়ের সহজ সরলীকরণে বদ্ধ উপসংহারে কথার ইতি টানেননি বরং সংগ্রামী মানসিকতাকে অনিঃশেষ জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সাংসারিক বাধা নিষেধ কিংবা প্রতিবাদী ধরন দুটোরই বিরোধী ছিলেন তিনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকে শুধু অভিনয়ই করে যেতে হয় ঘরকে রঙ্গমঞ্চ এবং নিজেকে একজন দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে প্রমাণ করতে। আশাপূর্ণা দেবীর নায়িকা নারীর নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব পরিসর সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন যা কিনা নারী চেতনাবাদী তত্ত্বের মূল অন্বেষণের ক্ষেত্র। বাঙালির পারিবারিক জীবনের নিপুণ চিত্রকর তিনি। সমাজ জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নানা টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব সংঘাত দীর্ঘদিন ধরে দেখেছেন আর সেইসব কথা ছোটোগল্পের ছোটো পরিসরে নিগূঢ়ভাবে অঙ্কন করেছেন। সমাজ ও জীবন সম্পর্কে যে গভীর বোধ, বিশেষ করে নারী-পুরুষের অসমতা, সংসার ও সন্তান ভারে নারীর যন্ত্রণাময় জীবনযাপন, স্বাধীন ভাবনা প্রকাশের কোনো পর্যায়েই তাদের অবস্থান না থাকা, শুধুই পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকা ইত্যাদি এ যেমন জীবনের একটি পর্যায়ে আশাপূর্ণা দেবী লক্ষ্য করেছেন, আবার জীবনের মধ্যপর্বে দেখেছেন নারী শিক্ষাজগতে, সাহিত্য জগতে, কর্মজগতে প্রবেশ করে নিজের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া পরিবারে আবদ্ধ নারীও চিন্তা চেতনায় এগিয়ে চলেছে, নতুন চিন্তার অনুসারী হয়ে সমাজের পুরোনো ভাবনাকে অস্বীকার করছে, নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশেও দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না এবং পুরোনো ভাবনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে, এর ফলস্বরূপ কখনো নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে, কখনো বা সংঘাতের মধ্য দিয়েই চলছে, আবার কখনো পুরোনো ভাবনার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। নিজের জীবনের শেষ পর্বে তিনি নারীকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকটের প্রতিচ্ছবি বাংলা গল্পকারদের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। নিম্নবিত্তের সংকট সবসময়েই থাকে। কিন্তু সেই সময় মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতায় নতুন জীবনের সন্ধানে নানা ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি গল্পকারদের লেখায় সেই সময়ের চিত্র বেশ জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। বাঙালি মধ্যবিত্তকে খুবই নতুনভাবে জীবনের ভাবনা ভাবতে হয়েছিল সেই সময়। তারই প্রতিফলনে উঠে এসেছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালির জীবন-নীতি ও জীবন ভাষ্য অবলম্বনে নতুন ধারার সামাজিক গল্প।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্প : সামাজিক দর্পণে নারীর চরিত্র চিত্রায়ণ

মেয়েদের বহু ব্যবহৃত আটপৌরে ভাষাকেই অন্তর্ধানের বাচন হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিবাদের স্বরকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর 'অভিনেত্রী' গল্পের শুরুতেই অনুপমার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'। এই বহুযুগীয় নারীর কল্যাণকামী পরিচয়ে। মেয়েদের দ্বিতীয় গৃহ যে শ্বশুর গৃহ এবং কখনও ইচ্ছায় কখনও অনিচ্ছায় সেটাকেই নিজের বলে মানিয়ে নিতে হয় তাই 'অভিনেত্রী' গল্পের অনুপমার তার জন্মদাত্রী পিতাকেই মনে হয়েছিল অতিথির মতো। এভাবে গল্পের শুরু থেকে শেষ দৃশ্য আসা অবধি অনুপমাকে আমরা সেই নারীর চির পরিচিত রূপ যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনুমোদিত সেই রূপেই দেখতে পাই অনুপমা গোটা গল্প জুড়েই কখনো কন্যার, কখনো স্ত্রীর, কখনো বৌমার তো কখনো মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে অন্যের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে, পারিবারিক শান্তির আবহ বজায় রাখতে। অনুপমাকেও আমরা দেখি সমস্ত দিনরাত্রি ধরে শুধু কথার মালাই গেঁথে চলে পোক্ত সুতোর গ্রন্থি বন্ধনে। 'অভিনেত্রী' গল্পের অনুপমা একজন দক্ষ অভিনেত্রী শুধু এই কারণেই যে সে নিজস্ব সৃজনের গুণেই বিপরীতমুখী দৃশ্যের অন্তর্ভুক্তিতেও জীবনের গ্রন্থনা করে চলে সুদক্ষ শিল্পীর মতোই।

ধীরে ধীরে সেই নারীরও পরিবর্তন ঘটেছে। তারা ঘরের বাইরে পা রেখেছে। শিক্ষার অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করেছে। ডিগ্রিধারী হয়ে ধর্মজগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, এর ফলে ঘর সংসার ও বাইরের কর্মক্ষেত্রের কাজ উভয়ই সামাল দিতে শিখেছে। আর বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র ঘটায় নারীর জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধি ঘটেছে। যুগের ভাবনা ও বৈশিষ্ট্য তাদের চোখে ধরা পড়েছে এবং তার কারণেই পুরোনো ভাবনাকে সরিয়ে নতুন যুগ বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করার পথে এগিয়ে চলার মানসিকতা তৈরি করেছে নানা বাধা বিঘ্নকে এড়িয়ে, এমনই এক সময়ের পরিবর্তমান ভাবনাকে সূচিত করা হয়েছে 'আয়োজন' গল্পে। রুমার শুধু সাজ পোশাকে পরিবর্তন আসেনি, সে চলনে এক নতুন ছন্দকে রপ্ত করেছে যা গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা রুমার সঙ্গে যৌবনে শহরের আবহাওয়ায় থাকার পার্থক্যকে বুঝিয়ে দেয়। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে দরিদ্র ঘরের রোগা শীর্ণ মেয়েটি নতুন চলার ছন্দ, সাজ পোশাকে নতুন ছাঁট এবং আধুনিকতার নানা ভাবধারাকে আয়ত্ত করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটোগল্পে নারীর প্রতি সমাজের গড়ে দেওয়া চিরন্তন ভাবনার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। 'বরফজল' গল্পে তিনি দীপিকাকে সাহিত্যিক হিসেবে তুলে ধরেছেন। মা-মেয়ের সম্পর্ক চিরন্তন। মা মেয়ের জন্য আত্মবলিদান করবেন এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। মা তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য একে একে নিজের সব শখ আহ্লাদ বিসর্জন দেবেন এটাই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু এই গল্পে দীপিকা তার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। সেটা করতে গিয়ে সে সংসারে, সমাজে অধিকাংশ মানুষের বিরাগভাজন হয়েছে। সব জেনে বুঝেও দীপিকা নিজের জন্য বেঁচেছে। এত দিনের নিয়মে মাতৃত্ব নিয়ে সমাজের যে ভাবনা তা সে ভেঙে দিয়েছে। এই গল্পে আশাপূর্ণা দেবী মায়ের প্রতি মেয়ের ঈর্ষাকে দেখালেন। বদলে যাওয়া এক নারীর উত্থানের

গল্প 'বরফজল'। সংসারের ঘেরাটোপে আটকে থাকতে ভালোবাসতেন যিনি, হঠাৎ করে সেই নারীর আমূল পরিবর্তন সকলকে অবাক করেছিল।

'বরফজল' প্রগতিশীল বনাম রক্ষণশীলতার গল্প। এ গল্পের কাহিনি শুরু হয়েছে অধ্যাপিকা দীপিকার কর্মব্যস্ততার বর্ণনা দিয়ে। দীপিকা পেশায় অধ্যাপিকা। তার নেশায় রয়েছে লেখালেখি। অধ্যাপিকা দীপিকার খাতা দেখা আর শিক্ষকতা তার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। এর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করে দীপিকা, সদ্য সুনামের অধিকারী হয়েছে। সাহিত্যচর্চার সুনামের সঙ্গে সঙ্গে দীপিকার সভা-সমিতিতে যাতায়াত এবং নিজেকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার তাগিদে তিনি বাড়তি মনোযোগী হয়েছেন রূপচর্চায়। এই রূপচর্চাই হয়ে উঠেছে মূল ক্রাইসিস। নবীন প্রজন্মের দুই কন্যা, বুবু-টুবু ও অধ্যাপক স্বামী সুরঞ্জনের রক্ষণশীল মানসিকতার বিপ্রতীপে দীপিকার অতি আধুনিক হয়ে ওঠা এবং পরিপাটি রূপচর্চা সৃষ্টি হয়েছে পারিবারিক সংকট। মধ্যবিত্ত পরিবারে গৃহবধূর পড়ার জন্য আলাদা স্টাডি রুমের ব্যবস্থা করা অপ্রতুল। গল্প পাঠ করে অধ্যাপিকা দীপিকার সখ হিসেবে বলা যেতে পারে সাজসজ্জা করার সখ। দীপিকার দুই কন্যা সন্তান বুবু-টুবুর পড়ার ঘর হয়ে ওঠে দীপিকার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। সাজগোজের একমাত্র স্থল। এই ঘরই তার স্টাডি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিথিল হয়ে প্রসারিত হয়ে থাকার একমাত্র জায়গা। গৃহস্থের মহিলা রাঁধছিল, বাড়ছিল, সংসার করছিল হঠাৎ খবরের কাগজে লেখা ছাপাছাপি-প্রকাশকদের আগ্রহ, বাড়িতে আনাগোনা, সাহিত্য সভায় ডাক-এই গৃহস্থ চৌকাঠ পেরিয়ে দীপিকার বাইরের জগতে পদার্পণ প্রতিষ্ঠা ও যশ খ্যাতির গৌরবকে মেয়েরা মেনে নিতে পারেনি। দীপিকার গৌরবকে ম্লান করে দিতে চেয়েছে, তারই মেয়েরা। মায়ের নাম ডাকে মেয়েরা খুশি হতে পারেনি। স্বামী সুরঞ্জনতো নয়ই। গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী দেখাতে চেয়েছেন নারীর উন্নয়নে পুরুষতান্ত্রিকতার বাধার প্রাচীর অপেক্ষা তার চারপাশের নারীরা হয়ে উঠেছে অচলায়তনের বদ্ধ প্রাচীর। বাঙালি গৃহবধূর প্রচলিত ছক ভেঙ্গে দীপিকা আপন ভাগ্য জয় লাভে অভিলাষী হয়ে উঠেছে। সে কারও অনুকম্পার পাত্রী হতে চাইনি। তাই তার এই ছক ভাঙা কাণ্ডকারখানাকে স্বামী ও কন্যারা মেনে নিতে পারেনি, এখানেই তৈরি হয়েছে সংকট, তৈরি হয়েছে অর্নঘাত মায়ের এই হঠাৎ নাম ডাকে মেয়েদের মনে হিংসা জাগে, ঈর্ষার নব অভিমুখ তৈরি হয়। তারা চায় মা ঘর সংসার করুক। মেয়েদের জন্য সময় দিক। পরিবারের সেবাযত্নে নিয়োজিত থাকুক। খুব বেশি হলে অবসর সময়ে একটু সাহিত্যচর্চা করবে। দীপিকার মনের অন্তর্লোক পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে গল্পকার পরিবর্তনশীল সমাজ মানসিকতায় যুক্তিযুক্ত মননকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে প্রগতিশীল বনাম রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

'ইজ্জত' গল্পটি শুরু হয় একজন মায়ের তার সুন্দরী মেয়ের ইজ্জত রক্ষার ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে। বাসন্তীর একমাত্র মেয়ের রূপই কাল হল। অনেক অনুনয় বিনয় করে একপ্রকার জোর করেই সুমিত্রার কথা আদায় করে বাসন্তী তার মেয়েকে রাখার ব্যবস্থা করে ফেলে।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির খেটে খাওয়া বাসন্তীর সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুমিত্রার যে কোনো পার্থক্য নেই তা গল্পকার বুঝিয়ে দিলেন। অশিক্ষিত বাসন্তী মনে করেছিল লেখাপড়া জানা ভদ্র পরিবারে নারী পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। সংসারের নিয়ম বড়ো বিচিত্র। খেটে খাওয়া বাসন্তী ভাবতে পারেনি তার কথার কোন মূল্য নেই স্বামীর কাছে। সংসারে নারীর অবস্থান কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়। নারীর কোনো আলাদা পরিচয় নেই। সে ধনী হোক বা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তীয়, আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সব নারীর অবস্থান একই রকম। নারীর মান অপমান নিয়ে পুরুষসমাজ ভাবিত নয়, যে কারণে এই গল্পে দেখতে পাই মহীতোষের মধ্যে নিজের স্ত্রীর কথা রাখার কোনো তাগিদ দেখা যায় না বরং অল্প বুদ্ধির অপবাদ দিয়ে বস্তিবাসী বাসন্তী ও তার মেয়ের সামনে নিজের স্ত্রীর মান সম্মানকে নিলামে তুলতে দ্বিধা করে না। নারীর প্রকৃত মান, সম্মান, ইজ্জতের স্বরূপ আসলে পুরুষ সমাজের গড়ে দেওয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা।

'খুন' গল্পে দারোগাবাবুর স্ত্রীর চরিত্র নির্মাণ করে আশাপূর্ণা দেবী আমাদের সামনে নারীর অন্য একটি রূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। গল্পটি তাই একটি রাজনৈতিক মৃত্যুর ঘটনা না হয়ে, হয়ে উঠেছে মাতৃত্বের খুনের ঘটনা। পরিচিত মাতৃত্বের চেনা ছকের বাইরে গিয়ে দারোগাবাবুর স্ত্রীর চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল হতেই সন্তানের খোঁজে পিতা থানায় চলে আসতেন, এক বুক আশা নিয়ে, তার ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায়। নিঃসন্তান ছোটো দারোগাবাবুর স্ত্রী, পর্দার আড়াল থেকে সন্তানহারা পিতার আর্তনাদ শুনতে পেতেন। সন্তান না থাকার কি যন্ত্রনা তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। ছোটো দারোগাবাবুর একটি চড়ে যে ছেলেটির মৃত্যু হল তা নিজের চোখে দেখার পর থেকে দারোগাবাবুর স্ত্রী স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাই নিজের স্বামীর অপরাধের কথা সকলের সামনে উচ্চারণ করে তিনি ওই সন্তানহারা পিতাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাকে মনে হতে পারে দারোগার স্ত্রী ঠিক কাজ করেননি। কারণ যে পিতা জীবিত ছিলেন তার সন্তানের ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে তার সেই আশাকে সে ভেঙে দিল। আসলে সে জানত, মিথ্যা আশা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সত্যিকে মেনে নিয়ে জীবনে নতুন করে বাঁচার অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। আজ হয়তো এই সত্যির জন্য তিনি কষ্ট পেলেন, এই সত্যি মেনে নিয়ে নিজের জীবনকে অন্য পথে নিয়ে যেতে পারবেন। মিথ্যে নিয়ে বাঁচার থেকে সত্যিকে স্বীকার করে নেওয়া ভালো। এই কারণে ছোটোদারোগাবাবু স্ত্রী বৃদ্ধকে তার সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। দারোগার স্ত্রীর এই নিষ্ঠুরতার পিছনে রয়েছে মাতৃত্ব। গণেশের মনে হয়েছিল এমন হিংস্র মুখ সে আগে দেখেনি। দারোগার স্ত্রীর এই হিংস্র রূপের কারণ কিন্তু দারোগার কৃতকর্ম। নিরপরাধ ছেলেটিকে ধরে এনে সজোরে চড় মারাকে মেনে নিতে পারেনি দারোগার স্ত্রী। পর্দার আড়াল থেকে সব দেখেছিলেন। বৃদ্ধ লোকটি যখন তার ছেলেকে খুঁজতে থানায় এসে একই কথা বারে বারে বলত, দারোগাবাবু ঐ বৃদ্ধকে তেমন কিছু বলতে পারতেন না। থানার

সব চৌকিদার বৃদ্ধের একই প্রশ্নে রেগে যেত ছোটোদারোগাবাবু, কিন্তু চুপ করে থাকতেন। নিজের অন্যায় কৃতকর্মের জন্য ছোটোদারোগার মধ্যে কোন অনুশোচনা হয় না। তাই প্রতিদিন ওই বৃদ্ধকে নানা কৌশলে বকা দিয়ে জেলে ভরার ভয় দেখিয়ে, ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। ছোটোদারোগার ভালো মানুষের মুখোশকে সকলের সামনে খুলে দিতেই দারোগাবাবুর স্ত্রী কঠিন কাজটি করেছিলেন। একজন সন্তানহারা পিতাকে তার ছেলের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তিনি মূলত মুখোশধারী পুলিশের সমালোচনা করেছেন। প্রচলিত মতে স্ত্রীর কাজ তার স্বামী সন্তানের কথা মতো কাজ করা, তাদের সম্মান রক্ষা করা। নারীর প্রতি সমাজের এই মনোভাবকে বদলে দিলেন গল্পকার। নারীর মায়া-মমতা, তার মাতৃত্বের, ত্যাগের গল্প তো যুগ যুগ ধরে সমাজ বলে আসছে। নারী আসলে নিজে কী চায় সে সম্পর্কে সমাজ উদাসীন থাকলেও আশাপূর্ণা দেবী তা এই গল্পে দেখিয়ে দিয়েছেন।

তাস খেলার ঘর যেমন সহজেই ভেঙে যায়, তেমনি তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসারও এক নিমেষেই ভেঙে যেতে পারে, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী 'তাসের ঘর' গল্পে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। গল্পের অন্দরমহলে প্রবেশ করলে দেখতে পাই ঘটনার একমুখিনতায় গল্পের স্বচ্ছন্দ পথ চলা। গল্পের ঘটনা একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। বাঙালির যৌথ পরিবার জীবনের কাহিনি উঠে এসেছে। সংসারের বড়ো বউ মমতা সকলের প্রিয় না হলেও শাশুড়ি সুশীলবালার চোখের মণি। আসলে মমতা সংসারে সবার প্রিয় হলেও একমাত্র ঠাকুরঝি তরঙ্গিনীর চোখের বালি। সংসারের বড়ো বউ বলে সকলে মান্যও করে। কিন্তু ননদিনী তরু যে তাকে সহ্য করতে পারে না। স্বামী আদর করে বোনকে 'তরু' বলে ডাকলেও মমতার কিন্তু তাতে রাগ নেই বরং সে সবাইকে নিয়ে চলতে চায়। ঘটনা একমুখীনভাবে এগিয়ে গেলেও মমতা চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়ে চলেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র মমতা। যৌথ পরিবারের বড়ো বউয়ের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল সে। স্বামী, সন্তান, শাশুড়ি, দেওর-জা, ননদ নিয়ে তার সংসার। সে সদাহাস্যমুখী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণ। গুণের সীমা ছিল না। স্বামীর ঘরে সকলেই প্রায় তাকে ভালোবাসত। সবাইকে নিয়ে গল্প করা, যত্ন করে খাওয়ানো, সেবা করাতে তার জুড়ি মেলা ভার। শ্বশুরবাড়িতে ভাইয়ের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে একদিন নিজেই চরিত্রহীন এবং আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু যে সংসারের জন্য তার এত ত্যাগ-তিতিক্ষা সামান্য অবিশ্বাসে মমতাকে অপরাধী করতে ছাড়ে না। নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতেও চায় না সে, তীব্র অভিমানে স্বামী ও সংসারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মমতা। আসলে এটাও তো একপ্রকার প্রতিবাদ প্রিয়জনের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। এভাবেই এক প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে নিজের অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতে চায় মমতা।

আশাপূর্ণা দেবীর 'ছিন্নমস্তা' চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা দুই বিধবা রমনীর অস্তিত্বের, সংকটের, লড়াইয়ের কাহিনি চিত্রিত। বলা যেতে পারে একটি শান্ত প্রতিশোধের কাহিনি। মনোবিষের জ্বালা প্রতিভার জন্য সোজাসুজি ভাবে নয়, এই মনোবিষ জয়াবতীর ছেলে

বিমলেন্দুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের জন্য। এই মনোবিষ থেকে জয়াবতী সংসারে যে কত বড়ো অন্ধকার নেমে এলো তা গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী উপস্থাপনা করেন কাহিনির চরম পরিণতি বিমলেন্দুর মৃত্যুর মাধ্যমে। যেখানে জয়াবতী দ্বিতীয়বার এবং প্রতিভা প্রথম ও শেষবার আশ্রয় হারা হয়। ছিন্নমস্তা নামের আড়ালে এখানে দুই বিধবার মাথার ছাদ বা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ার এক করুণ পরিণতি প্রকাশিত। গল্পটিতে খুব বেশি চরিত্র নেই তবুও দুইটি মূল চরিত্র অর্থাৎ বিধবা জয়াবতী ও বিধবা প্রতিভা দুই নারীর মানসিক আবেদনের জায়গায় এক নারীর মানসিক আবেদন স্পষ্ট ফুটে উঠে। আসলে তৎকালীন সমাজে মেয়েরা শুধুমাত্র প্রজননের যন্ত্র হিসেবেই স্থান পেয়ে এসেছে। তাদের শখ-আহ্লাদ, দাবি-দাওয়া কোনটাই পূরণ করার মতো, সর্বোপরি আবদার মেটানোর মতো কেউই থাকত না। তবুও কিছু পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতায়, কাঁচাপয়সা দিয়ে আমোদ-এর জন্য ঘরের মেয়েরা বিভিন্ন জামা-কাপড়, স্নো-পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা শুরু করে। আর সেই অবস্থায় হয়তো ছিল প্রতিভার বাড়িতে। সমাজের আরেকটি দিক দেখানো হয় যে মেয়ে মানুষের শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা নয় সাংসারিক শিক্ষা। যেখানে জয়াবতী প্রতিভার থেকে শতগুণ এগিয়ে কিন্তু স্বামী দেবনাথ চলে যাওয়ায় এয়ো স্ত্রী হওয়ার সমস্ত দিকগুলি অকালেই চাপা পড়ে যায় অন্যদিকে গল্প পাঠ করে জানা যায় প্রতিভা ক্লাস নাইন পাশ অর্থাৎ সে জয়াবতীর সাংসারিক শিক্ষা থেকে পুঁথিগত শিক্ষায় এগিয়েছিল। বিয়ের আগে যে বিমলেন্দু কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করত, কথা বলত সেই বিমলেন্দু আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। এখানেই প্রথম ধাক্কা পায় জয়াবতী। কারণ ছেলে তার চোখের মণি এবং তার আশ্রয়দাতা। সেই দাতাই যখন বিমুখ হয়ে যায় তখন তার মনে নিরাপত্তাহীনতা ও সর্পিল গহন অন্ধকার দানা বাঁধতে থাকে। আশাপূর্ণা দেবী গল্পে পুত্রের সঙ্গে জয়াবতীর যে সখ্যতা তার আড়ালে জয়াবতীর নিরাপত্তাহীনতা, হীনমন্যতা মনোবৃত্তির পরিচয় দেন। প্রতিভার বাবার বাড়িতে প্রতিপত্তি, সুখ, স্বচ্ছলতায় মানুষ হয়েছিল তাতে শ্বশুর বাড়িতে একমাত্র স্বামী তার কাছে আপন হয়ে উঠেছিল, শাশুড়ি নয়। তবু জয়াবতী বারংবার চেষ্টা করেছিল বউকে আপন করে নেওয়ার কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস অন্যরকম। আসলে এই গল্পে একই সংসারে থাকা মা জয়াবতীর প্রতিশোধের দিকটি তুলে ধরেছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী।

তথ্যসূত্র :

১। দেবী আশাপূর্ণা : গল্প সমগ্র, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৬ সন মণ্ডল বুক হাউস,কলকাতা

২। মণ্ডল তপন : বাংলা ছোটোগল্প চর্চা : দ্বিতীয় খণ্ড দিয়া পাবলিকেশন ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ : ১৪ এপ্রিল, ২০২৪ঊঊ১ বৈশাখ, ১৪৩১

৩। দেবী আশাপূর্ণা : নক্ষত্রের আকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ : মহালয়া ১৪০৩ সন, সাহিত্যম কলকাতা

ডা ক্তা র মা হা ত

মালোদের অস্তিত্ব সংকট : প্রসঙ্গ 'তিতাস একটি নদীর নাম'

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। সৃষ্টির প্রথম থেকেই প্রাণীজগৎ এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। সে যুগে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল জলপথ। তার উদাহরণ আমরা পাই বিভিন্ন বইয়ের পাতাতে, তা ইতিহাস হোক, ভূগোল হোক বা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, নদী সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নদী যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সুখস্মৃতির সাক্ষী, ঠিক তেমনি নানারকম দুঃখের, হিংসার স্মৃতিও বহন করে চলেছে এই নদী। বিংশ শতাব্দীতে যখন একাধিক সাহিত্যিক চরিত্রের বিভিন্ন মনস্তত্ত্বের দিক, মধ্যবিত্ত জীবন ও সমাজ এইসব নানান বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন, তখন অন্য একদল সাহিত্যিক নদী ও নদী তীরবর্তী অন্ত্যেবাসী মানুষের কথাকে সাহিত্যে তুলে আনলেন, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। আসলে বাংলা সাহিত্যে নদীকে কেন্দ্র করে লেখালেখির শুরুটা অনেক আগে থেকে। কীভাবে একটা নদী সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে তা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন লেখালেখি দেখলেই বোঝা যাবে। বাংলা উপন্যাস জগতেও তার প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। এই উপন্যাসের কথা বলার আগে নদীকে কেন্দ্র করে লেখা কিছু উপন্যাস সম্পর্কে বলে নেওয়া খুবই জরুরী। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' এছাড়াও অসংখ্য রয়েছে। এখানে যে সকল নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের কথা বলা হলো তার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে একথাই উঠে আসে যে, এখানে নদী তীরবর্তী মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, আচার সংস্কার ও সংস্কৃতির কথাই মূলত প্রকট হয়ে উঠেছে। কোথাও মাঝি বা কাহার-দের, আবার কোথাও মাছমারাদের জীবন সংকটের কথা যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। নদীর সংকট যতটা না গুরুত্ব পেয়েছে, তার থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষের কথা। অদ্বৈত মল্লবর্মন রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম হয়নি, বরং এখানে নদী ও নদী তীরবর্তী মানুষ উভয়েই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কেননা উপন্যাসটি শুরু হয়েছে বাঁচার কথা দিয়ে। কিন্তু উপন্যাসটির শেষ হয়েছে ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে, তিতাসের জল শুকিয়ে গেছে। স্থানে স্থানে চর দেখা যাচ্ছে, মাছ নেই, ফলে ধীরে ধীরে সব কটি মালো পরিবার বিধ্বস্ত, অনেকে ভিক্ষাজীবী, অনেকের রোগজীর্ণ, কেউ মৃত্যুর অপেক্ষায় অথবা অনেকে মৃত। নতুবা অনেকে বাস্তুত্যাগ করে চলে গিয়েছে, শেষপর্যন্ত মালোপাড়া জনহীন। এইরকম এক করুণ জীবনের কথা উঠে এসেছে উপন্যাসের প্রতিটি পরতে পরতে।

উপন্যাসের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরাধীন ভারতের অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলার

ব্রাহ্মণবেড়িয়া থেকে প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী তিতাস নদীর পাড়ের গোকর্ণ গ্রামের এক অত্যন্ত দরিদ্র মল্ল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ আপন জন্মগত প্রতিভায় বিভিন্ন দিকে তার সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটে। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। নিজ দক্ষতায় স্কুল শিক্ষা শেষ করে কলেজে ভর্তি হলেও আর্থিক অনটনের জন্য তাঁকে অর্থ উপার্জনের পথে নামতে হয়, তাই উচ্চশিক্ষা তার জীবনে আর হয়ে ওঠে না। খুব অল্প বয়সে পরিবারের বোঝা মাথায় নিয়েও নিরন্তর সাহিত্যচর্চা করে যান। মাত্র ৩৭ বছরের জীবনে সাহিত্যের অঙ্গনে অসংখ্য সম্পদ রেখে যান।

লেখকের জীবনের শেষ সাহিত্যকীর্তি হল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, লেখক তাঁর জীবতাবস্থায় এই উপন্যাসের মুদ্রিত রূপ দেখে যেতে পারেননি। লেখকের মৃত্যুর ৫ বছর পর ১৯৫৬ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান সৃষ্টি। মূলত এর কাহিনির প্রেক্ষাপট হল লেখকের জন্মভূমি ও সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা। কিন্তু শীর্ণকায়া নদীতে শীতের শুরু থেকে জলাভাব দেখা দেয় আর প্রখর রৌদ্রে নদী সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় বলে, দারিদ্র্য এখানকার মানুষের চিরসাথী হয়েই থাকে। মাঝে মধ্যেই অন্নাভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়, এই চরম দারিদ্র্য মানুষকে করে তোলে রসহীন, তবুও তারই মাঝে বসন্তের আগমন তাদের মধ্যেও অবুঝ ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

উপন্যাসটির নামকরণ নদীকেন্দ্রিক হলেও এর কাহিনি শুধুমাত্র নদীর কথা নয়, নদীর তীরে বসবাসকারী এবং এই নদীর উপর নির্ভরশীল মালো নামের এক জনজাতির জীবনের দর্পণ। প্রতিটি লাইনে আছে সমাজের অনগ্রসর মানুষের জীবনের আর্থিক দূরবস্থার ঘন কালো মেঘ এবং জীবন সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী কাহিনি। যেহেতু লেখক ছিলেন এই জনগোষ্ঠীরই একজন এবং নিজেও লড়াই করেছিলেন তাদেরই মতো, তাই সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে কতটা কঠিন সংগ্রাম করে, আর্থিক সবল মানুষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের জীবনতরী বাইতে হয়। এখানে তথাকথিত রাজনীতির কূটকাচালি নেই, নাগরিক জীবনের স্পর্শ নেই, আছে শুধু নিম্নবর্গের মানব সমাজের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবন- জীবিকার সংগ্রামের কথা।

এইসব জনজাতিদের মধ্যে যেমন ছিল ধর্মগত ভিন্নতা, তেমনই ছিল জাতপাত ঘটিত, সামাজিক অবস্থানগত ভিন্নতা, তবুও সেখানে ছিল না কোনো ভেদাভেদ, ছিল না মনোমালিন্য। বরং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান ছিল সখ্যতার সম্পর্ক, প্রকৃত প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক এত মধুর ছিল যে সামাজিক ও ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে মনের গভীর গোপন কথা অকপটে বলতে পারত। শহুরে মানুষের মত ঘটা করে প্রেম নিবেদন করবার কৌশল এরা জানে না। এরা নিজেদের অজান্তেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে, একে অপরের জন্য চরম ত্যাগ করতে

পারে। যেমন—মাত্র একরাত্রের পরিচয়ে যেখানে তাদের ঠিক মত মুখ চেনাটাও হয়ে ওঠেনি, সেই অবস্থায় কিশোরের মত এক সুঠাম ছেলে, তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী, যে স্বামীর মুখ দেখা তো দূরের কথা তার নামটাও ঠিকমত জানে না, সেই স্ত্রীকে হারিয়ে জন্মের মতো পাগল হয়ে যায়। এই তিতাসের জলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে বাংলার বাউল সংগীত, কৃষ্ণকথার গান, নৌকায় মাছ ধরার গান আর তাতেই গড়ে উঠেছে তিতাসের আপন সংস্কৃতি। যদিও তাদের পরবর্তী জীবনে এক চরম ট্রাজেডি নেমে আসে।

উপন্যাসটিতে আমরা মোট চারটি খন্ড দেখতে পাই, এবং প্রতিটি সংখ্যা চিহ্নিত খন্ডে দুটি করে পর্ব বিভাগও রয়েছে। যেমন, প্রথম খন্ডের দুটি পর্বের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খন্ড', দ্বিতীয় খণ্ডের দুটি পর্ব 'নয়া বসত' ও 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ', তৃতীয় খন্ডে রয়েছে 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও' এবং চতুর্থ বা শেষ খন্ডে পাচ্ছি 'দুরঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান'। উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখবো তিতাসের, "...কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।"[১] ঠিক তার দশ মাইল দূরে অবস্থিত বিজয় নদীতে জল না থাকার কারণে, তার তীরে বসবাসকারী মানুষরা অত্যন্ত দিনহীনভাবে জীবন কাটাচ্ছে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে চাষ করার জন্য 'হাল' থাকায় তারা অন্য উপায়েও জীবনধারণ করতে সক্ষম, যে পদ্ধতি তিতাস তীরের মানুষদের অজানা। এইভাবে ঔপন্যাসিক যেন প্রথম থেকেই পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন বর্তমানের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাতে শুধুমাত্র একটি পেশার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। পরবর্তীতে তিতাসের বুকে চর জাগতে শুরু করে, একসময়কার ভরা যৌবনের তিতাস পরিণত হয় খালে। চর দখল করে চাষীরা সুখে থাকলেও মালো গোষ্ঠীর মানুষরা নিজ সমাজের ঐক্যশক্তির অভাবে পরিণত হয় বেতনভোগী শ্রমিকে। উপন্যাসের শুরুতে যেখানে আমরা দেখব রামকেশবের মেয়ে বাসন্তীর নিজের দাদা বা ভাই না থাকায়, তার মাঘমণ্ডল ব্রতর চৌয়ারি বানিয়ে দিচ্ছে তাদেরই প্রতিবেশী দুই ছেলে কিশোর ও সুবল। সুবলের বাবা মারা যাওয়ায় তাকে কিশোর তার নৌকায় কাজ করার সুযোগ করে দেয়। অর্থাৎ তাদের গ্রামের সকলের মধ্যেই এক সুস্থ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু 'নয়া বসত' পর্বে, যা কাহিনী শুরুর থেকে চার বছর পরের ঘটনা সেখানে অনন্তর মা অর্থাৎ কিশোরের সেই হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী যখন সেখানে ফিরে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে সেখানে মানুষরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। কয়েকটা ঘর নিয়ে এক একটা গোষ্ঠী তৈরি করেছে। এমনকি অনন্তর মা মারা যাওয়ার পর বাসন্তী অনন্তকে রাখতে চাইলে রামকেশব ও তার স্ত্রী খুবই অশান্তি করে। মালো গোষ্ঠীর একতা ধীরে ধীরে শেষ হতে থাকে। এইভাবেই মালোদের দূর্দশাময় জীবনের সূচনা ঘটে। শেষে গিয়ে দেখব, "....সে মালোপাড়া কেবল মাটিই আছে।... শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"[২]

লেখক হিসাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন মানব জীবনের বাস্তব রূপকার। নদী ও জীবন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে তাঁর লেখায়। নদীর জোয়ারের জলেই বেড়ে উঠেছে নদীর বুকে থাকা জলচর প্রাণী মাছ, আর তার পাড়ে বেড়ে উঠেছে মানব শিশু। যেন জলচর ও স্থলচর দুই-এরই মা হয়ে গেছে নদী। তাই জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে নদী। সুখ দুঃখের একমাত্র সঙ্গী। উপন্যাসের শুরুতে তিতাসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, "তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মত কুটিলতা নাই।"[৩] তিতাসের পাড়ে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের মানুষরাও ছিল তিতাসের মতই সহজ, সরল, তাদের মধ্যে কোন কুটিলতা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সেই পুরনো নদীও যেমন হারিয়ে গেছে ঠিক তেমনি মানুষগুলির মন থেকে সরলতাও হারিয়ে গেছে। সেই মানুষগুলির জীবন বিপন্ন হবার মূলে, যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় রয়েছে, তেমনই রয়েছে এক নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট। তিতাসের পাড়ে বাস করা মানুষ একদিন মাছ ধরাকেই একমাত্র পেশা করে বেঁচে থেকেছে, সময় পরিবর্তনের ফলে সেই অবস্থাও আর সচল থাকছে না। আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন শহর পার হয়ে তিতাসের বুকেও ঢেউ তুলেছে। ঔপন্যাসিক বুঝেছেন যে, এখানকার মানুষকে বাঁচতে হলে অতীতকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাতেও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন আনতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন মানুষের মনের সচেতনতা। গোষ্ঠী জীবনের অবলুপ্তির পিছনে যে অর্থনীতিই প্রধানত দায়ী একথা উপন্যাসের স্তরে স্তরে লেখক বলেছেন। তাই নব প্রজন্মকে বাঁচতে হলে তাকে তার ঘরে জাল ও হাল দুটোই রাখতে হবে, কারণ এক পেশার উপর নির্ভর করে বাঁচার দিন শেষ হয়েছে। সেই সূত্রটা দিতেই লেখক যেন অনন্ত চরিত্রটিকে তৈরি করেছেন। মালো সম্প্রদায়ের এতগুলো মানুষ যেখানে আজ তাদের জাতি, সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম, সবাই আজ মৃত, বাসন্তী আপ্রাণ চেষ্টা করেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, সেখানে তাদের একমাত্র উত্তরসূরী অনন্তকে ঔপন্যাসিক ফিরিয়ে এনেছেন। সে এখন একজন শিক্ষিত মানুষ, লড়াই করে বেঁচে থাকার মানে সে শিখেছে। লেখক অনন্ত সম্পর্কে বলেছেন, "আর সব ছেলেরা যখন চোখ বুজিয়া ঘুমায় অনন্ত তখন অজানাকে জানিবার জন্য আকাশের তারার মতই চোখ দুটি জাগাইয়া রাখিয়াছে।"[৪]

নদীতীরে বাস করা মানুষগুলির মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ জীবনপ্রবাহ দেখা যায়। একই ধরণের মন-মানসিকতা, স্বভাবচরিত্র, ঐতিহ্য সংস্কৃতির একটা ছাপ বংশ পরম্পরায় চলে আসে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিতাস তীরে বসবাসকারী মানুষগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়লেও, জাতিগত দিক থেকে আলাদা হলেও, তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি, ভাষা ব্যবহারের মিল রয়েছে। তিনি এখানে সাধারণত দু'ধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন, যথা উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করার সময় একধরণের ভাষা ব্যবহার করেছেন

এবং চরিত্রগুলোর মুখে বসিয়েছেন আর একধরনের ভাষা। মূলত এখানে তিনি বঙ্গালী ভাষার উপরেই বেশি নির্ভরশীল। লেখক মূলত মালোদের মুখে বসিয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। কিন্তু তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে যখন অনন্তকে লেখক তৈরি করছে, এবং সেই অনন্ত যখন শিক্ষিত হয়ে উঠছে, তখন সে আর সেই ভাষা ব্যবহার করছে না। এইভাবে মালো জাতির অস্তিত্ব সংকটের সাথে সাথে তাদের ব্যবহৃত ভাষাও আজ বিপন্নতার পথে।

উপন্যাসের শেষে একদিকে যেমন তিতাস নদীর অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে, অপরপ্রান্তে মালো সমাজের অস্তিত্বও সংকটের সম্মুখীন হয়ে উঠেছে। নদীর ওপর জেলে সমাজের অধিকার থাকায় স্বাভাবিক, কিন্তু যখন নদীর সংঘবদ্ধতা হারিয়ে যায়, অর্থাৎ নদীর জল কমে গিয়ে সেখানে চর দেখা দেয় তখন সেখানে চাষীরা অধিকার স্থাপন করে। ঠিক সেইভাবে মালো সমাজের মানুষ যতদিন একসাথে ছিল, ততদিন তারা সুখে ছিল, যখন থেকে তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকে তাদের রুজি রোজগার, অস্তিত্ব, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা সবকিছুই সংকটের মুখে। শেষে যেমন লেখক স্বপ্নের মধ্যে তিতাসের সেই পুরোনো উচ্ছ্বাস দেখতে পাচ্ছে, ঠিক বাসন্তীও যেন মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হতে অনন্তের মধ্যে দিয়ে তাদের জাতির পুনরাবিষ্কারের স্বপ্ন দেখছে। আর এভাবেই ঔপন্যাসিকের হাতে পড়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মালোজাতির এক বিপন্নতার দলিল।

আকরগ্রন্থ :

১. মল্লবর্মন অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-০৯, পৃঃ ১১
২. তদেব, পৃঃ ২৪০
৩. তদেব, পৃঃ ১১
৪. তদেব, পৃঃ ১৫৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯
২. রায় সত্যেন্দ্রনাথ, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ ৩. সরকার রাকেশ চন্দ্র সম্পাদনা, বাংলা উপন্যাসের বিশ্লেষণী পাঠ, বার্ণিক বইবিতান, ২ নং পাকমারা লেন, বর্ধমান- ৭১৩১০১
৪. মজুমদার পরেশচন্দ্র, বাংলা ভাষা পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং

পী যূ ষ বে রা

সত্তরের অনিমেষদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান : সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'

সাহিত্যে চরিত্র (character) গঠনগত দিক থেকে একটি অন্যতম মূল উপাদান। কিন্তু গঠন কৌশলের বাইরেও চরিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। বিশেষত চরিত্র যদি সময়ের অভিঘাতে সৃষ্টি হয় বা সময় যদি সেই চরিত্রকে নির্মাণ করে নেয় তাহলে সেই চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি বিরাট পর্ব-সময়কেও অনায়াসে ধরতে পারা যায়। চরিত্রের মধ্য দিয়েই সময়ের চালচিত্রকে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান-শিল্পে পরিণত করা যায়। তখন চরিত্র শুধুমাত্র ঘটনার ঘটক মাত্র হয়ে না থেকে একটি বিরাট সময়ের কথাও বর্ণনা করে থাকে। সমরেশ মজুমদারের অনিমেষ এমনই এক চরিত্র যার মধ্য দিয়ে বিশ শতকের ষাট-সত্তরের উত্তাল সময়ের নগ্নচিত্র উঠে আসে। সময় যেন অনিমেষকে তৈরি করে নিয়েছিল। অনিমেষ সময়কে ধরতে চেয়েছিল বিপ্লব এবং প্রেম দিয়ে।

বিশ শতকের ষাট-সত্তরে ঘটে যাওয়া নকশালবাড়ি রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল উপমহাদেশের সমাজ-জীবনে। অগ্নিস্রাবী সেই সময়ের রেখা ছড়িয়ে পড়েছিল সাহিত্য-অঙ্গনেও। বিপ্লবের এক এক কাণ্ডারী চারু মজুমদার, জগৎ সাঁওতাল, কানু সান্যালেরা উঠে এলো উপন্যাস-গল্প-নাটক-কবিতা ও গণসংগীতে। ইতিহাসের পথ বেয়ে এক চিরচিহ্ন রেখে গেল আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য-অঙ্গনে। মহাশ্বেতা দেবী, স্বর্ণ মিত্র, শংকর বসু, শৈবাল মিত্রেরা সেই কথা ধরে রাখলেন তাঁদের সাহিত্য-শিল্পে। সমরেশ মজুমদারকেও স্পর্শ করল নকশালবাড়ির ঘটনাবলী। তাঁর হাত ধরেই রচিত এবং উপমহাদেশে বহু পঠিত উপন্যাস 'কালবেলা' আজ সমানভাবে জনপ্রিয়; জনপ্রিয় তাঁর অমর সৃষ্টি অনিমেষও।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিমেষ মিত্র ওরফে অনি। কিন্তু কে এই অনিমেষ? কাকে দেখে লেখক নির্মাণ করলেন এই চরিত্রটি! লেখক তো সরাসরি আন্দোলনে অংশ নেননি বা ওই সময়টাকে লেখক ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন না—একথা তিনি নিজেই দাবী করেছেন। এই আন্দোলনের আঁচ তাঁর গায়ে না লাগলেও মনে লেগেছিল। লাগিয়েছিলেন শৈবাল মিত্রের মতো আগুনগ্রাসী বিপ্লবীরা। তাই প্রশ্ন জাগে, সমরেশের অনিমেষ আদতে কি বিপ্লবী-সাহিত্যিক শৈবাল মিত্রই? তিনি তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

"সেই সময় অনেক মেধাবী ছেলে নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে ভারতবর্ষে মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একদল ছিল পিছনে, যারা আন্দোলন সংগঠিত করত, অন্যদল অ্যাকশনে নামত। আমার সহপাঠী শৈবাল মিত্র প্রথম দলে ছিল। আজ স্বীকার করছি, 'কালবেলা'র অনিমেষের চরিত্রে শৈবালের কিছুটা ছায়া পড়েছিল।"[১]

সমরেশ মজুমদার আন্দোলনে সরাসরি অংশ না নিলেও শৈবালের সক্রিয় রাজনীতি

খুব কাছ থেকে দেখেছেন, হয়তো পারিবারিক আত্মীয়তার সুবাদে পরবর্তী সময়ে একটু বেশিই চিনেছেন। শৈবালের রাজনীতির মত ও পথ তাই অনিমেষের মধ্যে সেঁটে দিতে পেরেছেন অনায়াসে।

একজন শিল্পী-সাহিত্যিক জীবনভিত্তিক ক্রিটিক নির্মাণে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনকে সব্যসাচীমূলক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে আপন সৃষ্টির অনুসঙ্গ। কখনও আবার সাহিত্যিকের বহির্জীবনের ঘটনাবলী অন্তর্জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। লেখকের প্রত্যক্ষ করা চরিত্রেরা তাই ভিড় করে আসে তাঁদের লেখার মধ্যে। লেখক সমরেশ ছাত্র-জীবনে কলকাতায় পড়তে এসে একাধিক মেস এবং হোস্টেল পরিবর্তন করেছেন। স্কটিশ চার্চে পড়ার সময় বাবার বন্ধু অনিলবাবুর মেসে সাত দিন কাটিয়ে হোস্টেল টেমোরিতে এবং তারপরে হাতিবাগানের রেসিডেন্সি হোস্টেলে উঠেছিলেন। স্নাতকোত্তর পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়-হোস্টেলে কাটিয়েছেন দু'বছর। সমরেশ যখন প্রথম মেস যাপন করতে শুরু করেছেন, তখনই পরিচয় হয় শৈবাল মিত্রের সঙ্গে। অনিলবাবুর মেস থেকে প্রথম যে মেস বাড়িতে স্থান পেয়েছিলেন সেই মেসের বর্ডার ছিলেন শৈবাল মিত্র। শৈবাল মিত্র তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের নেতা। সমরেশ ছাত্র-জীবনে রাজনীতিকে দেখেছেন শৈবালের দৃষ্টিতে, মেসে থাকার সময়ে। শৈবাল মিত্র এবং রাজনীতিতে নিজের 'মনে আঁচ লাগা' প্রসঙ্গে সমরেশ জানিয়েছেন :

"আমার সমস্ত রাজনীতিটা দেখা কিন্তু ওকে (শৈবাল মিত্র) দিয়ে আমি ওদের সঙ্গে আছি আবার নেই।"[২]

ছাত্র জীবনের লেখক কখনও সক্রিয় রাজনীতি করেননি ঠিকই, তবে মনেপ্রাণে শৈবাল মিত্র সমর্থিত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। শৈবালের আদর্শকে দেখেই কংগ্রেসি মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

একজন ঔপন্যাসিক ব্যক্তি মানুষের জীবন থেকেই লেখার রসদ সংগ্রহ করেন। কখনও নিজের জীবন, কখনও চোখে দেখা অন্যান্য সাধারণ মানুষের জীবন দর্শন করে। লেখক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই নিজস্ব উপন্যাস-শিল্পের কাহিনি বুনে যান। সেই সঙ্গে লেখক যখন ব্যক্তি মানসে ডুব দিয়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তি-আমির যোগসূত্র খুঁজে পেতে চান তখন আশপাশের মানুষজন উঠে আসে সেই চালচিত্রের মধ্যে। সমরেশ, শৈবাল, অনিমেষ তিনটি জীবনরেখা একটি বিন্দুতে মিশেছে। তারপর উপন্যাসের শিল্পীত বিবরণে কাহিনি অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের অনিমেষ কলকাতায় এসেছিল উত্তরবঙ্গের আংরাভাসা নদীর তীরবর্তী স্বর্গছেড়ার সবুজ চা-বাগানে ঘেরা জায়গা থেকে। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষা নেওয়া। জায়গা হয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজে। কিন্তু স্কটিশে ঢোকার আগেই কলকাতায় পা রাখতেই প্রথম দিনে সময় তাকে জড়িয়ে নিয়েছিল। তৈরি

করে নিতে চেয়েছিল বিপ্লবের জন্য। ধীরে ধীরে ক্রমশ তার রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যাওয়া, বিপ্লবের মত ও পথ নিয়ে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংশয়, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা; বীরভূমের গ্রামগুলিতে কৃষক-শ্রমিকদের বিপ্লবের সাথে হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলা— সবকিছুর মধ্য দিয়ে অনিমেষের পরিচয় গড়ে ওঠে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। সশস্ত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে উত্তরবঙ্গের পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চার বছরের কারাজীবন সমাপ্ত করে পঙ্গুত্ব নিয়ে ফিরে এসেছে মাধবীলতার কাছে। নতুন সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে কাহিনির আপাত সমাপ্তি ঘটেছে।

সমরেশ-বন্ধু, বিপ্লবী-লেখক শৈবাল মিত্র কলকাতায় এসেছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বখরাহাট অঞ্চল থেকে চিকিৎসা এবং উচ্চশিক্ষার জন্য। সেইমতো মেট্রোপলিটন স্কুল হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েই, মৃত্যুচেতনাকে ভুলে থাকতে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সময়ের তালে সমাজের জন্য 'কিছু করতে' নিজেকে সাঁপে দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছুটে গিয়েছিলেন গ্রামেগঞ্জে কৃষি-বিপ্লবের দোসর হতে। পুলিশের অত্যাচার, অজ্ঞাতবাস, জেল জীবন শৈবাল মিত্রকেও তৈরি করে নিয়েছিল সত্তরের উপযোগী করে। সমরেশ খুব কাছ থেকে দেখেছেন বন্ধু শৈবালকে। তার বিপ্লবী সত্তা, আগুনঝরা জ্বলাময় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনেছেন সহপাঠী হয়ে। সমরেশ দেখেছেন শৈবালদের, আর শৈবাল ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের সিংহভাগে। যার সহযোদ্ধারা বিপ্লবের বারুদ মেখে আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। শৈবাল মিত্র সাহিত্যে নিজের কথা তপু (অজ্ঞাতবাস), অগ্নি (অগ্নির উপাখ্যান), কিশোর (অগ্রবাহিনী)-দের মাধ্যমে তুলে এনেছেন। সমরেশ এনেছেন অনিমেষ (কালবেলা), অর্ক (কালপুরুষ)-দের মধ্য দিয়ে। শৈবাল এবং শৈবালের তপু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কংগ্রেসি পরিবার থেকে উঠে এলেও ধীরে ধীরে জড়িয়ে গেছে মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে। সমরেশের অনিমেষ কংগ্রেসি পরিবার থেকে কলকাতায় এসে জড়িয়ে গেছে বামপন্থী রাজনীতির সাথে। লেখক সমরেশ স্বয়ং কংগ্রেসি মনো ভাবাপন্ন পরিবার থেকে এসে বামপন্থী মানসিকতায় উন্নীত হয়েছেন। এ বিষয়ে লেখক জানিয়েছেন,

"কলেজে যেতে না যেতে 'দাস ক্যাপিটাল' পড়ে ফেললাম এবং এর পরিণতিতে ছাত্র ফেডারেশন-এর সমর্থক না হয়ে কোনও উপায় ছিল না। ট্রাম বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিলে পা মেলাচ্ছি। চিৎকার করে বলছি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'"[৩]

অন্যদিকে শৈবাল-পত্নী সুদেষ্ণা মিত্রের ছায়া পড়েছে মাধবীলতার মধ্যে। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন সময়ে এবং শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে যেকোনোদিন শৈবালের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সুদেষ্ণা মিত্র যেভাবে শৈবাল মিত্রকে আগলে রেখেছিলেন, যেভাবে তাঁর শুশ্রূষা করেছেন তা মাধবীলতা চরিত্র নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে মাধবীলতাও অনিমেষকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন কোনো বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা ছাড়াই। উপন্যাসের অনিমেষ-মাধবীলতা এবং বাস্তবের শৈবাল-সুদেষ্ণা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু কেবল বিপ্লবী-সাহিত্যিক শৈবাল মিত্রই কি 'কালবেলা'র অনিমেষ! তাহলে বোধ হয় অনিমেষকে বড্ড সীমায়িত করে দেওয়া হবে। আসলে অনিমেষ সত্তরের ছাত্র-যুব-বিপ্লবীদের প্রতীক মাত্র। তাকে কোনো একজন বিপ্লবী সত্তায় সীমাবদ্ধ করা যায় না, সে সার্বজনীন। একটা সময় যে তরুণ প্রজন্ম ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' পাঠ করে নিজেকে তরুণ পাভেল ভাবতে শুরু করেছিল, সেই চেতনার উত্তরসূরী যুবকেরা সমরেশের 'কালবেলা' পড়ে নিজেদের অনিমেষ ভাবতে শুরু করেছিল। 'কালবেলা' তাদের নতুন দিগন্তে দাঁড় করিয়েছিল। 'সত্তরের অনিমেষ'দের তৈরি করে নিচ্ছিল সম-সময়। সমকালীন সময় থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছিল কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা। তাদের একজন হয়ে তাদের দুর্দশা মোচনে, 'সত্তর দশককে মুক্তির দশক' করতে চেয়ে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল 'সত্তরের অনিমেষ' তথা হাজার হাজার ছাত্র-যুব। অনিমেষদের হাত ধরেই শোষিত সম্প্রদায় স্বপ্ন দেখেছিল 'প্রকৃত স্বাধীনতা'র মধ্য দিয়ে অত্যাচারহীন, নিপীড়নহীন, শোষণহীন এক আপন স্বদেশভূমি গড়ে তোলার।

সমরেশ মজুমদার অনিমেষের মধ্য দিয়ে একটা আন্দোলন বা সমাজ-ইতিহাসের বাস্তবতাকে প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছেন 'কালবেলা'র মধ্য দিয়ে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস এবং সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসকে রাজনীতির আঙিনায় সফলভাবে আনতে পেরেছেন, বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া স্কুল-কলেজের ছাত্র-যুবদের সরাসরি আন্দোলনে অংশ নেবার মধ্য দিয়ে। তারা এমন একটি বিপ্লবী পথে অংশ নিয়েছিল যাদের মূল স্লোগানই ছিল মাও সে তুং-এর 'Political power grow out of the barrel of gun.' বা 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির এই দীক্ষা অনিমেষরা পেয়েছিল ব-কলমে চারু মজুমদারের কাছ থেকে। অনিমেষ রাজনীতির এই পাঠ যে পরিবেশ থেকে নিয়েছে সেই পরিবেশেরও একটা বিবরণী 'কালবেলা'তে উঠে এসেছে।

'কালবেলা' এমন এক উপন্যাস যেখানে প্রেম ও বিপ্লব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কাল-বেলা অর্থাৎ এক অশুভ সময়। এই অশুভ সময়েরই কথা নির্মাণ করেছেন সমরেশ মজুমদার। সেই অশুভ সময়কে শুধুমাত্র বিশ্লেষণই নয়, তার থেকে উত্তরণের আভাস তথা কাল-বেলা থেকে উত্তীর্ণ হবার কথা ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'উত্তরাধিকার'-এর শিশু অনি 'কালবেলা'য় যুবক অনিমেষ। সময় তখন ১৯৭০। বিপ্লবের অগ্নি উদ্গীরণের কাল। উত্তরবঙ্গের চা বাগানের স্নিগ্ধতার জায়গা থেকে কলকাতায় এসে জড়িয়ে পড়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অনিমেষ হয় নির্যাতিত। পুলিশের নিপীড়ন তাকে শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু মন তার বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে। সত্তরের প্রেক্ষাপটে অনিমেষের জীবনের চড়াই উৎরাই ঘিরে সমসময়ের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিত্রের একটি নিপুন রূপ উপন্যাসে উঠে এসেছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস হয়েই থেমে থাকেনি। বিপ্লবের সাথে মিশে গেছে এক অমর প্রেম কাহিনিও।

সত্তরের অনিমেষদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান : সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'

কলেজে ভর্তির জন্য জলপাইগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয় অনিমেষ। প্রথম শহরে পা রেখেই পুলিশের গুলি খেয়ে অনিমেষ জড়িয়ে পড়েছে পুলিশ-বিপ্লব-দেগে দেওয়া নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে। সময় তাকে জড়িয়ে নিচ্ছিল ক্রমশ। সত্তর দশক যেন অনিমেষকে ধীরে ধীরে তৈরি করে নিচ্ছিল। অনিমেষ কখনোই ভাবেনি সে রাজনীতিতে জড়াবে, অস্ত্র হাতে বিপ্লবের পথে হাঁটতে শুরু করবে। জলপাইগুড়ির মতো পাহাড়ি এলাকা থেকে আসা সহজ সরল অনিমেষ তখনও ধরতে পারেনি রাজনীতির ভেতরের বিষাক্ত নগ্ন রূপ। ধীরে ধীরে চোখের সামনে বিপ্লবী মত ও পথের বহু বিভক্ত রূপ দেখেছে। দেখেছে আদর্শের ভাগাভাগি। শুধুমাত্র ছাত্র-রাজনীতি দিয়ে যে সাধারণ জনগণের দুর্দশা মোচন করা যাবে না তা আগেভাগেই বুঝেছিল অনিমেষ। তাই শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র লড়াইয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। টার্গেটে পরিণত হয় পুলিশ, ছাত্র-ইউনিয়ন এমনকি নিজেরই দলের একাংশের।

বিপ্লবের আরেক নাম মাধবীলতা। ছাত্র আন্দোলনের সময়ে পরিচয় হলেও পরবর্তী বৃহৎ বিপ্লবে মাধবীলতা হয়ে ওঠে অনিমেষের নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়া। 'অনিমেষ যখন ছায়া চায় তখন ছায়া দেয়; কিন্তু যেই কুঁড়েমি করে তখনই রোদে পুড়িয়ে মারে।'[৪] মাধবীলতা রাজনীতি না করলেও অনিমেষের বিপ্লবী পথের একমাত্র শক্তি। অনিমেষের এগিয়ে চলার পথের অনুপ্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিল মাধবীলতা। মাধবীলতার জগৎ ছিল একমাত্র অনিমেষই। তাকে সম্পূর্ণভাবে পাবে না জেনেও জীবনের সবকিছু দিয়ে অনিমেষকে ভালোবেসেছিল। বিনিময়ে আশা করেনি কিছুই। এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কারণে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল মাধবীলতাকে। পুলিশের প্রচলিত ধারণার পথে মাধবীলতা বনে যায় একজন নকশাল নেতার স্ত্রী-তে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লালবাজার থানায় জেরা করার আছিলায় তুলে নিয়ে গিয়ে নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়। হয়তো তাকে বাস্তবের অর্চনা রক্ষিত, মীনাক্ষী, সুকরী বা সাহিত্যের পাতায় শৈবাল মিত্রের 'শবসাধনা'র ব্রততী, মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী'র দোপ্‌দী মেঝেন হতে হয়নি ঠিকই। কিন্তু নারী-লজ্জা আবরণের শেষ সীমায় ঠেকে ফিরে এসেছিল মাধবীলতা। তবুও অনিমেষকে জড়িয়েই বড় হয়েছিল মাধবীর স্বপ্ন। বিপ্লবের পথ থেকে কোনো কিছুই অনিমেষ-মাধবীলতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

সমরেশ মজুমদার একটি নির্দিষ্ট সময়কে শব্দের দ্বারা বন্দী করতে চেয়েছেন তাঁর 'কালবেলা' উপন্যাসটিতে। সেই শব্দ ব্যবচ্ছেদেই অনিমেষদের কথা সজীব ভাবে ধরা পড়েছে। 'কালবেলা'র পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সত্তরের বিপ্লবের ঘ্রাণ। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনায় স্পর্শ রেখেছেন সময়ের এবং সময়ের আগুনে সেঁকা মানুষজনদের। তবে বাস্তবকে হুবহু তুলে ধরেননি তিনি। বাস্তব ঘটনার চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক বৃত্তের ভাঙচুর অনিমেষের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। লেখক মনে করতেন সমাজতন্ত্র পরিবর্তন আনতে পারে, তবে তা রাতারাতি এক ধাক্কায় নয়। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের চেহারাকে

ধীরে ধীরে রূপ দিতে হবে। অনিমেষ, সুবাস সহ দলের অন্যান্যরা বহু ভুল করেছে, তার জন্য অনুশোচনার আগুনে দগ্ধও হয়েছে। কিন্তু তারপরেই নতুন স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে। লেখক বিশ্বাসভঙ্গের হতাশা কাটিয়ে নতুন বিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়াতে চাওয়া, আপাত অপরিতৃপ্ত জীবনের শরিক ভাঙাচোরা মানুষদের মধ্য থেকে সর্বত্রই এক মানবিক মুখকে উদ্ধার করে আনতে চেয়েছেন। উপন্যাসের আপাত সমাপ্তিতে তাই কাহিনির শেষ হলেও বিপ্লবের শেষ হয় না। অনিমেষ-মাধবীলতার উত্তরসূরীর মধ্য দিয়ে নতুন দিনের, নতুন বিপ্লবের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে।

'কালবেলা' উপন্যাসে অনিমেষকে অবলম্বন করে একটি ধারাবাহিক কাহিনি নির্মিত হয়েছে। ধীরে ধীরে অনিমেষের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা-বোধ। সেই সঙ্গে সমসাময়িক সময় উঠে এসেছে রাজনীতির পথ ধরে। কৃষি-বিপ্লবের পথে বিপ্লবের রূপরেখার প্রশ্নে দলের মধ্যে ভাঙন, হঠকারীদের বিতারণ, চীনের পথে ভারতের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা, জোতদার-মহাজন খতমের তত্ত্ব, অল ইন্ডিয়া রেভ্যুলেশনারি কমিটি গঠন, নকশালবাড়ির ঘটনা, গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ, ট্রাম পোড়ানো, খাদ্য আন্দোলন, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, পুলিশি নির্যাতনে আন্দোলনের ট্রাজিক ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শুভ মূল্যবোধগুলির বিনষ্টি একের পর এক ঘটনাগুলি উঠে এলো সমরেশের কলমে। মূল ঘটনা অনিমেষকে ঘিরে নির্মিত হলেও অনিমেষের এগিয়ে চলের পথে জাড়িত হয়েছে সুবাসদা, মহাদেবদা, সিরিল, বারীনদার মতো চরিত্রগুলি। সত্তরের চরিত্র অনুসন্ধানে উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির কার্যকলাপ সময় এবং সময়ের দ্বান্দ্বিক রূপটিকে সামনে আনে। সুবাসদার বিপ্লবের স্বপ্ন, আত্ম বলিদান; সিরিলের আত্মবিসর্জন; বিমান, সুদীপের সুবিধাবাদী রাজনীতি, মহাদেবদার বিপ্লবের জন্য প্রাণ বিসর্জন সত্তরের রাজনৈতিক পালাবদলের অগ্নিগর্ভ সময়টিকে চিনিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১। সমরেশ মজুমদার, শৈবালই ছিল অনিমেষ, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ২১ মে ২০১৭, পৃ.-২

২। মল্লিকা রায়, বাংলা উপন্যাসে নিঃসঙ্গ চরিত্রের সন্ধানে, প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-২০১৬, পৃ.-২১২

৩। সমরেশ মজুমদার, খোলাখুলি বলছি, পত্রভারতী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি- ঝীষ ২০১১, পৃ.-১০

৪। সমরেশ মজুমদার, কালবেলা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., দ্বাবিংশ মুদ্রণ, ১৪১১, পৃ.-১৭৬

প্র কা শ চন্দ্র ম ন্ড ল

সমরেশ মজুমদারের ছোটগল্পে রাজনৈতিক সংকট : নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে

ডুয়ার্সের গয়েরকাঁটা আংড়া ভাসা নদীর গন্ধ মেখে, চা বাগানের প্রান্তিক পরিবেশে, কুলি মজুরদের জীবনযাত্রাকে নিরীক্ষণ করে যে শিশুটি একদা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল, তিনিই সমরেশ মজুমদার, ডাকনাম বাবলু। শুধু বাল্য কৈশোরই নয়, কেটেছে তারুণ্যের খানিকটা অংশ চা বাগান ও তার সংলগ্ন পরিবেশে। এই শিশুটি যে একদা বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব দিক চিহ্ন রেখে যাবেন প্রথম অবস্থায় কেউ ভাবতে না পারলেও 'অন্য মাত্রা' নামক গল্পটি লেখার পর তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। লেখকের নিজের কথায়— সতীর্থদের মতো কিছু 'এপাশে ওপাশে' লিখেছিলেন, কিন্তু সে তেমন বলবার মত নয়। বড় পত্রিকায় নিজের জাত চিনিয়ে দেবার পর আর প্রয়োজনও হয়নি এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে — ছিটিয়ে লেখবার। স্বভাবে অস্থির চঞ্চল। তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তীতে আট বছরে তাঁর আরো ২৪টি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। কথাকার এই সাফল্যকে হাতিয়ার করে পাইকর বিভাগের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে লেখনীকে পেশা হিসেবেই বেছে নিলেন। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে। এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' ছাপা হয়েছিল 'দেশ' ১৯৭৫-এ সালে। ঠান্ডা মাথার স্রষ্টা কথার ভুবনে প্রতিটি রচনায় অনবদ্য অন্য সুরে অসাধারণ সৃষ্টি করেছেন। লেখক বন্ধু বিমল করের ভাষায়—

"সমরেশকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি—ছিপছিপে চেহারা গায়ের রং শ্যামলা গোছের, মাথায় লম্বা, কোঁকড়ানো, একরাশ চুল মাথায়, চঞ্চল চোখ, চাপা হাসি জড়ানো ঠোঁট—বেশ পুরুষালী চেহারা ছিল সমরেশের। সে একবার আমার লেখা একটা গল্পের নাটক করে অভিনয় করেছিল। সে নাটক আমি দেখিনি, শুনেছি সে হিরো হয়েছিল হিরো হবার মতনই তার মেজাজ। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় গল্প লেখার সূত্র ধরে।"[১]

এই ব্যতিক্রমী লেখকের গল্প ভুবনে বিভিন্ন চরিত্র, পরিবেশ দেখা মেলে যা একেবারেই অচেনা অজানা, অনবদ্য। এ বিষয়ে স্বয়ং লেখক এর মন্তব্য—"কোন কালেই যে চেনা ছিল না তাকে নিয়ে গল্প লেখার আগ্রহ তাঁর যথেষ্ট।"[২] বয়নে, কথনে ভাবনায় প্রত্যেকটি রচনায় 'স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে।'—"সমরেশ গল্পের কায়দা কানুন নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। তাঁর এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। সে বিশ্বাস করে, গল্পের আকর্ষণ গল্পের বিষয়বস্তুতে, পাঠ্যগুণে, চরিত্র চিত্রণে, পরিবেশ রচনায়। সমরেশের অধিকাংশ গল্পের মধ্যে এই সব গুণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কোন কোন গল্প স্বাদের দিক থেকেও চমৎকার।"[৩]

একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নব দিগন্তের বার্তাবাহী সংলাপ আশা—আলোর আঁধারিতে তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁকে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে

এনে দেয়। সমরেশের শৈশব থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত গ্রাম—শহরের মেলবন্ধন তাঁকে মনের মধ্য লালিত করা— তা কথন বিশ্বে ছায়া ফেলেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গকে এক প্রান্তরেখায় মিলিয়ে দিতে পেরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সমান দক্ষ জীবনের ছবি আঁকতে— "উত্তরবঙ্গের চা বাগানের নিঃসীম দারিদ্র্যে ঘেরা কুলি কামিনের জীবন থেকে বিলাসী ম্যানেজার—মালিকের দুধ-সাদা পিকিনিডা নিয়ে আহ্লাদেপনা, ডুয়ার্সের বুনো জানোয়ারদের গুঁড়িমারা শুঁড়িপথ থেকে পোচারদের আইনকে কলা দেখানো গলি-খুঁজি, করলা নদীর ঝাঁপাই ঝাঁপাই থেকে খুঁটিমারি রেঞ্জের ঘন নিকষ অরণ্যরেখা, মেয়ে চোরাচালানকারী কারি থেকে চোখ ধাঁধানো পণ্য স্মাগলিংয়ের রমরমা কারবার মাঝে কোন কল্পিত ফুটকি কিংবা বিন্দু নেই।"[৪] আখ্যানের কারুকৃতিতে ভালো গল্পের খোঁজ দেওয়াতে, জীবনকে ছুঁয়ে দেখতে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার।—"সবচেয়ে বড় কথা সমরেশ ভাবি সময়ের দেওয়াল লিখন আগেভাগেই পড়তে জানেন।"[৫]

যুগের উত্তাল প্রবাহ—তার ভাঙ্গা গড়া, রাজনৈতিক উত্থান পতন, লেখক গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙ্গা গড়া, রাষ্ট্রপতি শাসন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত বিভাজন, পার্টির মধ্যে হানাহানি, গোপন হত্যা, চক্রান্ত, ক্ষমতা দখলের লড়াই নিয়ে রচিত হয়েছে 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'।

প্রায় ঊনিশ বছরের রাজনৈতিক সহকর্মী, একসঙ্গে পথচলা নবেন্দু আর জগদীশের। কিভাবে বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে অতি বামপন্থায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ল জগদীশ, এবং কুড়ি বছর পর পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিল তাকে নিয়েই তৈরি হয়েছে এই গল্পটি। নবেন্দু এবং ললিতার সুখের সংসার। নবেন্দু এবং ললিতার মধ্যে দীর্ঘদিনের পথচলা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। তাদের মধ্য কোনো ভুল বোঝা-বুঝির জায়গা নেই। বাইশ বছর তাদের বিবাহিত জীবন একসঙ্গে কেটেছে। বাইশ বছর ধরে তারা একই রাজনীতির অংশীদার। "পার্টি যখন দু'ভাগ হলো তখনও একসঙ্গে, পার্টি থেকে যখন অনেকেই বেরিয়ে গেল তখনো পার্টির সঙ্গে। একসঙ্গে আন্দোলন করেছে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছে।—আন্ডার গ্রাউন্ডে লুকিয়ে লুকিয়ে মার্কস সাহেবের কাছে শিক্ষিত হয়েছিল। তার রক্তে আমরণ একই অনুগত্য, ললিতা পরে যার সঙ্গী হয়েছে। একই আঞ্চলিক কমিটিতে কাজ করতে করতে দিন কেটেছে ওদের।"[৬] হঠাৎ করে লোকাল কমিটির সম্পাদক ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় নতুন সম্পাদক বেছে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ললিতা বাড়িতে এসে তার স্বামীকে জানায়—

"ওরা সবাই আমাকে চাইছে, তোমাকেও কেউ কেউ, কি করা যায় বুঝতে পারছি না।"[৭]

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যখন পারিবারিক চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে তখন দীর্ঘ বিবাহিত

জীবনের মধ্যেই মধ্যেও যে তরঙ্গ বিক্ষোভ ওঠে তার ঢেউ বীভৎস ভাবে দাঁত মুখ বের করে তার জায়গা চিনিয়ে দেয়। এমত অবস্থায় নবেন্দু জানায় তুমি যদি চাও আমি সরে দাঁড়াতে পারি। প্রত্যুত্তরে ললিতা জানাই—"খবরদার না। তাহলে যাদববাবু বলে বেড়াবে বউয়ের মুখ চেয়ে তুমি কেটে পড়লে। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু সেটা বাইরে, ঘরে আমাদের সম্পর্কে যেন চিড় না ধরে।" ললিতার চুলে হাত বুলিয়ে নবেন্দু বলেছিল,"তার চেয়ে এক কাজ করো। ভোট চাওয়ার জন্য আমরা এ ওকে আক্রমণ করব না, নিন্দা করব না। বেশ তাই হোক। কোনরকম ক্যাম্পেন ছাড়াই আমরা কনটেস্ট করব।"[৮] কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাকে পাওয়ার লড়াই সে তো অন্য কথা বলে। ইতিমধ্যে ঘটে যায় এক অঘটন। এক বর্ষণমুখর রাতে তাদের দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। তারা পরস্পর ভাবতে থাকে এত রাতে ভরা বর্ষণে কে এলো তাদের দরজায়। "ললিতা দরজা খুলে দেখে এক অচেনা বয়স্ক ভদ্রলোক, ভদ্রলোক তাকে জানায় সে (নবেন্দুর) স্বামীর বন্ধুর আত্মীয়। এগিয়ে যায় নবেন্দু।" কাঁপা আলোয় কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধকে দেখতে পেল সে। সম্পূর্ণ ভিজে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। কাঁধে একটা ব্যাগ রয়েছে পলিথিনের। হাতে একটা ছেঁড়া ছাতা। বুক অব্দি সাদা দাড়ি, আর মাথায় চুল উঠে গেছে অর্ধেকটা। দুই চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

"নব্যেন্দু-! গলার স্বর কাঁপলো।

আমি, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। কার আত্মীয় আপনি?

নব্যেন্দু ,আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ভাই?"

তৎক্ষণাৎ সমস্ত শরীরে কাঁপন লাগল। হঠাৎ দারুণ শীত করতে লাগলো নব্যেন্দুর। ওই 'ভাই' শব্দটার উচ্চারণ তাকে এক টানে নিয়ে গেল আটচল্লিশ সালে, তারপর নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে সাতষট্টিতে যখন এরা বেরিয়ে গেলেন দল ছেড়ে। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে এঁর।—কিন্তু এই মানুষটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। কোনরকম সাহচর্য বেআইনি, সাহায্য নিষিদ্ধ। পার্টি একবার তাকে নির্দিষ্ট কারণে বহিষ্কার করেছে, তার কি প্রয়োজন এখানে এত রাতে? জগদীশ জানায় সে তিন দিন অভুক্ত, সে কাতরভাবে প্রার্থনা জানায় একটি রাত তাকে আশ্রয় দেবার জন্য। নবেন্দু ভাবতে থাকে এটা হবে দল বিরোধী কাজ। সে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। সে কিভাবে তাকে আশ্রয় দেবে। নবেন্দু মাথা নাড়িয়ে অস্বীকার করে। পরক্ষণেই আমরা জগদীশের মুখ থেকে শুনতে পাই—"দেবে না? নব্যেন্দু আমি তোমার কাছে ভীষণ আশা নিয়ে এসেছিলাম। এই বৃষ্টিতে বাইরে থাকলে আমি বাঁচবো না। কত রাত ভালো করে ঘুমুইনি। উপোষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজলে এই বয়সে শরীরটা মানাতে পারে না।"[৯]

পরস্পরের কথোপকথনে আমরা জানতে পারি জগদীশের হাত ধরেই নবেন্দুর মার্কসবাদে দীক্ষা নেওয়া। জগদীশ আরো জানায় ভোরবেলা সে বেরিয়ে পড়বে কেউ জানতে পারবে না। অবশেষে নবেন্দু রাজি হয়। নবেন্দুর অনেক কথা মনে পড়ে যায়, ভাবতে থাকে বিগত

দিনের সেই একসঙ্গে লড়াই আন্দোলনের কথা। আটচল্লিশ থেকে বাষট্টি একসঙ্গে কাজ করে যাওয়া, বাষট্টি থেকে হঠাৎ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষটির আজ আশ্রয় নেই—খাবার নেই—সামান্য স্বস্তির জায়গা নেই। কী লাভ হল ওর দল ছেড়ে? অথচ কর্মী এবং সংগঠক হিসাবে জগদীশদার তুলনা ছিল না। সে রাতে নব্যেন্দু আর ঘুমাতে পারে না। বেডরুমে নবেন্দু দেখে ললিতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে ভাবে ললিতা অদ্ভুত স্নেহশীলা মহিলা। তা না হলে সে জগদীশকে শুকনো কাপড়; খাবার দিতে অস্বীকার করলেও ললিতা খাবার এবং তাকে শুকনো কাপড় দিয়ে সাহায্য করেছে।

হঠাৎ করে দু'দিন বাদে একটা জরুরী মিটিং-এর সমন পেয়ে চমক লাগে নব্যেন্দুর। কেন্দ্রীয় নেতা আসছে আগামী নির্বাচন এবং দলীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। প্রত্যেক দায়িত্বশীল সদস্যকে সেদিন উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। মিটিং শুরু হলে কয়েকটা এজেন্ডার পর হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় নেতা বলে ওঠেন—"আগে একটি নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আমাদের একজন কমরেড যার ওপর পার্টি আস্থা রেখেছিল তিনি দল-বিরোধী কাজ করছেন, আমরা তার কাছে জানতে চাইব তিনি কি করে পার্টি থেকে বিতাড়িত জগদীশবাবুকে রাত্রে নিজের বাড়িতে আশ্রয় এবং খাবার দেন।"[১০] কেন্দ্রীয় নেতা এবার সরাসরি নবেন্দুকে এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে চান। কেন্দ্রীয় নেতা তাকে আরো বলে—আপনি এরপরে তাকে রাতে থাকতে দিয়েছিলেন। খাবার দিয়েছিলেন, নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দিয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা কথা বলে। নবেন্দু সবটাই বুঝতে পারে খাবার, জামাকাপড় দেওয়া তার স্ত্রীর অনুরোধেই সেটা করেছিল। সবটা বুঝেও সে চুপ করে থাকে। সে আসল সত্যিটা বলতেই পারতো কেন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এক রাত্রের জন্য। "কেন্দ্রীয় নেতা প্রশ্ন করলেন, আপনি আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন কেন? ললিতার গলা কাঁপলো না, আমি আমার পার্টির প্রতি অনুরক্ত। মার্কসীয় জীবন দর্শন-এ বিশ্বাসী। আমার স্বামী যদি সেই বিশ্বাসে অংশীদার না হতে পারে সেটা অন্য কথা, কিন্তু পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয় এমন কাজ করায় তিনি আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন।" নবেন্দু সবটাই বুঝতে পারল। সে আরও ভাবতে থাকে কী লাভ উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই যদি প্রাপ্তি হয় তাহলে তাকে দলবিরোধী তকমা দিলেও তার আর কিছু যায় আসে না। পার্টির কথা ছেড়ে দিলাম, ললিতার সঙ্গে এতকালের সম্পর্ক অথচ সেও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি একবার। কিন্তু দলের কাছে গোপন রিপোর্ট পাঠাতে দেরি করেনি। নবেন্দু ভাবতে থাকে—"এত বছর একসঙ্গে বাস করেও যদি এতটা ফারাক হয়ে যায় দুটো মানুষের মধ্যে তাহলে অনেক কাল একটি পার্টির জন্য যৌবন এবং শ্রম দান করেও এই ব্যবহার পাওয়া স্বাভাবিক।"[১১] নবেন্দু আরো ভাবে, ললিতা যা বলেছে তা মিথ্যা প্রমাণ করতে সে যদি তৎপর হয় তাহলে ওই বেচারা মুশকিলে পড়বে কী দরকার।—পার্টির আনুগত্যের প্রতি নীতিকথা অন্তরালে মানবিকতার-আধার হয়ে ওঠে নবেন্দু। ললিতার এই ক্ষমতা

লোভের বিশ্বাসঘাতকতাকে সে মাফ করে দেয়। এভাবেই একটা বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক পটভূমিকে সমরেশ মজুমদার গল্পের পটভূমিতে তুলে নিয়ে আসেন অসাধারণ নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে। যা প্রকারান্তরে যুগের দলিলে পর্যবসিত হয়।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আবহে বেড়ে ওঠা পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'আঁতাত' নামক গল্পটিতে। অবিনাশ কর্মচারীদের নেতা, সে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। গোপা কলেজের অধ্যাপিকা, সহধর্মিনী। গোপার ভাবনা-চিন্তা কথাবার্তার মধ্যে অবিনাশ খুঁজে পাহ 'বুর্জোয়া মেন্টালিটি'। "অবিনাশের মনে হলো সামনে গোপা নয়, ওদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দাঁড়িয়ে। অবশ্য গোপার পক্ষে এরকম আচরণ খুব স্বাভাবিক। ওদের কলেজে এখনো দক্ষিণপন্থী ছাত্রী ইউনিয়ন রয়েছে। আর গোপা তাদের অন্যতম পরামর্শদাতা।"[১২] তাদের বাড়ির কাজের মাসি কালোর মা বছর পাঁচেক আগে এসেছিল, তখন তার মাইনে ছিল তিরিশ টাকা, পাঁচ বছর পরেও সেই একই আছে। এটা অবিনাশ এর কাছে বুর্জোয়া মেন্টালিটির মানসিকতা বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা কাজের মাসিকে নিয়ন্ত্রণ করে গোপা। এদিকে কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কর্মচারীদের মনোমালিন্য শুরু হয়েছে। কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার থেকে—"কোন কর্মী বা তার নিকট-আত্মীয় অসুস্থ হয়ে পড়লে তার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয় কোম্পানি বহন করত। শুধু ডাক্তারের সার্টিফিকেট আর দোকানের ক্যাশ মোমো দাখিল করলেই হতো। কিন্তু এবার কোম্পানি নিয়ম করেছে যে কোন ডাক্তার বা দোকান থেকে চিকিৎসা বা ওষুধপত্র কিনলে চলবে না। কোম্পানির নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে।"[১৩] —এটা নিয়েই কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে তীব্র মতানৈক্য চলছে। রাত দুপুরে কারোর যদি অসুখ করে সে আশেপাশে কোন ডাক্তারকে দেখালে সেই টাকা কোম্পানি ফেরত দেবে না। এটা কর্মচারীদের নেতা হিসাবে অবিনাশ কোনমতেই মানতে পারবে না।

কালোর মা ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেলে গোপা কাজের লোক হিসাবে একজনকে পেয়ে যায়। তাকে জুটিয়ে দিয়েছে ছবি বলে একজন। মেয়েটির নাম আশা, সে আগে রায় বাড়িতে কাজ করতো। তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র একটা কাচের গ্লাস ভাঙার অপরাধে। কিন্তু কালক্রমে জানা গেল তার চরিত্র ভালো নয়, সে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। অতঃপর অবিনাশের বাড়ি থেকেও তাকে বিতাড়িত হতে হলো। একদিকে কাজের সংকট এবং তারই সুযোগ নিয়ে বড় মানুষদের যৌনবিলাস এই গল্পে সামাজিক ব্যাধিটিকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। শত শত কর্মচারীদের অধিকার নিয়ে লড়াই করা অবিনাশ এই মেয়েটিকে কোনও আলোর দিশা দেখাতে পারে না। তাকে বড্ড অসহায় লাগে—"কি করা যায় অবিনাশ বুঝতে পারছে না। মেয়েটা যদি যেতে না চায়, সে মেরে ধরে কি বের করে দেবে? আবার এখানে রাখা একদম অসম্ভব।"[১৪] অবশ্য শেষ পর্যন্ত আশা নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কাউকে কিছু না বলে। ইতিমধ্যে আর একটা জটিল সমস্যার

সূত্রপাত হয়। অবিনাশেরা এতদিন ভাবছিল তাদের দাবিদাওয়া পুরণ না হলে দর-কষাকষির চরম সীমাই ধর্মঘটে যেতে হতে পারে। কোম্পানি এখন চাইছে কর্মচারী সংগঠন ধর্মঘটে যাক। ইউনিয়নের দু'জন নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করল কর্তৃপক্ষ, অবিনাশ তাদেরই মধ্যে একজন। ওদের কাছে প্রস্তাব এলো মেডিকেল ইস্যুটা নিয়ে ইউনিয়ন যদি ধর্মঘটের ডাক দেয় তাহলে কর্তৃপক্ষ সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।। কারণ সরকারের কাছে এক কোটি টাকার দেওয়া অর্ডার কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ে দিতে পারছে না। ক্ষতিপূরণ দিতে হলে যে ক্ষতি হবে, তা সামলানো সম্ভব নয়। একমাত্র কর্মী—ধর্মঘট হলেই কোম্পানির কোন দায়িত্ব থাকছে না। ইউনিয়ন যদি মাস তিনেকের জন্য ধর্মঘট করে তাহলে পরবর্তীকালে সব দাবি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। অতএব দোনা-মোনা না করে ইউনিয়ন যেন অবিলম্বে ধর্মঘটের ডাক দেয়। "অবশেষে অবিনাশ ও তার বন্ধুরা স্থির করল ধর্মঘট না করলে যখন কোম্পানি উঠে যাবে তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।"[১৫] —এভাবেই দীর্ঘদিনের লালিত রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে বাতিল করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এই সংকট ও তার উত্তরণ কিভাবে সম্ভব অবিনাশের তা জানা নেই।

কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে যে বহুদিনের লড়াই, সংগ্রাম, নীতিগত আদর্শকে সামনে রেখে চিরন্তন সতত সংগ্রামে পথে থাকতে হয়, এ সত্য আমরা সবাই অনুধাবন করতে পারি। তখন সরকারপক্ষের সামান্য ত্রুটি, বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণী রুদ্ধ করতে হয়, জনগণকে স্বপক্ষে আনতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি যখন পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন সেই নীতিগত আদর্শ কচকচানি আর থাকে না। তখন পেশী-শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয়। নীতিকথা তখন থেকে যায় পুঁথির পাতায়। এইরূপ একটি রাজনৈতিক আবহে রচিত গল্প হল 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'। একটি জেলার পার্টির কর্ণধার অবনীমোহন পেশায় স্কুল শিক্ষক। "সারা জীবন মাস্টারি করেছেন অবনীমোহন। জেলে গিয়েছেন অনেকবার। এখন তিনি সরকারিভাবে এই জেলার পার্টির সভাপতি। তিনি থাকায় দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রম এসেছে। অথচ অবনীমোহন এর জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। আজ যারা মন্ত্রী তাদের অনেকেই ওর পরে দলে এসেছেন।"[১৬] বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবনীমোহন বুঝতে পারেন তার নীতি আদর্শ থেকে তিনি না সরলেও এখন পার্টি অনেক বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সুযোগ সন্ধানী পেশিশক্তি অপরাধকে মান্যতা দিচ্ছে; যা তার নীতিগত আদর্শের সঙ্গে কোনমতেই মেলেনা। পার্টির মহিলা নেত্রী অধ্যাপিকা সতী দত্ত-র ভাই বাড়িতে শুলতা নামে একটি মেয়েকে রেপ করলে সে সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে। এই বিষয়টাকে অবনীমোহন কোনমতেই মেনে নিতে পারে না। এই ঘটনা নিয়ে সে ক্ষোভ প্রকাশ করলে এমপি বাসব বলে—"মেয়েটি ইতিমধ্যে পাঁচ মাসের প্রেগন্যান্ট। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। সতীদির ভাই কলেজে পড়ে, ওকে

আমরা বাধ্য করতে পারি না একটা মেইড সার্ভেন্টকে বিয়ে করতে।" দুটো লোক, একটা ফ্যামিলির জীবন তাতে নষ্ট হয়ে যাবে—

'কিন্তু একটা ছেলে এত বড় অন্যায় করে শাস্তি পাবে না?'

"আপনি বুঝতে পারছেন না। শাস্তি দিতে গেলে পুলিশ কেস করাতে হয় সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের দলের একজন নেত্রীর ভাই এই করেছে। এখন এমন প্রচার আমরা করতে দিতে পারি না।—আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।"[১৭] এই পরিস্থিতি কোনমতেই অবনীমোহন মেনে নিতে পারে না তাই তার খেদোক্তি—"এখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না। নিজের সঙ্গে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়।"

অবনীমোহন মেনে নিতে পারে না যে হাসপাতালে আন্দোলনের নামে চরম বিশৃঙ্খলা। সে মানতে পারে না চা-বাগান অঞ্চলে দলের ছেলেদের পার্টির চাঁদার রশিদ বই বিলিয়ে দিয়ে কোনো হিসেব না চাওয়া। তার উপলব্ধি—আমরা ক্রমশ বুর্জোয়া ড্রেসিংরুমের শিকার হয়ে যাচ্ছি। বাসব তাকে বোঝায় এখন নির্বাচনে জিততে গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়, বিশাল মেশিনারি লাগে, বুর্জোয়াদের সমর্থনে যে দল লড়ছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যেতে হয়। অন্তত অর্থ বলে এবং লোক বলে। পোড়খাওয়া অবনীমোহন বুঝতে পারে পার্টির জনগণের ভিত আলগা হচ্ছে। ধিকি ধিকি চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠছে। "পার্টি ফান্ডে হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পারার অপরাধে এক সম্পূর্ণ কৃষিজীবী পরিবারের চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ তার জমিতে চাষ করতে যেতে পারবে না। যারা চাষ করত তাদের দিয়ে বেশি মজুরি দাবি করানো হলো। পরিবারটি এক বছর চাষ বন্ধ রাখল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় বাধ্য হল হাজার টাকা চাঁদা দিতে। এই বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর বুকে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন গ্রামের শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি অত টাকা চাঁদা আদায় করতে অথচ তারা করছে।"[১৮] তাই অবনীমোহন উপলব্ধি করতে পারে—এই আধা ফ্যাসিস্ট ক্রিয়া-কলাপ বেশি দিন চলতে পারে না।

এরই মাঝে হঠাৎ করে একদিন অবনীমোহনের বাড়ির সামনে একটা অচেনা অজানা লোক এসে দাঁড়ায়। সে কলকাতার ক্ষমতাশালী মন্ত্রী সত্য দত্তের চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠি পড়ে সে জানতে পারে এই ছেলেটি পার্টির একজন। তার নামে অনেক ক্রিমিনাল কেস হয়েছে। তাকে এক মাসের জন্য আশ্রয় দিতে হবে। অবনীমোহন জানতে চাইলো কেন তার নামে এফ আই আর হয়েছে? অকপট নির্লজ্জ ভঙ্গিতে সে জানায়—

"ওই যে তখন বললাম অ্যাকশন করেছিলাম, নিচু গলায় বলল বলাই।

কিরকম অ্যাকশন?

অনেকগুলো।

যেমন?

ইলেকশনের সময় বুথ জ্যাম করতে বলা হয়েছিল। দলের লোকজন পারছিল না। তখন বোমা নিয়ে রিভলবার নিয়ে নামলাম। সব ভোটার হাওয়া হয়ে গেল। বুথে ঢুকে কাজ শেষ করে চলে এলাম। কোন ঝামেলা হয়নি।"

"এ ছাড়া? চোয়াল আবার শক্ত হলো অবনীমোহনের। মাসখানেক আগে আমাদের পাশের পাড়ার কয়েকজন খুব গোলমাল পাকাচ্ছিল কাটা পাঁচুর নাম শুনেছেন?—চোলাই, মেয়েছেলে সবরকম ব্যবসা করত। একদিন অ্যাকশন করলাম কাটা পাঁচুর প্রেমিকাকে ধরে রেপ করলাম। ব্যাস সব ঠান্ডা, পুরো বস্তি এখন আমাদের দলে কাটা পাঁচু ভোগে।"[১৯] প্রত্যুত্তরে অবনীমোহন জানতে চায় সত্য এসব জানে, উত্তর সে জানাই গুরুর পারমিশন ছাড়া কোন কাজ করি না। এ কথা জানার পর অবনীমোহন নিজের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকল নিজেকে। এই লোককে তাকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে।—"অবনীমোহনের বমি পাচ্ছিলো। বলাই-এর পাশে বসতে তার ঘেন্না হচ্ছিল। সত্য কাকে পাঠিয়েছে তার কাছে? একি তাদের ক্যাডার? সত্যর ক্যাডার? ক্যাডার মানে শিক্ষিত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাহলে?।"[২০] এ প্রশ্নের উত্তর অবনীমোহন হাতড়াতে থাকে।

আজ অবনীমোহনের মনে হচ্ছে আমরা রাজনীতিতে এসেছিলাম জনসাধারণের পাশে বন্ধু হিসাবে দাঁড়াতে, সেটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। সেখান থেকে আজকের রাজনীতি বহু দূরে সরে গেছে। রাজনীতির এই অবমূল্যায়ন অবনীমোহনের বুকে আঘাত হানে। সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। সে এবার চিঠি লিখতে বসে—

"শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত, প্রীতিভাজনেষু,—তোমার চিঠি নিয়ে বলাই আমার কাছে এসেছিল। —কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি কয়েক কোটি মানুষকে বাগে আনতে আমরা কিছু পেশীশক্তির উপর নির্ভর করছি। আজ যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছো সে জনগণের শত্রু। অথচ তার উপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। যতদিন তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কথা শুনবে। যেদিন প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা যাবে সেদিন সে দল বদল করে তোমার আমার স্ত্রী কন্যাদের ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।"[২১]

চিঠিতে আরও উল্লেখ করে—এখনই এই সমাজ-বিরোধীদের উৎখাত করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে বলে যাতে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা ঘোষণা করে পার্টির শুভবুদ্ধির সন্ধান দেওয়া যায়। এই রাজনৈতিক সংকট পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ অবনীমোহন বুঝতে পারে, আগামী দিন পার্টির জন্য কী হতে চলেছে। এই সংকট ও তার সমাধানের পথ বাতলে দেবার গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি শেষ পর্যন্ত টেবিলেই পড়ে থাকে। চিঠি লিখে বাথরুমে প্রবেশ করলে মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান, চিৎকার চেঁচামেচিতে এ্যাম্বুলেন্স এলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবনীমোহন চেষ্টা করলেন কথা বলতেন—"কথা বের হলো না ঠোঁট থেকে। এক হাত অসাড়। অন্য হাতে তিনি যেন এক

দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের ঠিকানা আঁকলেন।"[২২] এভাবেই রাজনৈতিক সংকটের এক অসামান্য দলিল এ গল্পে আঁকা হয়ে যায় সমরেশ মজুমদারের হাতে।

তথ্যসূত্র :

১. আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা, বিমল কর, পত্রভারতী, প্রথম কে জি বি প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা-১৪০।
২. তদেব, পৃ-১৪৪
৩. তদেব, পৃ -১৪৪
৪. 'এবং মুশায়েরা, শারদীয় ১৪১৮, গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা, উদয়চাঁদ দাস ,পৃ-৯১
৫. তদেব, পৃ-৯৩
৬. গল্প সমগ্র, সমরেশ মজুমদার,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,প্রথম খন্ড,প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০০, পৃ-২০৫
৭. তদেব, পৃ- ২০৫
৮. তদেব, পৃ-২০৬
৯. তদেব, পৃ-০৮
১০. তদেব, পৃ -২১০
১১. তদেব, পৃ-২১২
১২. তদেব, পৃ-২২০
১৩. তদেব, পৃ-২১৯
১৪. তদেব, পৃ-২২৯
১৫. তদেব, পৃ- ২৩০-২৩১
১৬. তদেব, পৃ-৪০
১৭. তদেব, পৃ- ৩৯-৪০
১৮. তদেব, পৃ-৪৩
১৯. তদেব, পৃ-৪৮-৪৯
২০. তদেব, পৃ-৪৯
২১. তদেব, পৃ-৫০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাংলা ছোট গল্পের রূপরেখা ১৮৮৪-২০১৬, ড. অশোক কুমার মিশ্র, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭
২. কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোট গল্পের একশ 'বিশ বছর/১৮৯১-২০১০, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রন, আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর, ২০১৬
৩. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, ষষ্ঠ খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট, ২০১২

পি ন্টু দা স মো দ ক

সুমথনাথ ঘোষের নির্বাচিত ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সংকট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — "প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং জয়লাভ, নিষ্ঠুর ও জান্তব প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং উপকরণ; সাহস ও বুদ্ধির সহযোগিতায় অন্যান্য বিরোধী গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কাহিনি। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত তরুণদের শিক্ষাদান—জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলবার মূল্যবান উপদেশ, দ্বিতীয়ত আনন্দের পরিবেশণ। জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের আবির্ভাব"[১]। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতি' (১৮৭৪)-র হাত ধরে যে ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বনস্পতির রূপদান করেছিলেন বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সেই ছোটগল্প রূপী বনস্পতি বর্তমানে অরণ্যানী রূপ ধারণ করেছে। অবশ্যই এ কথা বলতে দ্বিধা নেই সময়, সমাজ ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের কারণে ছোটগল্পে বিবর্তনের রূপ পরিলক্ষিত হয়। বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ, পঞ্চাশ-ষাট ও সত্তরের এর দশকের গল্পগুলিতে বিষয়, বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছোটগল্প হলো লেখকের মনোজগতের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। আসলে ছোটগল্প মানব জীবনের রসভাষ্য বাস্তব ও কল্পনার সাযুজ্যে তার অন্তর্বয়ন এবং শিল্পে শিল্পীর জীবনায়ন, শিল্পপাত্রে শিল্পীর এই রস পরিবেশন সময় ও কালের হাত ধরে রসপিপাসু পাঠকের রস পিপাসা নিবৃত করেই ক্ষান্ত থাকে না, ছোটগল্প রূপ সাহিত্য মূলত সমাজের দর্পণ রূপে প্রতিভাত হয়—এই বিষয় সম্পর্কে সুহৃদয় পাঠক সমাজ অবগত।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক তথা ছোটগল্পকার হলেন সুমথনাথ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮৪)। সাহিত্যে আধুনিকতার আনয়ন, মধ্যবিত্ত মানব জীবনের মূল্যবোধের সংকট, আত্মকেন্দ্রিকতা, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিশেষ করে ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্বের চিন্তা চেতনা, শহরের শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণার কাহিনি সুমথনাথ ঘোষ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে ধারণ করেছেন। সবিতেন্দ্রনাথ রায় সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন— "উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি অপেক্ষা ছোটগল্পের জগৎ সুমথনাথ ঘোষের স্বক্ষেত্র মনে হয়, এখানে তার লেখনী আরও স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী ও সাবলীল"[২]। সুমথনাথ ঘোষ রচিত 'কেবল ভোগ করে নিন', 'জটিলতা', 'বাড়ির কর্তা', 'এই যুদ্ধ', 'নিঃশব্দচারিণী' গল্পগুলি পাঠ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় সমাজব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে তিনি একজন সচেতন শিল্পী। লেখকের 'কেবল ভোগ করে নিন' গল্পটিতে কলকাতা শহরে বসবাসকারী

মানুষজন কীভাবে শহরতলীতে বসবাসকারী মানুষদের অবহেলার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তা দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই গল্পেই মধ্যবিত্তের নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত যে লড়াই তার প্রতিচ্ছবিও আমরা প্রত্যক্ষ করি। আসলে কলকাতার মানুষেরা মনে করে কলকাতা তাদের কাছে স্বর্গভূমি আর কলকাতার শহরতলী হল কেরানির চাকরি করা মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার আস্তাকুঁড় মাত্র। কলকাতা থেকে আগত খগেনবাবু শহরতলী অর্থাৎ বালিগঞ্জে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে কিছুদিন থাকলেও তিনি মনে করেন এখানে মানুষ বসবাস করার যোগ্য স্থান নয় যে কারণে তিনি বাড়িটি বিক্রি করে দেন কলকাতারই আরেক বাসিন্দা ভবনাথবাবুকে। ভবনাথবাবু হাতিবাগানের বাসিন্দা হলেও একেবারে সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। ভবনাথবাবুর সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটলে মধ্যবিত্তের যে আত্মিক সংকট এবং প্রতিনিয়ত ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর বা ডায়মণ্ড হারবার-এর লোকাল ট্রেনে শাক-সবজি বোঝা, বড় বড় টিন ভর্তি দুধ ও জ্যান্ত মাছের গাছাগুলোর মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষজন শুধুমাত্র আর্থিক রোজকারের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন তা জানতে পারা যায়। লেখকের 'কেবল ভোগ করে নিন' গল্পে মধ্যবিত্তের আত্মিক-সংকট, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এক শ্রেণির মানুষের জীবন-যন্ত্রণার কাহিনি, তৎসঙ্গে অর্ধশিক্ষিত কিছু লম্পট যুবকদের কথা কাহিনিতে উল্লেখিত হয়েছে। আসলে সুমথনাথ ঘোষ চল্লিশ-এর দশকের সেই কথাসাহিত্যিক যিনি জীবনকে প্রতিমুহূর্তে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে রচিত 'জটিলতা' গল্পে এক পিতৃ-মাতৃহীন সাত বছরের নাবালক দু'মুঠো খাবারের জোগাড়ের আশায় নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে আজীবন মুনিব তথা রাধাকান্তবাবুর স্যাকরার দোকানে কাজ নিতে বাধ্য হয়। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় - "পটলার যখন সাত বছর বয়স তখন আর কোথাও চাকরি জোগাড় করতে না পারিয়া অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে স্যাকরার দোকানে ঢুকিল খাওয়া পরা আর এক পয়সা জলপানি, কাজ শিখিলে ভবিষ্যতে উন্নতির সুবর্ণময় সম্ভবনা।"[৩] যে উন্নতির জন্য নাবালক পটল স্যাকরার দোকানে কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, তার জীবন হঠাৎ করে যে বিনা অপরাধে, দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটতে হবে তা সে কল্পনা করতেও পারেনি। আসলে আমাদের সমাজ আজ কলুষিত, আমাদের বিকৃত মানসিকতার কারণে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায় বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে; ঠিক তেমনি স্যাকরার দোকানের মালিক শ্রী রাধাকান্ত কর্মকারের বিকৃত কামনার ফলে অপরাধী হতে হয়েছে পটলের মতো অসহায় নাবালককে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে মুনিবের সেবা করেও তাকে মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়েছে মিথ্যা চুরির অপবাদ। রাধাকান্ত একটি হীরা-মুক্তা খচিত হারের অর্ডার নিয়ে তা প্রস্তুত করে খরিদ্দারের বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখাতে নিয়ে আসেন তা নিখুঁতভাবে গড়া হয়েছে কিনা! কিন্তু অল্প বয়স্কা মেয়ে ডালিয়ার রূপ-যৌবন দেখে তাঁর মতিভ্রম ঘটে।

ডালিয়া গলার হারটিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করার কারণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা গড়ে আনার কথা বললে তিনি নিঃশব্দে পটলকে নিয়ে খরিদ্দারের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। হারটি যেহেতু ডালিয়া স্পর্শ করেছিল সেই স্পর্শানুভূতি পাওয়ার জন্য নিজে হারটি গোপন করে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেন এবং চুরির দায় গিয়ে পড়ে পটলের ঘাড়ে। সাক্ষ্য প্রমাণিত হলে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড হয় পটলের। কিন্তু যে অপরাধ সে কখনো করেনি সমাজে উচ্চবিত্তের লালসা এবং রক্তচক্ষুর বেড়াজাল থেকে নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষেরা মুক্তি পেতে পারে না, পটল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উজ্জ্বলতম ভবিষ্যতের আশা নিয়ে যে নাবালক ছেলেটা স্যাকরার দোকানে একদিন কাজ নিয়েছিল আজ সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত।

অন্যদিকে 'বাড়ির কর্তা' গল্পে সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে মহেশবাবু স্ত্রী-সন্তানদের অন্নসংস্থানের জন্য চাকরি জীবনে লড়াই করে সমাজে নিজের এবং পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন সন্তানদের। চাকরি জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর অর্থাৎ জীবন সায়াহ্নে তিনি বুঝতে পারেন এই জগত সংসারে কেউ আপন নয়, এমনি কি নিজের অর্ধাঙ্গিনীও আজ তাকে অবহেলার চোখে দেখেন। আসলে 'বাড়ির কর্তা' গল্পে লেখক সুমনাথ ঘোষ যে চিত্রটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হলো মধ্যবিত্ত চিন্তা-চেতনার অবক্ষয়। গল্পে লক্ষ করা যায় প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে হাজার হাজার মহেশবাবু এভাবেই বিবেকহীন সমাজে অবহেলিত, শোষিত হয়ে চলেছে প্রিয়জনের দ্বারা।

মহেশবাবু কষ্টার্জিত টাকা সঞ্চয় করে জমি কিনে প্রসাদোপম তিনতলা বাড়ি বানিয়েছেন স্ত্রী সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। অথচ শেষ বয়সে তাঁরই ঠাঁই হয়েছে বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট্ট ঘরে। সেখানেই তাঁর দেখাশুনা করে চাকরেরা। মহেশবাবুর ছেলেরা আজ বিবাহিত, কন্যা সন্তানও পড়ে কলেজে, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার; কিন্তু সেই সংসারে আজ তিনিই বেমানান। কলগুঞ্জন মুখরিত সংসার, সেখানে হাসি, উচ্ছ্বাস, নিত্য পরিচিত, অপরিচিত অতিথিদের আনাগোনা লেগে থাকলেও তিনি যেন এক স্বতন্ত্র জগতের বাসিন্দা। সুমথনাথ ঘোষ মহেশবাবুর জীবন যন্ত্রণার কাহিনি বলতে গিয়ে লিখেছেন—"সত্যি মহেশবাবুকে দেখলে দুঃখ হয় আর তার নিজের সংসারেই নিজের অস্তিত্বটা এখন বড় অদ্ভুত। এক বিরাট বৃক্ষের মূলের মত তিনি যেন আছেন শুধু অদৃশ্যে, কেউ তাকে দেখে না গ্রাহ্য করে না।"[৪] মহেশবাবু বাড়ির কর্তা হলেও একজন হতভাগ্য স্বামী এবং সন্তানের পিতা। স্ত্রী মনোরমা পেনশনের টাকাটুকু নেওয়া হয়ে গেলে স্বামীর খেয়াল রাখেন না, অথচ এই মানুষটাই একদিন প্রয়োজনের স্বার্থে সকলের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ তিনি একাকী, কেউ তাকে মান্যতা দেয় না। নাতি-নাতনিদের ভালোবাসার বা শাসন করার অধিকারটুকুও তাঁর নেই। হতভাগ্য মহেশবাবু একবার নাতিকে শাসন করায় স্ত্রী মনোরোমার ক্রোধাগ্নি মূর্তি হজম করতে হয়। জীবনের শেষ বয়সে তাকে শুনতে হয়েছে—"যদি আর কোন ছেলের গায়ে হাত দিয়েছো তাহলে হয় তুমি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে না হয়

আমি।"[৫] এরপর আর কথা বলতে পারেনি মহেশবাবু শুধু ইজি চেয়ারে বসে ভাবতে থাকেন, তার জীবনে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘটেছে! তা না হলে একদিন এই বাড়ির চাকর-বাকর থেকে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী তাঁর হুকুমে উঠতো বসতো অথচ আজ আর তারা কেউ তাকে মানেনা কেন? আসলে যে শাসন সে তাঁর নাতি-নাতনিদের করেছিল সেই শাসন যদি নিজ সন্তানদের করতো তাহলে হয়তো আজ তাকে নিজ সংসারে 'বাড়ির কর্তা' হয়েও অবহেলিত হতে হতো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক চিত্র, ভয়াবহতা, কালোবাজারি, চরম খাদ্য-সংকট এবং মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে বেরিয়ে গেলে এক শ্রেণির মানুষ চরম বিপন্নতার মধ্য পড়ে। তারা তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং দু'মুঠো খাবারের আশায় একসময় আস্তাকুঁড়ে গিয়ে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে। তেমনি জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া এক ট্রাজিক কাহিনির প্রেক্ষাপটে সুমথনাথ ঘোষ 'এই যুদ্ধ' গল্পটি রচনা করেছেন।

গল্পের শুরুতে দেখা যায় বিলাসিতার মধ্যে ছিল একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া, তাও ঘুচলো একে একে! ষাট টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি করা প্রিয়নাথ তিন ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে, কালোবাজারিতে ছেয়ে যায় গোটা কলকাতা নগরী। সমাজে চরম অস্থিরতা, অব্যবস্থা শুরু হলে প্রিয়নাথ এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে নেমে আসে চরম অর্থনীতি ও খাদ্যসংকট। বাজার থেকে কিনে আনা খাবার আগেই বন্ধ হয়েছিল, অনুপমা বাড়িতে রেশনের আটার পরোটা, হালুয়া তৈরি করে ছেলে-মেয়ে, স্বামীকে খাওয়াতো; কিন্তু দুর্মূল্যের বাজারে আটার দাম বৃদ্ধির ফলে সেইটুকু খাবারও উঠে গেল। সকালের জলখাবার গিয়ে দাঁড়ালো শুধুমাত্র চা-হালুয়াতে।

মধ্যবিত্তের জীবন কতটা ভয়াবহ এবং সংকটময় হয়ে উঠতে পারে বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা প্রিয়নাথ ও অনুপমার সংসারকে প্রত্যক্ষ করলেই বোঝা যায়। যে পরিবার এক সময় সরু চালের ভাত খেয়ে দিনযাপন করতো, সেই পরিবারকেই এই অস্থিরতার সময়কালে কোনক্রমে আলুর খোসা দিয়ে মোটা চালের ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মননের সংস্কার নেমে আসে নিম্নবিত্ত পর্যায়ে, খাদ্যের অভাবে ভদ্রতা ও শোভনতার সমস্ত আচরণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই চরম খাদ্যসংকটের দিনেও একশ্রেণির মানুষ অর্থের ক্ষমতাবলে বিবাহ সভার আয়োজন করে শত লোক ছাড়িয়ে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে হাজার হাজার লোক আমন্ত্রণ করে, আর অন্যদিকে দু'মুঠো খাবার জোটাতে হিমশিম খেতে হয় প্রিয়নাথের মতো পরিবারগুলিকে। একসময় খাদ্যের অভাবে ছেলেমেয়েদের শরীর ভেঙে পড়তে থাকে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মাড়োয়ারীদের বিবাহ উপলক্ষে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনুপমা ও তার বড় ছেলে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে জানাই অত্যাধিক 'ঘৃতপক্ক' খাদ্য পেটে পড়ার কারণেই 'ভেদবমি' শুরু হয়েছে। ডাক্তার স্যালাইন, ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে যায়। বড় ছেলে কিছুটা সামলে সুস্থ হয়ে উঠলেও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অনুপমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি বাংলার বুকে ও মধ্যবিত্তের জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা আমরা পরিলক্ষণ করতে পারি 'এই যুদ্ধ' গল্পে প্রিয়নাথ ও অনুপমার সংসারের ট্রাজিক পরিণতির মাধ্যমে।

আধুনিক মানুষের সম্পর্কের জটিলতা সুমথনাথ ঘোষের গল্পের বিষয়বস্তু। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস দুটি মানুষের বিশেষ করে দাম্পত্য সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। কিন্তু সেই সম্পর্ক বিক্ষিপ্ত ঘটনার কারণে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে, আর তখনই দাম্পত্য সম্পর্কে ঘৃণ্যবোধের জন্ম নেয় সুমথনাথ ঘোষের 'নিঃশব্দচারিণী' গল্প পাঠ করলেই বোঝা যায়। হেমলতা অনেক স্বপ্ন নিয়ে পিতার অনুমতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ভবদেব চৌধুরীর সাথে। হেমলতার বাবা ভেবেছিলেন ভগবানই এমন সুপাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু তিনি কল্পনাও করতে পারেননি এমন শিক্ষিত বি. এ. পাস যুবক জালিয়াত হতে পারে! ফুলশয্যার রাতে নববধূর সাথে প্রেমালাপের পরিবর্তে হাতের সোনার চুড়ি ও জড়োয়ার গহনাগুলি প্রত্যক্ষ করতে থাকে 'গহনা গুলো সাচ্চা না ঝুটো'। ভবদেব শিক্ষিত যুবক হলেও প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতকতা তার অস্থিমজ্জায় নিমজ্জিত। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেনি এমন দুষ্কার্য নেই যা তিনি করেননি। রূপের চেয়ে রুপোর কদর তার কাছে অনেক বেশি।

হেমলতা যে স্বপ্ন নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন ভবদেব চৌধুরী সেই স্বপ্ন, বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রেখে হেমলতার সমস্ত গহনা নিয়ে একদিন রাতের অন্ধকারে স্ত্রীকে একলা ফেলে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর খবরের কাগজের মাধ্যমে স্ত্রী হেমলতা জানতে পারে বোম্বাই গিয়ে এক চিত্রাভিনেত্রীকে অর্থের লোভে খুন করে ভবদেব চৌধুরী গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু অর্থের ক্ষমতা বলে সপ্তাহ তিনেক পর ধূমকেতুর মতো সহসা সে হাজির হয় হেমলতার কাছে। অন্যের ক্ষতিসাধন করা যেন তার জীবনের মূলমন্ত্র তাই নিজের বন্ধু অসীমকে ব্যবসার লোভ দেখিয়ে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে পথের ভিখারী করতেও তার দ্বিধাবোধ হয় না। হেমলতা বন্ধু অসীমের টাকা ফেরত দেবার কথা বললে ভবদেব জানায় — "লাভের অংশ নেবার সময় যেমন আনন্দ ধরে না, লোকসান হলেও তার ক্ষতিও তেমনি সহ্য করতে হবে বইকি! ব্যবসার এই ধর্ম।"[৬] হেমলতা বুঝতে পারে অন্যের সর্বনাশ করে নিজের আত্মতুষ্টি তার জীবনের মূল লক্ষ্য। তাকে পাপ পুণ্যের ভয় দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হলে ভবদেব প্রত্যুত্তরে যেকথা বলে তাতে হেমলতা একেবারেই নিঃশব্দচারিণী হয়ে উঠে। ভবদেব বলে কর্মই আমার কাছে একমাত্র ধর্ম। টাকাই আমার কাছে মূল। সমাজে ভবদেব বাবুর মতো হাজার লক্ষ প্রবঞ্চক প্রতিনিয়ত আমাদের দৃষ্টির অদৃশ্যে আজও রয়েছে সুযোগের সন্ধানে। এদের কাছে মান-সম্মান, ভালোবাসা বলে কিছুই থাকে না। এরা শুধু বোঝে টাকা, টাকার জন্য অন্যায় করতে দ্বিধাবোধ করে না।

সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্পের সার্থকতা বিচার করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন— "সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় বীজে নয় বনস্পতিতে, তাহার পূর্ণপ্রকাশে। সেই প্রকাশের দ্বারা বিচার করিলে গল্পগুলিকে সার্থক দৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আরো স্বীকার করিতে হইবে যে এগুলি কেবল বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারার অন্তর্গত নয়, সুমথনাথ ঘোষ ও বাংলা প্রধান ছোটগল্প লেখকের অন্যতম।"[৭] সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্প যেমন বাস্তবসম্মত তেমনি আবার তার প্রতিটি গল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে, কোথাও বা পিতাপুত্রের সম্পর্কের তিক্ততার কথা, কোথাও বা আবার জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করার প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়েছি। তথ্যের যথোচিত নির্বাচন, ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার ও গতির ক্ষিপ্রতা সমস্ত মিলে সুমথনাথ ঘোষ আজও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৩
২। ঘোষ, সুমথনাথ, শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৯
৩। তদেব পৃষ্ঠা-২১
৪। ঘোষ, সুমথনাথ, শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯০৭), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পৃষ্ঠা-৪৯
৫। তদেব পৃষ্ঠা-৫৫
৬। ঘোষ, সুমথনাথ, শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৩৫৭
৭। ঘোষ, সুমথনাথ, শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯০৭), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পৃষ্ঠা-৩

অ নি ন্দি তা মু খা র্জী

রাজনৈতিক দর্পণে বিমল করের ছোটগল্প : নতুনত্বের সন্ধান

সাহিত্য হল সাহিত্যিকের মানসদর্পণ। সাহিত্যিকের মনের নানা বৈচিত্র্যময় দিক তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই উদ্ভাসিত হয়। বিমল করের ছোটোগল্পে নানান অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। শুধুমাত্র জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে তা নয়, রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটা তাঁর গল্পগুলির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আসলে রাজনীতি যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনই তা সাহিত্য অঙ্গনেও অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে। নীতিহীন রাজনীতি ও সমাজ-নীতির বিপক্ষে সাধারণ মানুষের ঘৃণা গোপন থাকেনি। এই সকল সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ গল্পকার তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ছোটোগল্পে একাধারে যেমন সমকালীনতার প্রভাব পড়েছে, তেমনি রাজনৈতিক চরিত্রগুলিরও মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। গল্পের সূত্র ধরেই এসেছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন ছবি, যে ছবি তৎকালীন সমাজ জীবনকে পাঠকের সামনে আরোও স্পষ্ট করে তুলে ধরে। বিমল করের ছোটোগল্পের শিল্প সার্থকতার আরোও একটি বিশেষ দিক হল ভাষা ও শব্দের সচেতন প্রয়োগ। সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়েই লেখকের যথার্থ জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে অনুধাবন করা যায়।

'সৈনিক' গল্পটি বিমল করের প্রথম দিকের রচিত একটি গল্প। গল্পটির প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এছাড়াও বাঙালী তথা ভারতীয়দের আর্থিক পরিস্থিতিও এই গল্পটির মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। একদিকে ইংরেজ সরকারের কাছে পরাধীনতার কারণে নানা অত্যাচারের যন্ত্রণা, অপর পক্ষে বিশ্বব্যপী যুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত সংযোগ-এই দ্বিমুখী বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে ভারতের পরিস্থিতি। লেখক জানিয়েছেন—

"কলকাতার তখন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেমন এক অস্থিরতা, ক্ষিপ্ততা, বেপরোয়া ভাব। হরতাল, টিয়ার গ্যাস, পুলিশের গুলি সৈন্যদের টহল চলছে একদিকে, অন্যদিকে মাথার ওপর জাপান বোমার আতঙ্ক।"

এরই জোরে কলকাতা শহর থেকে মানুষের অন্যত্র যাতায়তের চিত্র, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। 'সৈনিক' গল্পটিতে বক্তা তৎকালীন পরিস্থিতির দিকটিকেই চিহ্নিত করেছেন। গল্পটিতে বক্তা কিরীটিবাবুর দেওয়া কাপড়ে রক্তের দাগ লক্ষ্য করে শিহরিত হয়েছেন এবং কিরীটিবাবুকে একজন অসৎ ব্যক্তি বলেই তাঁর মনে হয়েছে। এখানে একজন পলাতক সৈনিকের মাধ্যমে তৎকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকেও যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেছেন। অর্থাৎ গল্পটির একদিকে যেমন আছে তৎকালীন

সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি; তেমনি অন্যদিকে আছে মানুষের কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা ও মানবিকতার চিত্র।

তাঁর রচিত আরেকটি রাজনৈতিক ছোটোগল্প হল 'অন্তরে'। এই গল্পটির প্রেক্ষাপট দাঙ্গাকেন্দ্রিক। স্তূপীকৃত জঞ্জালের স্তূপে আশ্রয় নেওয়া একটি মানুষ যে ২৮ ঘণ্টা ধরে অভুক্ত, খাদ্য ও পানীয়ের কোনো কিছুর স্বাদ পায়নি। তার জীবনযুদ্ধের ছবি এঁকেছেন লেখক। অন্ধকার, বন্যজন্তুর আক্রমণ সমস্ত কিছুর থেকে সে বাঁচতে আশ্রয় নেয় এক নির্মীয়মাণ বাড়ির মধ্যে। সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা হয় একজন মহিলার সেও আশ্রয়প্রার্থী, লেখক দেখিয়েছেন জীবনের এই বিপর্যয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জীবন রক্ষার তাগিদে সকলেই ব্যস্ত। বিমল কর এখানে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকেই তুলে তুলে ধরেছেন। চরম ভয়ের মুহূর্তে দুটি মানুষ আলাপ পরিচয়হীন অবস্থায় উভয়ের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওরা যখন পরস্পরের নাম জেনেছে তখন ছেলেটি মেয়েটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানায়—

"আমায় বিশ্বাস করুন। খোদার নামে শপথ করছি। আপনার কোনো ক্ষতি করবো না, শুধু আপনারই ক্ষতি কেনো কারুরই সামান্য ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই।"

এখানেই লেখক ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন সেই তত্ত্ব, যে মানুষের হিংসার আগুন মানুষের দ্বারাই নেভানো সম্ভব। কবীর ও মাধবী দুই পুরুষ—নারী ঘুমের মধ্য দিয়েও সেই নিশ্চিত জগতের কল্পনা করে। যেখানে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আছে, নিরাপত্তা আছে - যা উজ্জ্বল এবং চিরন্তন। অন্যদিকে 'ভয়' গল্পটিতে বিমল কর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সেই সময়কালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের পটভূমি এঁকেছেন। নারী মনস্তত্ত্বের প্রাধান্যে গল্পটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। গল্পে বর্ণিত নারী চরিত্র শোভার জীবন যুদ্ধের কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, পথে পথে পুলিশ ও সৈনিকের টহলদারি, সব কিছুর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় শোভার মধ্যে। বিমল করের অধিকাংশ ছোটোগল্পেই নারী মনস্তত্ত্বের দিকটি অধিক মাত্রায় পর্যবসিত হয়েছে।

'মানবপুত্র' গল্পটি ১৩৫০ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা বিশিষ্ট একটি ছোটোগল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতিনিয়ত উর্দ্ধমুখী হচ্ছিল। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রচুর মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করেছিল, ফলস্বরূপ শহরের স্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে, রাস্তার পাশে ক্রমশঃ ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দেয়। সরকার পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে কণ্ট্রোল ও রেশন ব্যবস্থা চালু করে। কিন্তু ততদিনে সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বহু মানুষ আত্মহত্যার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজছে, বহুজন ভিক্ষার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার অক্ষম প্রচেষ্টা চালিয়েছে, ডাস্টবিনে প্রতিনিয়ত কুকুরদের সাথে লড়াই করে মানুষকে খাদ্য জোগাড় করতে হয়েছে, 'মানবপুত্র' গল্পে একদিকে অর্থপিপাসু মানুষের

অমানবিকতা, অপরদিকে অন্ত্যজ শ্রেণির উপেক্ষিত মানুষের সমব্যথী হৃদয়, একদিকে নারীর দেহ লুঠ করে নেওয়া নির্মম পৈশাচিকতা, অপরদিকে উদার ধর্মের আশ্বাসবাণীকে স্মরণ করে মহামানব হয়ে ওঠার বাস্তব পরিবেশ এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে কাজের সূত্রে বিমল কর এই দুর্ভিক্ষের ছবি খুব কাছের থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তৎকালীন দুর্যোগময় পরিস্থিতি, অসহায় মানুষের হাহাকার, ক্ষমতালোভী, বর্বর, অর্থপিপাসু মানুষের জিঘাংসা, কতিপয় মানুষের সহমর্মিতা, ধর্মবিশ্বাস, মানবিক, উত্তরণের শপথ সব কিছুই লেখকের জীবনদৃষ্টির নিরিখে গল্পটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ষাটের দশকের শেষার্ধে সমাজে আলোড়ন ফেলেছিল নকশালবাদী আন্দোলন। কৃষকদের নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে উঠলেও সমগ্র দেশে সকল মানুষের মধ্যে এই রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করে। বিমল করের গল্পেও এই রাজনৈতিক দিকটি ব্রাত্য থাকেনি। লেখক নিজেই এই বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন,

"নকশাল আন্দোলনের যখন চূড়ান্ত পর্ব প্রত্যহ-ই একটা না একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, শহর কলকাতায় শুধু নয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গাতেই খুনোখুনি লেগেই আছে, পোড়ানো হচ্ছে বই পত্র, মাথা ভাঙা হচ্ছে মূর্তির, স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।"

অর্থাৎ লেখক এই আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এছাড়া তিনি এই আন্দোলনকারীদের পিছনে বুর্জোয়া রাজনীতি ও ক্ষমতালোভী মানুষদের অবস্থানকে উপলব্ধি করেছিলেন। এরই প্রভাব পড়েছে 'সে', 'ওরা' ও 'নিগ্রহ' গল্পে। 'সে' গল্পটির প্রেক্ষাপটে রয়েছে নকশাল আন্দোলন বিধ্বস্ত কলকাতা শহরের ছবি এবং সাথে যুক্ত হয়েছে মধ্যবিত্ত দিগভ্রান্ত যুবকদের ক্রোধ, বিদ্রোহ ও ঘৃণা। এই গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের মানসিকতার দিকটির সাথে সাথে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিরাপত্তাহীনতার উপলব্ধিতে ভীতিবোধ প্রকাশিত হয়েছে, গল্প কথক পালিত সাহেবের হৃদয় উন্মোচনের মাধ্যমে গল্পটি বিশেষভাবে অন্তর্জগতের গল্প হয়ে উঠেছে। ঘুষ নেওয়া ও ঘুষ দেওয়া, অবৈধ সম্পর্কের মধ্য দিয়েও নিজেকে সমাজে গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু একসময় তার সকল অন্তরের মধ্যে একধরণের বিবেক জাগ্রত হয়। নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই এই উপলব্ধি ঘটে। তাই গল্পের শেষে কথককে বলতে শোনা যায়—

"আমি ঠিক জানি না, কেন যেন এক বিশাল কান্না আজ আমার ছাপান্ন বছর বয়সে এসে আমার সমস্ত বুক ভেঙে দিল। হ্যাঁ আমি ছেলেমানুষের মতো কেঁদেছিলাম।"

আবার 'ওরা' গল্পে বিমল কর দেখিয়েছেন সমাজের কিছু ক্ষমতালোভী, বর্বর মানুষদের ভীতিবোধকে। গল্পের কথক প্রমথ এবং গোপীমোহন, ফুলেশ্বর ও কেষ্টগুপ্ত এই চারজন চারটি দলের শীর্ষ নেতা। এরা লোভের কারণে এবং নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর যেমন অত্যাচার করে তেমনই আবার পুলিশের সাথে বোঝাপড়া

করে চলে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। এই চারজন একটি খুনের পর প্রলোভনে পা দিয়ে বিরোধী দলের লোকজন দ্বারা বন্দী হয়। বন্দী থাকাকালীন তারা পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, অসন্তোষের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বরূপটি নিজেদের কাছেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যারা অন্যের জীবনের দাম দেয় না, ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করে তারাই বন্দীদশায় বিপন্নতা অনুভব করেছে। তাই পান্নার মৃত্যুর পর নিজেদের নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও আতঙ্ক তাদের পিছু ছাড়ে নি। বন্দীদশায় আবদ্ধ হয়ে প্রমথরা যখন আর্তনাদ করে জানতে চেয়েছে কেন তাদের এখানে আনা হয়েছে তখন তাদের চমকে দিয়ে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বরে কেউ বলে ওঠে—"কে কাকে এনেছে?"

আসলে নকশাল আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম, মানুষের মৃত্যু বিভিন্ন সময়ে সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল তার পিছনে দৃশ্য ও অদৃশ্য কালো হাত রয়েছে। লেখক তারই রূপরেখা এই গল্পটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন জীবনের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা সকলের ক্ষেত্রেই সমান।

বিমল করের আরেকটি গল্প 'নিগ্রহ' তে পুলিশি নির্যাতনের বর্বরতা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পে উন্মুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত সমাজ পরিবারের নগ্ন দিক, হতাশা ও অসহায়তাবোধে জর্জরিত এক যুবকের আত্মচরিত। গল্পের প্রধান চরিত্র সুবোধের বক্তব্যে ফুটে ওঠে তার পারিবারিক বিপন্নতার কথা। আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে হারিয়ে যায়, জীবনের জটিলতা কিভাবে তাদের পঙ্কিলতার মধ্যে টেনে নামায় সেটাই গল্প কথক কাহিনির মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। তার বাড়ির পরিবেশই ছিল নরকের তুল্য। তাই সে বলে ওঠে — "আমরাও বড় হয়ে উঠেছি গাদাগাদি করে। মাটিতে শুয়ে, উকুনভরা ছেঁড়া তোষকের ওপর ঘুমিয়ে।"

সুবোধের এই জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, সমাজের কদর্যরূপ। গল্পটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে পুলিশের নিগ্রহের পাশাপাশি সুবোধ ও তদন্তকারী অফিসার দুজনেরই আত্মনিগ্রহের কথা।

বিমল কর তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক গল্পের ধারার সাথে যুক্ত করেছেন মানব মনের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিকে। যেখানে রাজনৈতিক পরিবেশে নর-নারীর মনের জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে। বিমল করের 'তুচ্ছ' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন সমাজ সংসারের শত অভাব অনটনের থেকেও বড়ো উঠেছে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও অবলম্বন। পুরো গল্পটিই বৃদ্ধ দম্পতির মনোজগতের ভাবনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিগত দিনের ফেলে আসা স্মৃতির সূত্র ধরে বৃদ্ধ দম্পতি বরদা ও কানন উপলব্ধি করে তাদের নিখাদ ভালোবাসার মাধুর্য। আসলে এই গল্পে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপট থাকলেও কোথাও কোথাও সৌন্দর্য ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অভিন্নহৃদয় দুই নর-নারী জীবনের শেষ

লগ্নে এসে অনুভব করেন একে অপরের প্রতি নিবিড় মমত্ব, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তাই জাগতিক সকল বিষয় তুচ্ছ হয়ে যায় এই - মানবিক সম্পর্কের জাদুতে। তাই গল্পের মধ্যে বরদা কাননকে বলে—

"এরকম হয় সংসারে, হয় আপনজনের মধ্যেও একজন কেমন করে যেন আরোও আপন হয়ে ওঠে, নিজের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে নেয় মিশে যায় সর্বাঙ্গে। কখনও কখনও মনে হয়, অন্য মানুষটির নিঃশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে থেকে উঠে এল"।

বিমল কর তাঁর গল্পে মানবিক, পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কের ওপরই আস্থা রেখেছেন। কৃত্রিমতায় আবদ্ধ ভোগ সর্বস্বতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেনি। যখনই তিনি রাজনৈতিক টালমাটাল পরিবেশে গল্প লিখেছেন, তখনই সেখানে চরিত্রের কোথাও না কোথাও মানবিক উত্তরণকে দেখিয়েছেন। অন্যায়, পাপ, বঞ্চনা থেকে তাঁর গল্পে মানুষের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা বড়ো হয়ে উঠেছে। বিমল করের জীবনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় তাঁর মনে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, নৈতিকতা-অনৈতিকতা প্রভৃতি প্রশ্ন ভিড় করেছে এবং তাঁকে এতটাই এই বিষয়গুলি আলোড়িত করেছে যে তাঁর গল্পে সেগুলি বারবার ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর সাহিত্যের নির্মাণে কোনো জটিলতাকে প্রশয় দেননি। তাই কোনো কোনো গল্পে দেখা যায়, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে মধ্যবিও বাঙালি পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়কে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যথাসম্ভব রাজনীতিকে আড়াল করে।

বিমল করের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল 'ইঁদুর'। গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র, যারা দারিদ্র্যতার কারণে আসানসোলে কুড়ি টাকায় ছোট, অপরিচ্ছন্ন ঘর ভাড়া নেওয়া এবং মলিনার নিপুণ হাতের স্পর্শে সেই ঘরে শ্রী ফিরে আসার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কাজের সন্ধানে মানুষের শহরমুখী মনোবৃত্তি, শহরে স্থানাভাব, সুযোগ সন্ধানী মানুষের চতুরতার পাশাপাশি দারিদ্র্যের সাথে লড়াই, যতীন ও মলিনার সাংসারিক চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে—

"কুড়ি টাকা তো একরকম সস্তাই। সে আসানসোল আর আছে নাকি! যুদ্ধের হিড়িকে আসানসোলের জমিগুলো সোনা হয়ে গেল"।

যতীনের এই ভাবনা তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পুরোপুরি বাস্তব। এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে একদিকে মধ্যবিত্ত সুলভ সতীত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আচরণ, অপরদিকে পারিবারিক বন্ধু বাসুদেবের প্রতি মানবিক আবেদন, একদিকে মনের কুণ্ঠা ও শুচিতার প্রতি মান্যতা, অন্যদিকে অবচেতনার সঙ্গে সংগ্রাম মলিনা চরিত্রটি দ্বন্দ্ব জর্জরিত করে তুলেছে। আবার অন্যদিকে 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জিনির মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়েছে সেই ব্যক্তিত্ব, যারা সমাজের কোনো পরিস্থিতিতেই মনোবল হারায় না। প্রয়োজন মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, রাজনৈতিক চাপানউতোরের সময়ও সে নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। জিনির জীবনের সামান্য

প্রাপ্তিও তাকে মহৎ করে তুলেছে। পারলে সে নিজের দেহগত কামনায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত, কিন্তু উপার্জনের নামে সে পঙ্কিলতার আশ্রয় নেয়নি। স্বামী নন্দের উদার মানসিকতার শরিক হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সে বুঝছে এই সমাজে এখন তার স্থান নেই, তখন এই সমাজের ভদ্রতার মুখোশ পরা মানুষের কাছে নিজেকে ধরা দেওয়া নিজের অসম্মানের সমান। জিনির এই লড়াই যেন সমাজের কাছে নিজের স্বীকৃতি লাভের লড়াই।

'মানবপুত্র' পর্যন্ত লেখা গল্পগুলিতে কাহিনী বর্ণনার সাথে চরিত্রগুলির মানবিক মূল্যবোধকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। এর পর থেকে মনস্তাত্ত্বিক রচনার প্রতি লেখকের কিছুটা দূর্বলতা লক্ষিত হয়। 'কাঁচঘর', 'জোনাকি' 'বকুলগন্ধ' থেকে শুরু করে 'যযাতি', 'পলাশ' প্রভৃতি গল্পে মানুষের মনের গোপন ইচ্ছা অনিচ্ছা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'সুধাময়' থেকে বিমল করের গল্পে মানুষের জীবনের সাথে নানা তত্ত্বগত দিকও বর্ণিত হয়েছে। জীবনের চাওয়া-পাওয়া, স্নেহ, প্রেম, দৈহিক সৌন্দর্য, মানসিক দৃঢ়তা, মৃত্যুচেতনা সমস্ত কিছু দার্শনিক ভাবনার সাথে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলির মধ্যেও মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন ও সেই বন্ধন থেকে মুক্তির আভাস পাওয়া যায়। আবার 'শীতের মাঠ', 'জননী', 'উদ্বেগ', 'অপেক্ষা', 'সোপান', 'মোহনা' প্রভৃতি গল্পে মানব মনের রহস্যের পাশাপাশি মৃত্যুভাবনা, অস্তিত্বের সংকট, প্রেমচেতনা, দার্শনিকতা মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিশেষ ভাবনাকে লেখক গল্পের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। 'সুখ' গল্প থেকে লক্ষ্য করা গেছে লেখক নানান তত্ত্বগত ভাবনা গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিমল কর তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই তৎকালীন সমাজ জীবন, রাজনৈতিক চেতনা, মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ, বেকারত্ব, সনাতন প্রেম, আধ্যাত্ম ভাবনার সাথে চরিত্রের মনস্তত্ব বিশেষ রূপ পেয়েছেন।

আসলে বিমল কর যে সময়কালের লেখক সেই যুগটা ছিল বিচিত্র সমস্যা, বিচিত্র চিন্তা ও মননের দ্বারা আবদ্ধ। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে জীবন প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছিল। তাই রাজনৈতিক সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই বিমল কর তাঁর গল্পগুলিকে চিত্রায়িত করেছেন। স্বভাবতই বলা যেতে পারে বাংলা ছোটোগল্পের পালা-বদলের ধারায় বিমল কর অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাৎক্ষণিক, কিছু বা আপেক্ষিক, উপলব্ধির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে তিনি মননের গভীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. 'উড়োখই' (প্রথম পর্ব)-বিমল কর, পৃষ্ঠা নং ১৮৪
২. 'অন্তরে' - বিমল কর, পৃষ্ঠা নং ২

৩. বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প। পৃষ্ঠা নং ১৫১
৪. বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প। পৃষ্ঠা নং ২৭৪
৫. পঞ্চাশটি গল্পঃ বিমল কর, পৃষ্ঠা নং ১০৫,
৬. বিমল করের গল্প সমগ্র। পৃষ্ঠা নং ১০১
৭. বিমল করের গল্প সমগ্র। পৃষ্ঠা নং ২৫৪।
৮. বিমল করের গল্প সমগ্র। পৃষ্ঠা নং ১৬৫।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. মিত্র ড. সরোজমোহন, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, তুলসী প্রকাশনী
২. চৌধুরী শ্রীভুদেব। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
৩. পাল শ্রাবণী, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা, পুস্তক বিপনি
৪. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং
৫ ঘোষ বারিদবরণ, বিমল কর বাছাই গল্প। নিউ লতিকা প্রকাশনী
৬. মুখোপাধ্যায় কেশব, দেশভাগ বাংলা ও বাঙালি পুনশ্চ

বি শ্ব জি ৎ বি শ্বা স

ভারতবর্ষ : আত্মবিপর্যয় ও এক অস্তিত্ব সংকটের আখ্যান

কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর প্রায় শতাধিক ছোটগল্পের মধ্যে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প 'ভারতবর্ষ'। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলা কথাসাহিত্যিকদের রচনায় বারবার উঠে এসেছে যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বযুদ্ধের নগ্ন রূপ। জায়গা করে নিয়েছে আগ্রাসী নীতি, লোভ, লালসা, কালোবাজারী, স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা প্রভৃতি। দুই বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প-উপন্যাসে এই চেনা ছক আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সাহিত্যিকদের কলমে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় দুই দশক পর এই গল্পটি লিখতে গিয়ে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী তথাকথিত ছক ভাঙ্গলেন। একটা যুদ্ধের অভিঘাতে উপনিবেশিক জীবনধারা কিভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মানুষ কিভাবে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় তারই অন্তর্মুখী এক অনুসন্ধান করেছেন লেখক এ আখ্যানে; পৌঁছাতে চেয়েছেন ব্যক্তি ও মানুষের গভীর মর্মমূলে—"ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখারী হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব ভিখারী হয়ে গেল।"[১]

একটি জনজাতি তাদের ঐতিহ্যের অহংকারটুকু হারিয়ে, সহজ সারল্যের অভিমানটুকু হারিয়ে কেমন যেন নিঃস্ব হয়ে গেল। শুধু মাহাতোগাঁয়ের মানুষগুলোই নয়, একটা গোটা দেশ যেন এই সংকটের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। ভিখারি হয়ে গেল। উপনিবেশিক ভারতবর্ষের, স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রাপ্ত সম্মান হারানোর গল্প এটি। মানুষকে ভিখারি বানানোর এক আশ্চর্য গল্প ।

সমগ্র গল্পটি উত্তমপুরুষের জবানিতেই রচিত। গল্পকার সামগ্রিক গল্পের কথক রূপে বেছে নিয়েছেন একজন ঠিকাদার চরিত্রকে। এই 'আমি'ই ভারতবর্ষের পরিবর্তনশীল চেহারাটার বর্ণনা করেছেন এ গল্পে। প্ল্যাটফর্ম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এক প্ল্যাটফর্মহীন স্টেশন বিএফ থ্রি থার্টি টু — অর্থাৎ তথাকথিত আন্ডা হল্টকে।

"ফৌজি সংকেতে নাম ছিল বি এফ থার্টি টু, সেটা আদতে কোন স্টেশনেই ছিল না, না প্লাটফর্ম, না টিকিট ঘর। শুধু একদিন দেখা গেল ঝকঝকে নতুন কাঁটাতার দিয়ে রেল লাইনের ধারটুকু ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ব্যাস, এইটুকুই। সারাদিনে আপ ডাউনের একটা ট্রেনও থামত না। থামত, শুধু একটি বিশেষ ট্রেন। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় এসে থামত।"[২]

নামহীন, পরিচয়হীন, চাকচিক্যহীন এমনই এক অখ্যাত জায়গায় ট্রেন এসে থামতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমেরিকান সৈন্যদল ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে, ট্রেন বোঝাই করে যাওয়া আসার সময় সকালবেলায় ট্রেন এখানে থামত। কবে কখন ট্রেন থামবে, তা শুধুমাত্র জানতো গল্পের কথক ঠিকাদার এবং কুক বিহারী ভগোতীলাল। আগেই

তাদের কাছে অর্ডার এলে, তারা রাত থেকে সৈন্যদের জন্য ডিম সেদ্ধ, পাউরুটি আর কফি বানিয়ে ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত করে রাখত। রাশি রাশি ডিমের পরিত্যক্ত খোসা জমতো লাইনের ধারে। পরিত্যক্ত ডিমের খোসা জমতে জমতে এই জায়গাটার নামই হয়ে উঠলো আন্ডা হল্ট। ফৌজী সংকেতে যে নামটি ছিল, বি এফ থ্রি থার্টি টু সেটা ক্রমশ আবছা হয়ে গেল। এই অখ্যাত আন্ডা হল্ট হঠাৎ একদিন মোরাম দিয়ে কিছুটা উঁচু করে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হলো। রাতারাতি জায়গাটা কিছুটা জাতে উঠলো। এখানে শুধুই আর বন্দি বোঝাই ট্রেন নয়, মাঝে মাঝে মিলিটারি স্পেশাল ট্রেনও দাঁড়াতে লাগলো। আমেরিকান মিলিটারি সৈন্যরাও এখানে নেমে পায়চারি করত, হাসি ঠাট্টা করে হল্ট স্টেশন সরগরম করত। তারপর খাবারের সারটুকু খেয়ে, খোসাটুকু ফেলে রেখে চলে যেতে। খোসার স্তুপ জমতে জমতেই হিমালয়ের আকারে হয়ে উঠলো ডিমালয়।

আন্ডা হল্টের কিছুটা দূরেই এক ছোট খাটো পাহাড়ে টিলার নিচে মাহাতোদের গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়েই চলে যাওয়া ট্রেন লাইন এবং কিছু দূরের এই আন্ডা হল্ট গ্রামের মানুষগুলোকে প্রথমে প্রভাবিত করতে পারেনি। পাহাড়ের ঢালুতে পাথুরে জমিতে তারা চাষ করত, হাঁস মুরগি পালতো, মাহাতোরা হাটে হাটে মুরগির ডিম বেচতো। এরা ক্ষেতে কাজ করতে করতেই কৌতুহলী দৃষ্টিতে ট্রেন আসা-যাওয়া দেখতো। ব্যাস এইটুকুই। কথক আমাদের জানিয়েছেন—"ওরা তো দিব্যি ক্ষেতে খামারে কাজ করে, গুলতি নয়তো তীর ধনুক নিয়ে খটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, ধনুকের ছিলার মত কখনো কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়।"[৩]

নগর প্রভাবহীন এ জীবনযাত্রা নিয়েই, এই মানুষগুলোর সহজ-সরল, সাদাসিধে জীবন বয়ে চলছিলো আবহমান কাল থেকে। এই আপাত সহজ প্রকৃতির কোলে ডুবে থাকা জীবন, আর মাঠ ঘাট পথের সহচর্যে এই মাহাতোগাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা খুঁজে নিয়েছিল জীবনের ছন্দ। এই মানুষগুলোর ছিল পরিশ্রমের ফসল, মুরগির লড়াই, গলায় লাল সুতোয় ঝোলানো দস্তার তাবিজ, পুঁথির মালা। আর ছিল উৎসব অনুষ্ঠান, ধামসা মাদল, মহুয়াবন এবং আদিম সঙ্গীত। এটাই ছিল এই মানুষগুলোর জীবনের স্বাভাবিকতা।

কিন্তু একদিন হঠাৎ মাহাতোগাঁয়ের একটি নেংটি পরা ছেলেকে দেখা গেল আন্ডা হল্টের পাশে। শিশুসুলভ সারল্য আর কৌতুহল নিয়ে কাঁটাতার থেকে খানিকটা দূরে সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ট্রেন আর লালমুখ আমেরিকান সৈন্যদের দিকে—

'ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ট্রেনটা, কিংবা রাঙামুখ আমেরিকান সৈনিকদের দেখছিল। একজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ হে-ই বলে চিৎকার করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে নেংটি পরা ছেলেটা পাঁই -পাঁই করে ছুটে পালালো মাহাতোদের গাঁয়ের দিকে। কয়েকটা আমেরিকান সৈনিক তখন হা-হা করে হাসছে।"[৪]

এখান থেকেই গল্পের বদল শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে এক কৌশলী নির্মাণ। কথক

ভেবেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন ছেলেটা আর হয়তো কোনদিন আসবে না। কারণ সেখানে মাহাতোরা কেউ আসতো না, কেউ না। ক্ষেতে কাজ করতে করতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা শুধু অবাক চোখে চোখ মেলে দূর থেকে দেখতো।

"কিন্তু তারপর আবার যেদিন ট্রেন এলো, ট্রেন থামলো, সেদিন আবার দেখি কোমরের ঘুনশিতে লোহা বাধা ছেলেটা কাঁটাতারের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে আর একটা ছেলে, তার চেয়ে আর একটু বেশি বয়েস। গলায় লাল সুতোয় ঝুলানো দস্তার তাবিজ।"[৫]

এই নেংটি পরা, রোগা, শীর্ণ শরীরের কালো, রুক্ষ চেহারারগুলি দেখে সৈনিকদের মধ্যে একজন, কফিতে চুমু দিতে দিতে অন্যজনের কাছে 'অফুল' বলে বিদ্রুপ করেছে। কথাটার মানে ছেলে দুটি কোনদিনই বোঝেনি। তারা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে সৈন্যদের দিকে। এরপর দেখা যায় এই দুটি ছেলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বছর পনেরোর একটি মেয়ে এবং দুজন মাহাতো পুরুষ। এভাবেই আন্ডা হল্টের কাঁটাতারের ওপারে সংখ্যা বেড়েছে ক্রমশ। ট্রেন চলে গেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে, হাসাহাসি করে আবার ফিরে যায়। অথচ এই মানুষগুলোরই ক্ষেতির কাজ ফেলে অন্য কোন কিছু করার সময়ই ছিল না। কথক যখন মাহাতোবুড়োকে বলেছিলেন লোক পাঠিয়ে আন্ডা হল্টের তাঁবুতে সবজি চিংড়ি, সরপুটি, মোরলা বেচে আসার কথা, সে তখন হেসে বলেছিলো 'ক্ষেতির কাজ ছেড়ে যাব নাই।'

অথচ সেই পরিস্থিতিই বদলে গেল। ক্ষেতির কাজ ছেড়ে অন্য কিছুতে সময় না পাওয়া মানুষগুলোই মিলিটারি ট্রেন এসে থামলে সব ছেড়েছুড়ে এসে কাঁটাতারের ওপারে ভিড় করে। এখন আর একজন দুজন বা পাঁচ জন নয়। কালো কালো নেংটি পরা লোকগুলো, খাটো শাড়ির মেয়েগুলো, এমনকি গেঁয়ো মৃধার কাছে বানানো টাঙি জুতো পড়ে মাহাতোবুড়োও আসে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কাঁটাতারের ওপারে। এইরকম ভিড় বাড়তে দেখে বর্ণ গৌরবে ও দম্ভ অহংকারে পরিপূর্ণ একজন ইয়াঙ্কি সৈনিক কিছুটা মুগ্ধ হয়। এদেরই কেউ কেউ কাঁটাতারের ওপারে ভিড় জমানো মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে কিছুটা করুণা ছুড়ে দেয়। এই করুণার নাম যে 'বকশিশ' সেটাই এই মানুষগুলো জানতো না। তাই ছুঁড়ে দেওয়া চকচকে আধুলিটা দেখেও এরা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। এটা কুড়িয়ে নেওয়ার ভাবনা কোন ভাবেই আসে না এই মানুষগুলোর মস্তিষ্কে। তাই তারা চকচকে সে আধুলিটা হাতে তুলে নিতে পারেনি।

"ওরা অবাক হয়ে সৈনিকটার দিকে তাকালো, কাঁটাতারের ভিতরে মোরামের উপর পড়ে থাকা চকচকে আধুলিটার দিকে তাকালো, নিজেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর ওরা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল দেখে আমি বললাম, সাহেব বকশিস দিয়েছে, বকশিশ তুলে নে।

সবাই সকলের মুখের দিকে তাকাল, কেউ এগিয়ে এলো না।

আমি আধুলিটা তুলে মাহাতোবুড়োর হাতে দিলাম সে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর সবাই নিঃশব্দে চলে গেল। কারো মুখে কোন কথা নেই।"[৬]

এখানে কথকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাতেই আমরা বুঝতে পারি কত সহজে কত গভীর ইশারা করা যায়। এখানেই গ্রামের মানুষগুলোকে 'বকশিশ' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন কথক। অথবা 'বকশিশ' শব্দটির সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচয় থাকলেও এভাবে যে বকশিশ পাওয়া যায় কোন কারণ ছাড়াই, কোনো কাজ ছাড়াই, এটাতেই বিস্মিত হয়েছিল মাহাতো গাঁয়ের মানুষগুলো। কারণ তারা কাঙালের মতন খাবার বা বকশিশের লোভে কেউ কাঁটাতারের ওপারে এসে ভিড় জমাতো না। তাই এই নীরবতা। এই নীরবতাই কতককে অন্তর্মুখী করেছে। তাই এখান থেকেই আমরা লক্ষ্য করি কথকের মধ্যে এক ভালো না লাগার জন্ম হয়েছে। আর একজনের নিশ্চিত ভালো লাগেনি, সে হলো মাহাতোবুড়ো। তাই এরপর থেকে যখনই ট্রেন এসে দাঁড়াতো, গ্রামের ছেলেবুড়ো মেয়ে সবাই কাঁটাতারের ওপারে জড়ো হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করত 'সাব বকশিস বকশিস।' আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরাও তাদের উদ্দেশ্যে মুঠো মুঠো আনি, দুআনি ছুঁড়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গে তারা হুমড়ি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো পয়সাগুলোর উপর—তাড়াতাড়ির কারণে কাঁটাতারে তাদের হাত পা ছিড়তো, কারো কারো নেংটির কাপড় ফেঁসে যেত। তবুও ঝাঁপিয়ে পড়তো। একমাত্র সেখানে আসতো না সেই মাহাতোবুড়ো। যখন গোটা মাহাতো গাঁয়ের প্রায় আধখানাই আন্ডা হল্টে এসে জড় হত, তখন বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা মাটি কুপিয়েছে। সে ক্ষেতে মাটি কাপাতে কোপাতেও গাঁয়ের ছেলে বুড়োদের পয়সা নেওয়ার জন্য ধমক দিত। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের ছেলে থেকে বুড়ো কেউ শোনেনি তার কথা।

আন্ডা হল্টের এই টুকরো টুকরো ছবিগুলোই কথককে ভাবিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে। আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের কাছে নিজের দেশের মানুষের এই ভিক্ষাবৃত্তি, এই কাঙ্গালপনা কথকের ভালো লাগেনি। এই আমেরিকান সৈনিকদের কাছে নিজের দেশের পরিশ্রমী, দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষগুলোর সংজ্ঞা যখন 'অফুল' থেকে 'ব্লাডি বেগার্স' এ পরিণত হয় তখনো কথককে আমরা লজ্জিত হতে দেখি। একমাত্র মাহাতোবুড়োই যেন কথকের কাছে আত্মসম্মানের প্রতীক। গ্রামের সকল মানুষের ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের প্রতীক। কিন্তু কথকের সেই ধারণাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভিক্ষাবৃত্তির গড্ডালিকা প্রবাহে সকল আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে, সকল প্রতিবাদ বিসর্জন দিয়ে, সেই মাহাতোবুড়োকেও গল্পের শেষে দেখা গেলো উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে সকলের সঙ্গে চিৎকার করছে—'সাব বকশিস, সাব বকশিশ!' এখানেই আত্মবিপর্যয় ও সংকটের মুখোমুখি কথক।

উপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় আত্ম অবমাননার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। তাই কথকও নিজের কাজ নিয়ে বিশেষ খুশি ছিলেন না। তিনি বুঝতে

পারতেন তার কাজের দ্বারাও পরোক্ষে তিনি নিজেই আত্ম অবমাননার স্বীকার। তাই যে ঠিকাদার কথক, একদিন মাহাতোদের উদ্দেশ্যে সৈনিকদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে মাহাতোবুড়োর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, হাত পেতে বকশিস নিতে শিখিয়েছিলেন, সেই কথককেই আত্মবিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখি যখন গোটা মাহাতো গ্রাম ভেঙে পড়ে কাঁটাতারের ওপারে বকশিসের জন্য। এখন তাদের চিৎকার শুনতে হয় 'সাব বকশিস সাব বকশিস!'

ওই ছোট্ট মাহাতো গ্রামটাই যেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিরূপ। এক অসহায় মাহাতো গ্রাম। এক অসহায় ভারতবর্ষ। যেখানে শ্রমজীবী কৃষকের সমগ্র অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। উপনিবেশিক শাসনে ক্ষতবিক্ষত ভারতবর্ষের এ যেন এক অমোঘ নিয়তি। যারা অনায়াসেই রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শাসন-শোষণ, অত্যাচার-অনাচার উপেক্ষা করে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দিত নিজের পরিবারের মুখে, গোটা ভারতবর্ষের মুখে, তারাই এখন পরম্পরাগত ঐতিহ্যের স্বাধীন বৃত্তির গৌরব হারিয়ে ভিখারিতে পরিণত হল। এ যেন এক সার্বিক অবক্ষয় তথা অস্তিত্বের অবক্ষয়। যখন যুদ্ধ শেষে চারিদিকে মুক্তির বার্তা, সৈনিকেরা ফিরে যাচ্ছে যুদ্ধজয়ের আনন্দে, তখনই এ মানুষগুলো হাত পেতে ভিক্ষুক হয়ে গেল। এটাই উপনিবেশবাদের যেন এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি।

গল্পকার এখানে একটা জাতির চারিত্রিক, মানসিক ও আত্মিক স্বাধীন বৃত্তির করুণ পরিবর্তনের ছবি এঁকেছেন। এখানে তিনি যুদ্ধজয়ের স্বাধীনতার বিপরীতে এক দাসত্বের ভিক্ষাবৃত্তিকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। আর অস্তিত্ব বিপন্নতার চিত্র এ গল্পে কথকের মধ্যে দিয়েই বারবার উঠে আসে। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে মানসিক দ্বন্দ্ব ক্রমশ দানা বাঁধছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই তারই যন্ত্রণাময় প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে। এ যেনো এক অধীনতা ও মুক্তির মধ্যবিত্ত মানসিক দ্বন্দ্ব। যে দ্বন্দ্বে ঘটেছে আত্মবিপর্যয়, ঘটেছে অস্তিত্ব সংকট। এ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই লেখক দেখাতে চাইলেন আজকের ভারতবর্ষকে।

"ট্রেনটা যত এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গমগম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয় গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন ট্রেন ভর্তি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মত আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম, একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়ল সেই মাহাতোবুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতোবুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে সাব বকশিস, সাব বকশিশ!

উন্মাদের মতো ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতোবুড়ো।

কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্যদিনের মতো এবার আর আণ্ডা হল্টের এসে থামল না। মেসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আন্ডা হল্টকে উপেক্ষা করে হুশ করে চলে গেল। আমরা জানতাম ট্রেন আর থামবে না।

ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিকিরি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব- ভিখিরি হয়ে গেল।"[৭]

মাহাতো বুড়ো যেভাবে মানবিক আদর্শ, মূল্যবোধ সঙ্গী, করে তাকে আঁকড়ে ধরে নিজের অস্তিত্ব, নিজের গৌরব ঘোষণা করেছিল, তা এসে দাঁড়ালো এক সংকটের মুখোমুখি। মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে গেল সমস্ত মানবিক আদর্শ, মূল্যবোধ, গৌরব। বুড়োর অস্তিত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমগ্র ভারতবর্ষের ছবি ফুটে উঠলো। যেন অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণাটুকু ছাড়া ভারতবর্ষের মানুষের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। এভাবেই একটা গোটা জাতির, গোটা দেশের আত্মবিপর্যয় ও অস্তিত্বের সংকটের আখ্যান হয়ে উঠল 'ভারতবর্ষ' গল্পটি।

তথ্যসুত্র :

১. রমাপদ চৌধুরী, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর-১৯৬৮, পৃষ্ঠা-৫৭৮
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৪
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৫
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭৮

অ সী ম মু খা র্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : জাফরান রৌদ্রালোকে মৃত্যুর বয়ান

প্লেটো তাঁর রচনায় প্রথম দেহ, মন ও মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। এ পাশ্চাত্য ভাবনা থেকেই সাহিত্যে মৃত্যুভাবনা নানাভাবে এসেছে। সক্রেটিস বিষ পানে আত্মহত্যা করার পর মৃত্যু এবং অমরতা সম্পর্কে তার একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। সক্রেটিস জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের জীবনে এমন সব মুহূর্ত আসে যখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেকখানি আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে। অ্যারিস্টটল তাঁর "Nature and essence of soul" গ্রন্থে মৃত্যুকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক সত্ত্বা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (The form of the Particular living body)।পরবর্তী আধুনিক দার্শনিক দেকার্ত ও হিউম, মৃত্যু সম্পর্কিত প্লেটোর পুরাতন ধারণাকে অগ্রাহ্য করে, মৃত্যুকে Personal Identity রসে জারিত করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তা দেখার চেষ্টা করেছেন। এ ধারণা থেকেই "Theory of Self" তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এরপর থেকেই মৃত্যুাবনা সম্পর্কিত বিষয় ভিন্ন সাহিত্যিকের কাছে ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে মৃত্যু হল একই দেহে দুই অবস্থান।অর্থাৎ নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা। যেখানে ভয় থাকে না, থাকে শুধুমাত্র জীবনকে ভোগ করার একধাপ প্রস্তুতি।বায়রণের কাছে মৃত্যু হল বিপ্লবের নামান্তর। আবার কীটসের কাছে মৃত্যু হল যন্ত্রণা ও বেদনায় সিক্ত এক সোপান মাত্র।

অন্যদিকে ভারতীয় চিন্তাধারায় মৃত্যুকে জীবনের বিপরীতে না ভেবে জন্মের বিপরীতে ভাবা হয়েছে। এ দুটো যে একই ধারণার দুটো আলাদা দিক। শারীরীক স্পন্দন যখন গতিশীল থাকে জীবন তখন 'আছি' শব্দের মধ্যে অস্তিত্বের জানান দেয়। অপরদিকে জীবনের গতি যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীর জুড়ে অন্ধকার খেলা করে। জীবন ও মৃত্যু একই দেহে দুয়ের সহবস্থান। এক অপরের পরিপূরক রূপ। মানুষ শব্দে রয়েছে দুই সত্ত্বা, এক-শরীর অপরটি আত্মা। এই দুই সত্তার জাগরনে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নানা ঘটনায় আবর্তিত হয় তেমনি জীবন ও মৃত্যু মানব জন্মের চক্রকারকে নানা আবর্তনের মধ্যে আবর্তিত করে। এ যুগ্ম সত্ত্বাকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ২য় অধ্যায়ে, ২২ সংখ্যক শ্লোকের বিষয় এখানে তুলে ধরলাম-

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি
নরঃ অপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী"।

মানুষ যেমনভাবে পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, শরীরাণি বা

আত্মাও ঠিক তেমনিভাবে জীর্ণ বা পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে বা অন্য নতুন দেহে প্রবেশ করে।

এতক্ষণ ধরে পাশ্চাত্য ভারতীয় দর্শনে মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই মত্যুভাবনা বাংলা সাহিত্যে কীভাবে এসেছে তা নিয়ে আলোচনায় নিয়োজিত হব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে প্রথম বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের মাধ্যমে মৃত্যু ভাবনা এসেছে। তাঁর চরিত্ররা কখনো প্রেমে প্রত্যাখিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে আবার কখনো নিয়তির কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এ মৃত্যুকে নিয়ে আরো বিশদভাবে সাহিত্যে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কাছে মৃত্যু কখনো খন্ড দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখা গেছে। ব্যক্তিগত জীবন অনুভূতি লেখককে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল, যার কারণে তাঁর সাহিত্যে আঙিনায় বারবার মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। প্রথম জীবনে মৃত্যুকে তিনি শক্তিমান দেবতার নিষ্ঠুর খেয়াল রূপে দেখেছেন। পরবর্তী সময়ে এ ভাবনা থেকে সরে এসে তিনি মৃত্যুকে প্রেমিক রূপে জীবনে আহ্বান করেছেন। মৃত্যুর প্রিয়তাকে বরণ করে তিনি বলে ওঠেন- 'মরণ রে তুহু মামা মম শ্যাম ও সমান'। তিনি জীবনের শেষ বয়সে এসে মরণকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন পাঠকদেরকে তারই (জীবন অনুভূতির) সুর শুনিয়েছেন। মরণের পর জীবনের অপার আনন্দকে তিনি আস্বাদন করে সাহিত্য আঙিনায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

'পুষ্পাঞ্জলি', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রুদ্রগৃহ', 'শিউলি ফুলের গাছ' এ পাঁচটি প্রবন্ধে তিনি মৃত্যুকে সরাসরি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কাছে মৃত্যু হলো—"একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে"। তিনি খুব সহজভাবে এ মরণ-ভাবনাকে বলেছেন, পৃথিবীতে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করেছি মৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী। তাই একে নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবার নেই। বীজ যেমন সুপ্ত অবস্থায় মহীরুহকে লালন করে তেমনি আবার ওই মহীরুহের সময়ের সাথে বিনাশ ঘটে। পুনরায় অঙ্কুরোদগম থেকে আবার গাছের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি ও লয়ের আবর্তনে পৃথিবী চক্রকারে আবর্তিত। "মৃত্যু আসলে পুংলিঙ্গে জীবনের জন্মদাতা, স্ত্রীলিঙ্গে জন্মপ্রসবিনী। মৃত্যুকে তিনি নিরঙ্কুশ সততা, শ্রদ্ধা, শুদ্ধ অন্তঃকরণ থেকেই ভালবেসেছেন। প্রকৃতিপক্ষে কবি যেন মৃত্যুর প্রেমে পড়েছিলেন তার কারণ অবশ্যই নয় যে, তিনি নৈরাশ্যবাদী বা জীবনবিমুখ। বরং তিনি জীবনকে প্রবল প্রগাঢ়তায় ভালোবাসেন বলে তার বিপরীত মেরু বা তার দোসর মৃত্যুকে এমন বার বার করে চাওয়া। আর সেই কারণেই মৃত্যুর কল্পরূপ নির্মাণ করে, তাকে সম্যক ভাবে অনুভব করতে চাওয়া, মৃত্যুর নানা অনুকল্পের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসলে জীবন পাত্রকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করতেই। যখন কালকের দিনটা আমাকে ছাড়াই শুরু হবে, আর সেটা দেখার জন্য আমিই থাকব না, এই ধরনের এক তীব্র বিষাদ ও কারুণ্য তৈরি করে তাতে আপাদমস্তক ডুবে থাকতে চাওয়ার

মধ্যে যে অস্তিত্ব বিরহ রয়েছে, তার স্বাদ নিতেই"[১]। তাই কবির মত আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - "মরণ বলে আমি তোমার জীবন তরী বাই"।

রবীন্দ্র সমকালে বাংলা কাব্য কবিতায়, রবীন্দ্র চিন্তাচেতনার বাইরে বা বিপরীতে সাহিত্যে যে নতুন সুর শোনা যায় তা জীবনানন্দ দাশের হাত ধরে। তাঁর সাহিত্য ভাবনায় বার বার মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি নষ্ট চাল কুমড়োর ছাঁচে মৃত্যুকে কখনো দেখেছেন। আবার কখনো সবুজ মুথা ঘাসের মধ্যে মৃত্যুর আসা-যাওয়াকে অনুভব করেছেন।অর্থাৎ তাঁর কাছে মৃত্যু হলো হতাশা বা নৈরাশ্যের যূপকাষ্ঠে শান্তির নতুন প্রতিবেদন। তাই তিনি বলে ওঠেন- "মৃত্যুর মতন শান্তি চাই" ('প্রেম' কবিতা)

এখন আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মৃত্যুর প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' গল্পে রঞ্জু নামে এক যুবক যে মানসিকভাবে অসুস্থ। সে নিজের বর্তমান সময়কে পেরিয়ে কখনো অতীত নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে আবার কখনো জীবনের শেষ পরিণতি নিয়ে অনবরত ভাবতে থাকে অর্থাৎ সমাজ, সংসার সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে মৃত্যু চিন্তা তার শরীরে খেলা করে বেড়ায়। এই ভাবনা থেকে তার বাঁচার কোন রাস্তা নেই। জীবনের হতাশা বা নৈরাশ্য তার মৃত্যু ভাবনাকে উজ্জীবিত করে তোলে। বৃষ্টিস্নাত কোনো এক রাতে রঞ্জু শুয়ে থাকে শিমুল গাছ তলায়। প্রতিনিয়ত তার মনে হচ্ছে সে যেন মারা যাচ্ছে। প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে রঞ্জু দেখে তার ওপর শিমুল ফুল চাদর বিছিয়ে রেখেছে। ঝড়ে ভেঙে পড়া ডাল তার ওপর যেন পড়ে রয়েছে। সে প্রশ্বাস নিতে চাইলেও তা নিতে পারে না, তার মনে হয় নিঃশ্বাস যেন থেমে আসছে জীবন জুড়ে। মৃত্যুই রঞ্জুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অজানা কোন এক জগতে :

"মৃত্যু মন্থর এই রাত্রি কেবলই সময়হীন ছড়িয়ে পড়ে। রোগা হয়ে রঞ্জু একটু কাঙ্গাল হাসলো। ফ্যাকাশে বলতে লাগলো "ঠিক মনে করতে পারছি না আম্মা একেবারে ভুলে গেলাম। কি জিনিস বারবার ভুলে যাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলা যখন চারিদিক আধার করে এলো - না তবে বোধ হয় অন্য কোন সময়ে কি যেন ফেলে গেলাম, আমি ঠিক কি যেন"।[২]

ইলিয়াসের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়েছে রঞ্জু চরিত্রের মধ্যে। হতাশা বা নৈরাশ্য ভাবনা রঞ্জু চরিত্রটিকে আরো বেশি নাটকীয় করে তোলে। তার জীবনের যাত্রা পূর্ণ থেকে অপূর্ণতার দিকে। যা স্বাভাবিক মানব জীবনের বাইরে।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করে। ধনী-গরীব, শিক্ষিত -অশিক্ষিত সকলের একটাই ইচ্ছে জীবনে ভালো করে বেঁচে থাকা। এই বেঁচে থাকা মানুষের সংরূপ নিয়ে 'অসুখ-বিসুখ' গল্পটি রচিত। আতমন্নেসা একজন জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ। সে অনবরত ঈর্ষা করে স্বাভাবিক জীবন যাপন দেখে। অপূরণীয় ইচ্ছা থেকে তার অন্তরে জন্ম নেই ক্ষোভ। তার পরিবারে দেখা যায় সকলেই নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, কিন্তু আতমন্নেসার জন্য কেউ কিছু ভাবে না। তার মেয়ে মতিবানু জন্য জামাই ফলমূল, ওষুধপত্র নিয়ে আসে, এসব

দেখে সে ধুঁকতে থাকে। তার জীবনে একটাই লক্ষ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করা। তাইতো সে নাতি আলমকে পান, পয়সার লোভ দেখিয়ে মতিবানুর সমস্ত ওষুধ নিজের কাছে এনে রাখে, সুস্থ হবার লোভে এসব ওষুধ সে খেয়ে ফেলে। এতে তার অসুস্থতা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। হাসপাতালে চেকাআপ করতে নিয়ে গেলে তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। জীবন সায়হ্নে মৃত্যুর হাতছানি সে অনুভব করে। পরক্ষণে সে ভাবে ডাক্তার তাকে অনেক ওষুধ দিয়েছে তাতে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। আতমন্নেসার কাছে মৃত্যু এক কঠিন ব্যাধি হিসেবে দেখা গেছে ,যার থেকে সে অনবরত নিজেকে বাঁচার চেষ্টা করেছ। ইলিয়াস সাহেব এই গল্পে মৃত্যুকে প্রলয়ঙ্কররূপে চিত্রিত করেছেন।

'কান্না' গল্পে মৃত্যুকে দুই ভাবে লক্ষ করা গেছে। একদিকে মৃত্যু হল জীবনের শেষ ধাপ, অপরদিকে মৃত্যু হল নিজের অস্তিত্বকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার নানান সংগ্রাম। এ গল্পটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে সূচিত হয়েছে। আফজ আলী এ গল্পের প্রধান চরিত্র। তার জীবিকা হল কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া -দরুদ করা, মৃত ব্যক্তিদের জন্য কবর তৈরি করা। লেখক মৃত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন যেমন- '৭৭৬৯', '৮২২২' ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি এ সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মানুষ যখন জগতে বেঁচে থাকে তখন নানা সংগ্রাম মাধ্যমে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে। আবার কালের নিয়মে যখন এদের মৃত্যু ঘটে তখন তারা অন্যদের কাছে সংখ্যার রূপে পরিগণিত হয়। আফজ আলির তা রোজগার করার একটাই উদ্দেশ্য ছিল ছেলে হাবিবুল্লাহকে ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা। নিজের মৌলভী ভাবনায় ছেলেকে সে মানুষ করতে চাইনি। আধুনিক সমাজের চাকুরী করা মানুষ হিসেবে তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা ক্রতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলের মৃত্যু তার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে দেয়নি। এ কান্না যেন আফজল আলির পুত্রশোকের পাশাপাশি অপূর্ণতার প্রতীক :

"আফাজ আলী শরিফ মৃধার দিকে খেয়াল না করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'আল্লা, আল্লা রাব্বুল আলামিন, শাহাতাব কবিররে তুমি বেহেস্ত নসিব করো আল্লা। কিন্তু,পাক পরওয়ারদিগার, তার বাপটারে কি তোমার নজরে পড়লো না? বাপটা কি তামাম জীবন খালি গোরস্তানে গোরস্তানেই থাকবো?"[৩]

'যোগাযোগ' গল্পে রোকেয়ার পুত্র খোকনের মৃত্যু ঘটেছে দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে। সন্তানের মৃত্যু মাতার কাছে কখনো কাম্য নয়। তবুও সন্তানের মৃত্যু মাতৃ হৃদয়ে কীরকম ক্ষত সৃষ্টি করে তারই প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পে। প্রিয়জন হারানো ব্যথা সহ্য করা যে কঠিন সেই বিষয়কে সামনে রেখে 'পিতৃবিয়োগ' গল্পটি রচিত। আশরাফ আলি যশোর কুষ্টিয়ার এক পরিচিত নাম। পেশায় সে পোস্টমাস্টার। ঢাকায় মেট্রিক পাশ করে চাকরি নিয়ে চলে যায় গ্রামে। তারপর বিয়ে করে আঠারো মাস পরে তার ছেলের জন্ম হয়, ছেলে জন্ম নেওয়ার পরেই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এরপর নানীর কাছে তার ছেলে বড় হয়ে ওঠে। ছেলের

জন্য নিয়মিত টাকা পাঠায়। ছেলেকে মানুষ করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। ছেলে বড় হয়ে গোপালপুর সুগার মিলে চাকরি নেয়। ছেলে তার বাবাকে কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু আশরাফ আলী নিজের কর্তব্যে অটল থাকায় কাজ ছাড়তে পারিনি এরপর হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা নিয়ে আশরাফ আলীর মৃত্যু ঘটে। পিতার মৃত্যু শুনে পুত্র দিশেহারা হয়ে যায়, পরে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পিতার সৎকার করা হয়। ঘরের প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিস ছেলে খুঁজে পাই বাবাকে। একসময় সে বুঝতে পারে স্মৃতি বিজড়িত এস্থানে বেশি সময় থাকা তারজন্য ক্ষতিকারক। তাই সে মেজো মামাকে সেখানে রেখে দিয়ে চলে যায় অজানা কোন গন্তব্যের পথে। এ গল্পে পিতার স্মৃতি ছেলের কাছে যেভাবে বারে বারে ফিরে এসেছে :

"সুর্মা দেওয়া চোখ ,কপালের ভাঁজ খুলে যাওয়ায় ফর্সা চামড়া এখন পাথরের মত মসৃণ। সাদা কাপড়ে লোবান ও আতরের গন্ধ। শিয়রে ও পায়ে ধূপকাটি পোড়ে, মনে হয় ধোঁয়াটাও শরীরের ভেতর থেকে আসছে। আর যা সব আগের মতোই"।[৪]

'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' অগ্রন্থিত এই গল্পে মানুষের কেন্দ্রে থাকা অপূর্ণতাই জীবনের আরও এক রূপ হিসেবে লক্ষ করা গেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ অপূর্ণতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটা মানুষ নিজের কাছে প্রশ্ন রাখে কীভাবে বাঁচবো? এ জীবন তত্ত্ব নিয়ে কেউ কখনো কিছু ভাবে না বরং তাদের শরীর জুড়ে শুধু খেলা করে মৃত্যুর নানা অবান্তর প্রসঙ্গ। এ গল্পে নৈরাশ্য চেতনা ব্যাপক রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে যা প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের অনুলিখন। 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্পের কাহিনি মৃত্যু চিন্তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। গোরস্তান এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতি পেয়েছে। গল্পের লেখার শুরুর থেকেই যে মৃত্যু চিন্তা ইলিয়াস সাহেবকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' গল্পটি।

মানুষের প্রতিনিয়ত চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই, হয়তো এই কারণেই তাদের জীবন জুড়ে নানা অভিযোগ। এ অভিযোগ মানুষের প্রতি মানুষের নয়। এ অভিযোগ হল অপর কোন নিয়ন্তা শক্তির কাছে মানুষের। জীবন-মৃত্যুর রহস্যময়তায় নিয়তিবাদ ও অস্তিত্ব চেতনার যুগল সমাবেশ ঘটেছে ইলিয়াস সাহেবের গল্পে। জীবনের জন্য বেঁচে থাকার প্রতিনিয়ত সংগ্রাম কিংবা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে অমর করে তুলবার অবারিত প্রয়াসই আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের গল্পের মূল উপজীব্য। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনরূপী পথকে তিনি আরও প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশের মতই মৃত্যুকে তিনি ইতিহাসভুবনে নবীনরূপে স্বীকার করেছেন —

> "নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
> অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন"।[৫]

তথ্যসূত্র :

১) তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রাবণের সেই বাইশ তারিখ', আনন্দবাজার পত্রিকা (রবিবাসরীয়), পৃষ্ঠা-১।
২) আখতারুজ্জমান ইলিয়াস, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', অন্য ঘরে অন্য স্বর, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,নবম মুদ্রণ- ২০২২, পৃষ্ঠা-১৬।
৩) আখতারুজ্জমান ইলিয়াস, 'কান্না', জাল স্বপ্ন,স্বপ্নের জাল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,নবম মুদ্রণ -২০২২, পৃষ্ঠা-৩৯১।
৪) আখতারুজ্জমান ইলিয়াস, 'পিতৃবিয়োগ', খোঁয়ারি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা,নবম মুদ্রণ- ২০২২, পৃষ্ঠা-১৪৮।
৫) জীবনানন্দ দাশ, 'সময়ের কাছে', মহাপৃথিবী, ভারবি , চতুর্দশ মুদ্রণ-২০১৪, পৃষ্ঠা-৯১।

স্নি গ্ধ দী প চ ক্র ব র্তী

নিরামিষ জীবন ও আমিষ রান্নার দ্বন্দ্ব : বাসুদেব দাশগুপ্ত-র ‘রন্ধনশালা’

বাসুদেব দাশগুপ্ত-র প্রথম গল্পগ্রন্থ রন্ধনশালা। বাংলা ছোটগল্পের ঘাড়ে তা আকস্মিক কিন্তু উজ্জ্বল একটা ধাক্কার মতো ছিল। বাঙালি তক্মাপ্রিয় জাতি। যে বাঙালিপ্রতিভা নজরুল ইসলামকে ‘বিদ্রোহী’ বানিয়েছিল, তা-ই বাসুদেবকেও ‘হাংরি’ করে ছেড়েছে। সুচেতন পাঠক জানবেন এ একটা কেবলিকৃত ছাপ্পা। নজরুল শুধু বিদ্রোহী নন প্রেমিকও। তেমন বাসুদেবও more Writer than a Hungrian. লেখক বাসুদেবের সন্ধান পেতে হলে প্রথমেই তাঁর পিঠের অযাচিত হাংরি সিলটা মুছে দিতে হবে। হাংরি খোলসটা ছাড়িয়ে ফেলতে হবে ঠিক যেভাবে রন্ধনশালা গল্পের কথক নধর ভেড়াটির ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তারপর বাসুদেবে প্রবেশ ও বাসুদেব আবিষ্কার।

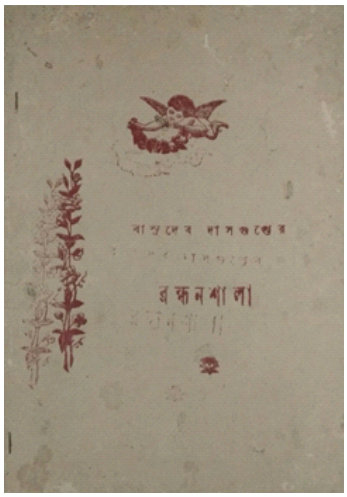

অবিভক্ত দেশে তাঁর জন্ম। বেড়ে উঠেছেন পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভেতর। নাবাল চোখে দেশভাগ দেখেছেন। জেনেছেন ক্ষুধা ও ক্ষুধার্তের মধ্যে সম্পর্কের স্পর্শকাতরতার দিকটি। খাদ্য আন্দোলন দেখেছেন। দেশভাগ, স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ক্ষুধা একদা এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক খোলনলচে কেমন বদলে দিয়েছিল দেখেছেন। এই বদলে যাওয়া ও বদলাতে থাকা ক্ষুধা-মানচিত্রেই তাঁর চলা-বসা। তাই বলেন “আমার ক্ষুধা ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তির ক্ষুধা।”

খাদ্য আন্দোলনের প্রথম ঝাপটা এসেছিল ১৯৫৯-এ। ওই বছর ৩১ আগস্ট পুলিশি নিধনে আশি জনের মৃত্যু হয়। প্রবল আফটার শক নিয়ে খাদ্য আন্দোলন ফিরে আসে ১৯৬৬-তে। আবার শুরু হয় রাষ্ট্রের দমন অভিযান, নিহতের সংখ্যা এবার পঞ্চাশ। বাসুসেব দাশগুপ্ত তাঁর রন্ধনশালা গল্পটি লেখেন এর মধ্যবর্তী সময় ১৯৬১-তে। লিখেছিলেন ১৯৬২-র ‘শারদীয় হাংরি জেনারেশন’-এর জন্য। শেষমেশ পত্রিকাটি প্রকাশিত না হওয়ায় পবিত্র বল্লভ তাঁর ‘উপদ্রুত’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ করেছিলেন, ১৯৬২-তেই।

১৯৬৫-র মে-তে ক্ষুদ্র গদ্যদেহে আত্মপ্রকাশ করে লেখকের রন্ধনশালা গল্পগ্রন্থটি। লেখকের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত এটিই একমাত্র গল্প-সংকলন। নামগল্প রন্ধনশালা। প্রচ্ছদের বানানে লেখকের পদবীতে দন্ত্য ‘স’ ছিল। ভেতরে অবশ্য ‘বাসুদেব দাশগুপ্তের রন্ধনশালা’-ই

ছাপা হয়েছিল। বইটি প্রকাশ করেছিলেন কবি উৎপল কুমার বসু তাঁর ২৩, রয়েড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ ঠিকানা থেকে। লেখকের ঠিকানা মুদ্রিত ছিল ১৪এ, শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২। মূল্য: এক টাকা। মোট চারটি গল্প ছিল এতে রন্ধনশালা, রতনপুর, বমনরহস্য ও বসন্ত উৎসব। রন্ধনশালা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩-তে। 'বিদ্বোৎসাহী প্রকাশ'-এর তরফে প্রতিভা দত্ত প্রকাশ করেছিলেন বইটি। বিনিময়: সাতটাকা। এই সংস্করণে একটি নতুন গল্প সংযোজিত হয় দূরবীন।

রন্ধনশালা-য় ঢুকে পড়বার আগে এর উৎসর্গপত্রটি একটু পড়ে নিতে হবে আমাদের: "আগুনজ্বলা রিংয়ের ভিতর দিয়ে খাঁচার বাঘ লাফিয়ে পড়ল। আর আকাশফাটা করতালির শব্দ বাধা দিল না। কাউন্টারে আর বিক্রি হল না তিন আনা চার আনা টিকিট। খেলা শেষ হতে সামনের মাঠে ধান ছড়িয়ে সার্কাসের পাখিগুলোকে খাওয়ালেন ম্যানেজার মশাই। খাওয়া শেষ হলে সার্কাসের পাখিগুলো ছুটি চায় তিন মাসের। ওরা ঘুরবে দশ সমুদ্র আর সাত মহাদেশ। ওদের পায়ে রুপোর মল ঝুমঝুমিয়ে ওঠে। আমারও ছুটি দরকার। আমারও মনের পড়ল আমাকে মায়ের জন্য কিনতে হবে আলতা, সিঁদুর, আর মনোহারী ফিতে। আজ বুধবার। দূরের গাঁয়ে হাট বসেছে। খেলা দেখাবার লাঠিখানার বদলে বাঘের কাছ থেকে আমি লাল কম্বলের জামাখানা ধার করলুম। নতুন জামায় রংচং সেজে হাটে যাই। হাটের লোকেরা আমার জামা দেখে ভাবে আমি নাকি বাঘ? সওদা নিয়ে তাই সকলে চলে যায়, দৌড়ে পালিয়ে যায়। আমার হয় না কেনা আলতা, সিঁদুর, আর মনোহারী ফিতে। মাঠের ওপারে তালগাছের মাথার অন্ধকার ঘন হয়ে নামে। ছুটির মেয়াদ ফুরোলে আমি ফিরে চলে আসি। এসে দেখি বাঘ নিজেই এখন খেলা দেখাচ্ছে খুব। ও এখন নিজেই নিজের রিং মাস্টার। খেলা দেখাবার লাঠিখানা এখন ওর হাতে। রিংয়ে ঢুকবার পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে ওর খেলা দেখি।"

শাসনতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকতে-থাকতে শাসিত বিপ্লব ভুলে যায় এবং নিজেও শাসক হয়ে ওঠার বাসনার মধ্যে মুক্তি খোঁজে। তন্ত্রের বৃত্ত থেকে তার আর বাইরে যাওয়া হয় না। গ্রহ যেমন নক্ষত্রকে ঘিরেই জন্ম-মৃত্যু পাক খেতে থাকে, অভিকেন্দ্র বল তাকে ছেড়ে যেতে দেয় না। তেমনই আমাদের জীবন গ্রহের জীবন, গ্রস্থ জীবন। তারার জীবন হল তাহাদের। আবার ঘড়ির বিবর্তমান বাস্তব তাহাদেরও একটা সময় অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে নিয়ত ও সর্বত জুড়ে না থাকতে পারলেই অন্য কেউ এসে সেই শূন্যস্থানের দখল নেয়। তখন মনে হতে পারে অসত্য খাঁচার জীবন এতটাও নির্মম ছিল না, সত্য আকাশের জীবন যতখানি।

'রন্ধনশালা'

বাসুদেব দাশগুপ্ত-র প্রথম লেখা গল্প রন্ধনশালা। তখন লেখক ভবানীপুর টিউটোরিয়ালে পড়িয়ে খালাসিটোলা ঘুরে পাইকপাড়ার মেসে ফেরেন রাত ১২টায়। পরিবার-পরিজনের

কাছ থেকে দূরের ব্রাত্যজীবন যাপন করছেন। আবার সদ্য স্বাধীন দেশে আর্থ সংকট ক্রমশই ঘুলিয়ে উঠছে। গল্পটি সেই টালমাটাল সময়ের লেখা। এখানে ব্যক্তির চোখে ব্যক্তি, ব্যক্তির চোখে সমাজ দুই দেখাই রয়েছে। গল্পটা শুরু হয় হায়ার্কির এক হিংস্র চিত্র দিয়ে। গল্পের কথক বনের ধারে চরে-বেড়ানো ভেড়ার একটা বাচ্চাকে ধরে তার ঘাড় মটকে দিয়েছেন। ঘাড়ের হাড় ভাঙার আওয়াজ ভাঙনকে তীব্র করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় "মুটমুটমুড় মুড় মুড় এই সরল অথচ বীভৎস ধ্বনিই গল্প-পরবর্তীতে কথকসত্তার পাড় ভাঙার জন্য প্রতীকী হয়ে উঠবে। ভেড়াটার ঘাড় থেকে রক্ত ছিটকে কথকের মুখে, ঠোঁটে, নাকে এসে লাগে। কথক তা নির্বিকারভাবে গ্রহণ করে। কথকের অতীতচারণ থেকে আমরা জেনেছি তার থাকবার ঘরটা বরফে তৈরি। জানলা নেই। ভীষণ অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। আশেপাশের বিস্তীর্ণ তল্লাটে জনবসতি নেই। একটা ঘরই বসবার ঘর, থাকবার ঘর আর রান্নার ঘরের ভূমিকা পালন করে। ঘরের পেছনে একটা নদী। বিবরণটির মধ্যে উদ্বাস্তুচেতনা আছে। আছে খাঁচা-ভাঙা অন্তরালবাসের কথা। ব্যক্তিজীবনে লেখক নিজেই উদ্বাস্তু। তাই উদ্বাস্তুজীবন লিখতে তাঁকে গল্প বানাতে হয় না। বরফের ঘর বলতে ছেলেবেলার ভূগোলে পড়া এস্কিমোর কথাও মনে আসে। এস্কিমো প্রান্তিক, তার বাস মেরুদূরে; প্রান্তিক উদ্বাস্তুও। তাছাড়া বরফের ঘর যে-শৈত্যের কথা বলে, একজন উদ্বাস্তুর জীবনও তেমনই সকলরকম সামাজিক উষ্ণতাবিযুক্ত। উদ্বাস্তুর ক্ষুধা জানে খুৎকাতরতার গর্ভেই খুন শরীর পেতে থাকে। এখানে আরেক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় রবীন। রবীনের কাছে ভেড়া মারার ব্যাপারটা নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। আবার রবীনের এই মনোভাব কথকের কাছে মনে হয় ন্যাকামি। পাতাহীন একটা গাছে এসে-বসা দুঃখী পাখির ওড়াউড়ির চিত্রে ও 'এখন জরুরী অবস্থা' উচ্চারণে যে পরাবাস্তবতার আভাস ছিল, সেই ফ্রেম ছিঁড়ে ফেলে ক্ষুধার তাড়নায় কথক ও রবীন বাস্তবের রন্ধনপ্রক্রিয়ায় নেমে আসে। ভেড়ার রোস্ট রান্না যে-মুহূর্তে শেষ হয়, ঠিক তখনই বিকট চেহারার পাখিটা দুঃখী গলায় কেঁদে ওঠে। ধানসিড়ি নদীর পাশে চিলের করুণ কান্না শুনে বেতের ফলের মতো তাঁর বিশেষ মানুষটির ম্লান চোখ কবির মনে এসেছিল। এখানে তা হয় না। বরং কথকের চোখদুটো জ্বালা করতে থাকে। সহসা শূন্যতার বোধ তাকে শূন্য করে দেয়। পাখির ক্রেংকারকে যেন মনে হয় নিষেধকালের সাইরেন। এতকাল দেয়ালের শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থেকে তবু আজ রান্না মাংস ছুঁয়ে দেখবার আগ্রহ থাকে না। রবীনই প্রথম বলে "খেতে ইচ্ছে করছে না আমার", একটু থেমেই আবার বলে "আমরা তো তবু শ্যাওলা খেয়ে কাটাতে পেরেছি, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনীর জন্য তো সেটুকুও রইল না।" গল্পের উপান্তে এসে রবীনকে কেন যেন কথকেরই দ্বিতীয় সত্তা বলে মনে হয়। রবীনের বয়ানে আসলে কথকেরই সামাজিক পিতৃত্ব কথা বলে ওঠে। দু'জন তখন তোলপাড়-করা ভেড়ার রোস্টের ঘ্রাণের প্রলোভন অগ্রাহ্য করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি, শিং, চামড়া সব গোগ্রাসে গিলতে থাকে। এই দৃশ্যের

সাযুজ্যে চার্লি চ্যাপলিন (Charlie Chaplin)-এর দ্য গোল্ড রাশ (The Gold Rush) ছবির একটি দৃশ্য কারও মনে পড়তে পারে। একটি থালায় ভেড়ার রোস্ট ঢাকা দেওয়া পড়ে থাকে। থালাটাকে ঘিরে তারা বসে থাকে জীর্ণ বৃদ্ধের মতো। এ এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বময়তা। একদিকে আত্মকাম, একদিকে পিতার চেতনা; একদিকে বর্তমানের ক্ষুধা, একদিকে ভবিষ্যভাবনা। এর টানা ও পোড়েন তাদের ছিঁড়ে ফেলতে থাকে ভেড়াটারই মতন। বাস্তবতা ও মানবতা, সুন্দর ও কুৎসিত, ব্যক্তিসুখ ও সমাজনিষ্ঠার ডবল ফোঁড়ে লেখক ফুটিয়ে তোলেন যুগপৎ জীবনের ঘৃণাকর ও করুণাকর ক্যানভাসটি।

'বমনরহস্য'

লেখকের দ্বিতীয় গল্প এটি। প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-তে। সুকুমারের বিয়ে নিয়ে গল্প। অথচ বিয়ে-নামক সামাজিক অনুষ্ঠানের লৌকিক সৌন্দর্যকে লেখক সচেতনভাবে আক্রমণ করে গেছেন। আপ্যায়নকারী, অভ্যাগত সবাই উচ্ছৃঙ্খল। সুকুমারের বাবা ও শ্বশুরমশাই মাতাল হয়ে ময়রার দোকানে যান, সুকুমারের বাবা গরম তেলের কড়াইতে ঝাঁপ দেন। কারিগর তাকে উল্টেপাল্টে ভাজে। পুলিশ আসে। কথক ছুটতে-ছুটতে চারতলা এক বাইজি বাড়ি গিয়ে পৌঁছন। পরক্ষণেই কথকের চটকা ভাঙে। বাইজি বাড়ি নয়, তিনি আসলে একটা মাংসের বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে গরু, মোষ, শুয়োর, হরিণ, হাতি এমনকি মানুষের মাংসও মিলছে। পাঠকের রোম্যান্টিক সত্তার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও চূর্ণ হয়ে যায় লেখকের বর্ণনাকৌশলের এই আচমকা ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে। সাইনবোর্ডে লেখা 'এইখানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়।' বা 'এইখানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়।' কিংবা 'এইখানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়।' হৈমন্তী সুকুমারের বৈমাত্রেয় বোন, চম্পা সুকুমারের শ্যালিকা। একটু আগেই এই চম্পাকে দেখেই 'খাসা মাল' মনে হয়েছিল কথকের। বউয়ের প্রতি সুকুমারের ভালোবাসা দেখে কথক খেঁকিয়ে উঠে তাঁর কীর্তির কথা জানান দিয়েছিলেন "তোর বউ তো আমারই হাতের তৈরি।" মাঝবেয়েসি চুনীবালার 'আঁটোসাঁটো শরীর' দেখেও তাঁর পিপাসা জেগেছিল! এখন মাংসহাটায় ঝুলন্ত রক্তাক্ত নারীদেহ দেখে কথক ও পাঠকের পণ্যপ্রবণতা একসাথে আহত হয়। ছালছাড়ানো মানুষগুলো যখন জিভ বের করে নিজেদের শরীর বেয়ে নামা রক্ত চেটে খেতে থাকে, তখন কথকের শরীর পাক দিয়ে ওঠে। আলো অন্ধকার গুলিয়ে যায়। 'ওয়াক থু' শব্দে বমি করে ফেলেন পথের ওপরে। কথকের কথায় "সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবনভোর ধরে খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগরে বার করতে থাকি। বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।" আমাদের শৌখিন জামাকাপড়ের, প্রসাধনী ত্বকের অস্তিত্বকে লেখক বালিশ ফেঁড়ে দেখান। আমাদের বোধ ও পাঠের স্থিরতা ভয়সমুদ্রে দুলে ওঠে এক বিপন্ন জাহাজের মতো।

'রতনপুর'

তাঁর তৃতীয় গল্প 'রতনপুর' প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৪-তে। উদ্বাস্তু জীবন ও মূলগত হৃদয়ের সংঘাত গল্পের নায়ক নীলুকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। উদ্বাস্তু মানুষ তার ছেড়ে-আসা দেশ-গ্রাম ভুলতে পারে না। শ্রী দাশগুপ্তের লেখকসত্তা যেমন পারেনি। পারেনি এ-গল্পের কথক নীলু। মনে হবে বাসুদেবই নীলু, নীলুই বাসুদেব এবং রতনপুরই মাদারিপুর (লেখকের জন্মভূমি)। মাদারিপুরের খেলনা-দিনগুলি ভুলতে পারেননি লেখক। জীবনানন্দ, অরবিন্দ গুহ-রা বরিশালকে ভুলতে পারেননি মৃত্যুর আগক্ষণ অবধি। তিনিও। বাসুদেব দাশগুপ্ত তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে হারানো দেশগাঁ নিয়ে ছলোচ্ছল হয়েছেন ঋত্বিক কুমার ঘটকের সিনেমার ফ্রেম কেন তাঁর এত পছন্দ সে-প্রসঙ্গে। কলেজস্ট্রিট কফি হাউসে 'রতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক আয়োজিত নববর্ষ উৎসব'-এ কথক হঠাৎ এসে পড়েছেন। সেখানে তাঁর বাল্যপ্রেমিকা রুমকি, রুমকির দিদি শেফালিদি, ছোট বোন চুমকি সবার সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। কিন্তু বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। রুমকি এখন বিবাহিত। শেফালিদির ছেলে হয়েছে। কথক একদা শেফালিদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, রুমকি বইয়ের মধ্যে নীল চিঠিতে করে কথককে ভালোবাসা পাঠিয়েছিল একদিন। রুমকির কপালে এখন লাল সিঁদুরের টিপ ভীষণ জ্যান্ত ও জোরালো হয়ে আছে। কফিহাউস ও রতনপুর কথকের চোখে পরস্পরের সাপেক্ষে ইন্টারকাট হয়ে দাঁড়ায়। রতনপুরের সঙ্গে নীলুর এখন অনেক দূরত্ব। রতনপুরের নতুন প্রজন্ম নীলুকে চিনতে পারে না। নীলু এখানে অনধিকার প্রবেশকারী। তাই চুমকিকে ভালোবাসাও অপরাধ। ছোটবেলার বাস্তব এখন ফ্যান্টাসি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। রতনপুরের তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে প্রহৃত হওয়ার পর দারুণ ভয়ে কথক জড়োসড়ো হয়ে গেলে চুমকি আশ্বস্ত করে তাকে। শক্ত করে কথকের হাত আঁকড়ে ধরে। চুমকি কথকের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিঁটিয়ে কথককে ছোট করে দেয়। অবন ঠাকুরের বুড়ো আংলা ছোট হয়ে কাকের পিঠে চড়ে বিশ্বদর্শন করেছিল। এখানে রতনপুরই কথকের বিশ্ব। চুমকির বুকেই স্বর্গ। তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাওয়ার তার প্রয়োজন নেই। চুমকি তাকে চুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। উৎসব শেষ হওয়ার পর সকলে সিঁড়ি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে শুরু করে। চুমকিও। কথকও চুমকির বিদিশার নিশার মতো চুলের ভিতরে করে। তখনই কীভাবে ধাক্কা লেগে চুমকির বেণিতে টান পড়ে। চুলের রিবনের বাঁধন খুলে গিয়ে আলগা হয়ে কথক নিচে পড়ে যান। তারপর গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার শব্দ। চুমকিরা চলে যাচ্ছে। রতনপুর, চুমকি সব খানিক সময়ের জন্য রক্তমাংসের হয়ে উঠেছিল কথকের কাছে। এখন আবার তা ধূসর অতীত হয়ে যাচ্ছে। কথক সিঁড়ি ভেঙে ফুটপাথ অবধি আসেন। চুমকিকে নিয়ে একটা মোটরকার গাড়লের মতো কাশতে-কাশতে চলে যাচ্ছে। গাড়ির পিছনের লাল আলোটা ছোট হতে-হতে একটা সিঁদুরের টিপের মতো হয়ে এসে কথকের চোখের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সামুদ্রিক পাখির ডানা ঝাপটানোর ক্লান্তিকর শব্দ

গোলদিঘির শান্ত জলকে, কফি হাউসের দেয়ালগুলিকে বিদ্ধ করতে থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের স্বপ্নে প্রতীকী গ্রাম হয়ে যা ধরা দেয়, তা'ই রতনপুর। মানসবিশ্বে তার ভরা ভূগোল আছে, ক্ষমতাবিশ্বে তা নিছক মরা ইতিহাস।

'বসন্ত উৎসব'

এটি বাসুদেব দাশগুপ্ত-র চতুর্থ গল্প। যুবক কথকের মনের অসুস্থ আলো গল্প-পটটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভাঙে কথকের। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে সে দুর্বল। তবু মণিকা তার উলঙ্গ শরীরটায় হাত বুলোতে শুরু করলে সে 'আইসক্রিমের মতো' গলে যেতে থাকে। বিছানার তোশক ভিজে ওঠে। মণিকা তাকে পিতলের গামলায় বসিয়ে দেয়। কথক সেই গামলার মধ্যে গলে জল হয়ে যায়। কথক দেখে মণিকা রাক্ষুসির মতো তাকে চুমুক দিয়ে গিলে খেতে আসছে। ভয়ে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। ভোর হলেই পৌষমাসের কড়া শীত টপকে উপস্থিত হয় মণিকার ঘরে। সেখানে বিস্ময়, বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে দেখে অবিকল তারই মতো দেখতে একটা লোক মণিকার সঙ্গে সঙ্গমে রত। কথক লোকটির চলে যাওয়া অবধি প্রথমে অপেক্ষা করে। পরে মণিকার সঙ্গে সঙ্গম করে। তারপর মণিকাকে খুন করে। ফ্রয়েডীয় জটিলতা দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায়। কামতাড়নার সঙ্গে এক ধরনের ধ্বংসাত্মক মনোভাব মিশে যৌনতাকে কখনও-কখনও খরস্রোতা করে তোলে। তখন যৌনতাকে শিল্প বলা চলে না, বলতে হয় ক্রিয়া। যৌনতা বদলে রিরংসার রূপ পায়। এ-গল্পের কথক কথক স্যাডিস্ট ক্যারেকটার। সমরেশ বসু-র বিবর-এর নীতা ও তার পরিণতির সঙ্গে মণিকার মিল খুঁজে পান সমালোচকেরা। তা নীতার সঙ্গে মণিকার মিল, মণিকার সঙ্গে নীতার নয়। বিবর-এর আগেই বসন্ত উৎসব লিখিতও প্রকাশিত হয়েছিল। মণিকার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে শংকরের প্রেমপত্র আবিষ্কার করে কথক। ঘটনাচক্রে শংকর কথকের বন্ধু। কথক এরপর শংকরকে খুন করবার ইচ্ছা নিয়ে শংকরের বাড়িতে যায়। শংকরের বাড়ির পুবদিকের দেয়ালে নামজাদা শিল্পীর আঁকা টাঙানো। তিন-চারজন পুরুষের দ্বারা একটি নারীর ধর্ষণ: ছবির বিষয়। ছবির পুরুষের মুখগুলোকে জন্তুর মতো লাগে কথকের। শংকরকে খুন করবে বলে বুক শেলফের পাশে রাখা লোহার রডটা হাতে নিতেই কুকুর টম চেঁচিয়ে ওঠে। কথকের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। হাত থেকে শব্দ করে পড়ে যায় রডটা। বিফল হয়ে কথক এরপর মেলায় চলে যায়। মেলায় শিশুদের নাগরদোলায় চড়তে দেখে কথকেরও চড়তে সাধ হয়। নাগরদোলা থেকে তার চোখে পড়ে দূরে একটা হ্রদ। হ্রদে নৌকো। নৌকোয় সুসজ্জিত তরুণীরা। হ্রদের ধারে বড় গাছের নিচের ঘাসে রুমাল পেতে সে বসে পড়ে। একটা নৌকো থেকে একজন পরি তাকে ডাকে 'নীলু দা-আ-আ'। কথক কি রতনপুরের সেই নীলু? মেয়েটি কি রতনপুরেরই কেউ? কথক চিনতে পারে অমলের বোন আরতি। আরতির নৌকো তাকে তুলে নিতে এগিয়ে আসে। এই গল্পে মানবমনের দ্বৈত জগতের

প্রতিফলন ঘটেছে। একদিকে অন্ধকার, যৌন ঈর্ষা, শরীরের অধিকারবোধ ও শ্রীহীনতা; অন্যদিকে ফুল, ফুলপরি, মুক্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্য যেন ঘূর্ণায়মান নাগরদোলাটির মতোই কথককে ওঠায়-নামায়। আরতি এখানে মণিকার বিপরীত চরিত্র। ক্লেদাক্ত জীবনের গ্লানি থেকে কথককে উদ্ধার করতে সে যেন নোয়ার নৌকো হয়ে আসে। ওদিকে অন্যান্য নৌকো থেকেও সুন্দরের আহ্বান শুনতে পান কথক। ওরা সুন্দর, আরতি আপন তাই সুন্দরতর। হ্রদের ঢেউ উত্তাল হয়। ফুলপরিদের শাড়ির গোলাপি আঁচল ফুলে ওঠে। কথক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। সুন্দরের ডাক তাকে আবিষ্ট করে। নিদ্রিত পাখিরা এখন ডানা ঝাপটে উড়ে যেতে থাকে। আর কথকের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে আরতির নৌকো।

'দূরবীন'

১৯৬৪-তে লেখা এ লেখাটি লেখকের পঞ্চম গল্প। গল্পের নায়ক অমল পাইকপাড়ার ৩০ নং খেলাতবাবু লেনে একসময় বাস করত। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মাসতুতো বোন তপতীকে সে ভালোবাসত। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবেশে এ এক অসম্ভব চাওয়া। একদিন বন্ধু শোভন তাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখায় একটা দূরবিন ওদের বাঁকুড়ার বাড়ির একটা পুরনো কাঠের সিন্দুকে পেয়েছে। দূরবিনটার বৈশিষ্ট্য হল চোখে লাগালেই দৃশ্যগুলো জীবন্ত হয়ে যায়। অমল শোভনের কাছ থেকে দূরবিনটা দিন সাতেকের জন্য ধার করে আনে। সেটা চোখে লাগিয়ে সে অনেককিছু এমন দেখতে পায় যা সে মনে-মনে মানতে পারে না। অমলের মানসিক স্থিতি কোনওদিনই দুর্বার ছিল না। তপতীকেও সে একান্তভাবে পায়নি। অমল অসুস্থ হয়ে পড়ে। চারপাশের লোকজন সম্পর্কে তার কৌতূহল বাড়ে। অথচ আগে কখনও প্রতিবেশী ভাড়াটেদের নিয়ে তার আগ্রহ দেখা যায়নি। বরং একতলার ভাড়াটে বরদা বাবুর স্ত্রী যখন মেয়ে লতিকাকে দিয়ে অমলের জন্য রান্না-করা খাবার পাঠিয়ে দেন, তখন "এই ধরনের বাঙালিপনায় অমলের খুব অস্বস্তি হয়।" এহেন অমল দূরবিন দিয়ে সেই তাদেরকেই দেখতে শুরু করে, পরে দূরবিন ছাড়াও। অমল ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়ায়। নার্স জয়ন্তবাবুর বৃদ্ধ বাবাকে ম্যাসাজ করছে দেখে। বৃদ্ধের হিমচোখ দেখে অমলের গা শিরশির করে। দূরবিন দিয়ে দেখে শ্যামাদাস বাবু, শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী ও ৬ মাসের বাচ্চাটিকে, দেখে বাড়িওয়ালি জয়শ্রী দেবীকে। সে-রাত্রে অমল স্বপ্নে দেখে তার মৃত্যু হয়েছে। নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে চন্দন মাখিয়ে সে খাটে শোয়ানো। আত্মীয়স্বজন তার মরদেহ ঘিরে খুব কান্নাকাটি করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল তাদের মধ্যে অমল নিজেও দাঁড়িয়ে আছে। মানে জ্যান্ত অমল অমলের মড়াকে দেখছে। তারপরেই একদিন রাতের দূরবিনে জয়ন্তবাবুর বুড়ো বাবাকে নার্সের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে সে। তখন তপতীর কথা মনে পড়ে যায়। কল্পনায় দেখে তপতীর সঙ্গে স্টিমারে গোপালগঞ্জ থেকে মাদারিপুর যাচ্ছে সে। নদীর দু'ধারে গ্রাম, সরষেখেত, ডালখেত, কলার ঝাড়; ঘোমটা-দেওয়া বউ কলসি কাঁখে নিয়ে নদীর পাড়

দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু তার দূরবিনে নজরদারির ব্যাপারটা শীঘ্রই জানাজানি হয়। কেউই ভালোভাবে নেয় না বিষয়টিকে। নেওয়ার কথাও তো নয়। জয়শ্রী দেবী অমলকে ডেকে পাঠিয়ে ওর এই উঁকি-মারা স্বভাবটা নিয়ে রহস্যঘন আলাপ করেন। একদিন রাত্রে শ্যামাদাসবাবু, বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তপতী, জয়শ্রী দেবী-সহ আরও অনেকে মিলে ছাদে আড়ি-পাতা অমলের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তপতী দূরবিনটা চোখে ধরে জ্বলন্ত অমলকে দেখতে থাকে। দূরবিনের দেখায় অমলকে লাগে বিকটাকার এক দৈত্যের মতো। মাথার চুল ফুঁড়ে দু'টো শিং বেরিয়েছে। ঠোঁটের ওপর দু'টো গজদন্ত। শরীর ধূসর লোমে ঢাকা। আগুনে লোম-পোড়ার শব্দ তপতী কান পেতে শোনে। তপতী এবার দূরবিনটা নামিয়ে রেখে খালি চোখে উপস্থিত লোকেদের উল্লাসময় নিষ্ঠুর মুখগুলো দেখে। তারপর দু'হাতে অমলকে বুকে জাপটে ধরে। আগুন দ্বিগুণ হয়ে পোড়াতে থাকে দু'জনকেই। এ-গল্পের দূরবিন প্রতীক। সাধারণ চোখের দেখাকে তা ডাইমেনশনাল করে তোলে। দূরবিন তা'ই দেখায় যা সাধারণত দেখা যায় না কিংবা যা দেখা উচিতও নয় হয়তো। দেখে ফেললেই আমাদের সঞ্চিত প্রজ্ঞার সকল পাথরে ফাটল ধরে যাবে। বেঁচে থাকাকে মনে হবে অর্থহীন। অমল আর তপতী দু'জনেই আসক্তিভরে দূরবিন দেখেছিল, তাই গল্পের শেষে দু'জনেই পুড়ে যায়। শোভনও দেখেছিল কিন্তু নিরাসক্তভাবে। নইলে সহজেই সেটা অমলকে ধার দিতে পারত না। তাই শোভন বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে শ্যামাদাসবাবু, জয়শ্রী দেবীর মতো মানুষরা যাদের একটা দূরবিন ছিল না বা যারা দূরবিনে চোখ রাখেনি। কে জানে ঋতুপর্ণ ঘোষ-এর সিনেমা (২০১৩ খ্রিঃ)-র সানগ্লাস-এ বাসুদেব দাশগুপ্ত-র গল্প (১৯৬৪ খ্রিঃ)-এর দূরবীন ছায়া ফেলেছে কিনা!

বাসুদেব দাশগুপ্ত-র রন্ধনশালা-র গল্পগুলিতে যৌনতার অনুষঙ্গ এসেছে, বারবার এসেছে জননী-জন্মভূমির কথা। এ-সবই তাঁর চর্মচোখে দেখা মর্মলোকে অনুধাবিত বাস্তব। তিনি লেখেননি, এঁকেছেন। লেখক বলতেন তাঁর বেঁচে থাকা ক্ষেতের ইঁদুরের মতো মাঝে-মাঝে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুখে কিছু ধান নিয়ে ফের গর্তে ঢুকে পড়ার মতো। মানুষের আদত সংস্কারহীন চেহারাটা হয়তো এমনই আমাদের স্মৃতি, যৌনতা, কামনা, অবভাসগুলো ইঁদুরের মতোই কোনও-কোনও শীতের রাতে খুদ মাখতে বেরোয়, আবার সেঁধিয়ে যায় শীতে। আদতে অব্যবহৃত রন্ধনশালা হল অবদমনের প্রতীক। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি রন্ধনশালা থাকে যা বন্ধ থাকে, ব্যক্তির পোশাক বা সমাজসুখের কারণে যাকে বন্ধ রাখতে হয়। রন্ধনশালা-র কথক কৌটো, কাচের বয়ম, গাওয়া ঘি, ধারালো বঁটি, শিলনোড়া, হাড়ি, কড়াই, থালা, বাটি, হাতা সবকিছু সংগ্রহ করেও এবং রন্ধনপদ্ধতির খুঁটিনাটি (যেমন করমচা দিয়ে সরষে-ইলিশ রান্না) জেনেও, রেসিপি লিখে রেখেও তাই অবলীলায় রবীনকে জানায় "রান্না একদিনও করিনি, করব। আপাতত ওই দেয়ালের শ্যাওলা খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছি।" মানুষের জীবন তো এমনই বদ্ধ স্যাঁতসেঁতে, শ্যাওলার ঘরের

মতো! বাসনপত্র ধুয়ে রন্ধনশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখার নামই জীবনধারণ। জীবনযাপন প্রভৃত রন্ধনলিপ্সা নিয়ে বেঁচে থাকা। রন্ধনশালায় আগুন জ্বললেই সব স্থিতি ও নীতির ঘেরা ভিত থেকে টলে উঠবে। রন্ধনশালা গল্পের কথক তাই দেখে "সূর্যের প্রখর তাপে গলেনি সেই ঘর, আমাদের সেই সাধের ঘর এই আগুনের হলকায় গলতে থাকে।"

রতনপুর-এর নীলু, বসন্ত উৎসব-এর কথক (নীলু) বা দূরবীন-এর অমল এদের প্রত্যেকের ভেতরেই একটা করে বন্ধ রন্ধনশালা ছিল, ভীষণ অসুখে তা খুলে গেল বলেই সবকিছু ধ্বংস হল, গোবিন্দলালের বাগান যেমন ধ্বংস হয়েছিল! আর এখানেই রন্ধনশালা নিছক একটি গল্পনাম না থেকে হয়ে ওঠে গ্রন্থনাম।

দে ব প্রি য়া সে ন

বিপন্ন সময়ের প্রতিচ্ছবি : প্রসঙ্গ ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি'

সৃষ্টির প্রথম থেকে এক দীর্ঘ লড়ায়ের পর মানুষ আজ নিজেকে উন্নততর জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সেই লড়াই এখনো চলছে এবং আগামীতেও চলবে। আদিম যুগে মনুষ্যজাতির বেঁচে থাকার লড়াইটা ছিল, বনের হিংস্র পশু ও প্রকৃতির বিপর্যয়কে অবদমন করার লড়াই। কিন্তু বর্তমানে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার অর্থই যেন হয়ে উঠেছে, পাশের মানুষকে নিচু করা বা অবদমিত করা। আমরা নিজেদেরকে যতই আধুনিক রুচিসম্পন্ন বলি না কেন, আমরা কি এখনো সভ্য হয়ে উঠতে পেরেছি? নাকি একপক্ষ যত উন্নত হয়েছে, অন্যপক্ষ ততই তলানিতে ঠেকেছে অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষ চিরকালই শোষিত, অবহেলিত। আগে তারা জমিদার, জোতদার, মহাজন দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু সেই শোষণ ছিল জনসমক্ষে। এখনকার মানুষরা বা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা যে লুণ্ঠন চালাচ্ছে, তা আড়ালে আবডালে। অশিক্ষিত লোকেদের পক্ষে জনসমক্ষে হওয়া চুরির থেকেও ভয়ঙ্কর হচ্ছে শিক্ষিত ভালোমানুষের মুখোশের আড়ালে থেকে যারা লুঠ করে। জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের পর প্রান্তিক মানুষরা একটু হলেও শান্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে বরং শান্তি নয়, আরো বড় অভিশাপ তাদের জীবনে নেমে এসেছে। পাল্টালো অত্যাচারের ধরণ, চাবুকের বদলে শুরু হল বুদ্ধির খেল, বিশ্বাসের খেল। ভালোবাসার সুড়সুড়ি দিয়ে শোষণ।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য যাত্রার ইতিহাস অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য যাত্রার কিছু ছবি লক্ষ করা যাবেই। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি পূর্বে বরাঙ্গনা বা শূদ্রদের বিক্রি করে দেওয়ার চল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে অথবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও সেই মানুষদের উপর হওয়া অত্যাচার এতটুকুও কমেনি, শুধু ধরন পাল্টেছে। নগর সভ্যতায় বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে ধন-দৌলত, নাম-যশের প্রতিযোগিতা যতই বেড়েছে, ততই এক শ্রেণীর মানুষ শোষিত হয়েছে। আর এইভাবে কিছু মানুষের খিদে মেটাতে গিয়ে তারা যেমন, একদিকে তাদের শিকড়ের মাটি হারিয়ে ফেলেছে, তেমনি হারিয়ে ফেলেছে তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতিসত্ত্বা। এমনই এক জলজ্যান্ত উদাহরণ, ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাস। ভগীরথ মিশ্র অন্যান্য উপন্যাসেও কম-বেশি জমিদার-প্রজার সম্পর্ক বা নিম্নবিত্ত মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন, কিন্তু 'আড়কাঠি' উপন্যাসটি সেই সব বিষয়কে ছাড়িয়ে এক অন্য আঙ্গিক পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠা করে।

উপন্যাসে বাঁকুড়া জেলার এক প্রান্তিক অঞ্চল গজাশিমুল গ্রামের কথা উঠে এসেছে। বাঁকুড়ার ঘোর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত গজাশিমুল গ্রামটি কয়েকঘর বসু-শবরদের নিয়ে গঠিত।

তারা আগে থাকত বিহারের তামজোড়ে। কোন এককালে জমিদারের হাত থেকে রেহাই পেতে তাদেরই কোন এক পূর্বপুরুষ পালিয়ে এসে এখানে বসবাস করা শুরু করে। বর্তমানে বত্রিশটি ঘর বসু-শবর বাস করে। তাদেরই এক প্রবীণ ব্যক্তি দশরথ ভক্তার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি তাদের সম্পর্কে। তারা কৃষিকাজ জানেনা, বনের ফলমূল, মধু খেয়ে, শিকার হিসেবে গুড়চ্যা-সাটনা প্রভৃতি মেরে তাদের জীবন চলত। শিকারের আশায় তারা একমাস, দুমাস বনে বনে ঘুরে বেড়াত। তারা এতটাই সহজ সরল ছিল যে, হিংস্র পশুদের হাত থেকে বাঁচতে তারা ভগবানকে ডাকতো অর্থাৎ আত্মরক্ষা করার পদ্ধতি ছিল তাদের অজানা, আর সেই সুযোগ নিয়েই তাদের ক্ষতি করেছে একদিকে যেমন বনের পশুরা, অন্যদিকে রঙলাল, রাজীব, ক্যাথি বার্ড, জনসনের মত অসংখ্য আড়কাঠিরা।

রঙলাল ছিল বিহারের আরা জেলার মানুষ। হঠাৎ করে একদিন এসে পৌঁছেছিল গজাশিমুল গ্রামে, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বিলাতি মদ ও পয়সা এবং সেগুলি গ্রামের লোককে বিলাতে শুরু করে। এভাবেই সে আসে, দু তিন দিন থাকে, আবার চলে যায়। আস্তে আস্তে সে গজাশিমুলের মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করে এবং আসাম মুলুকের গল্প শুনিয়ে তাদের চোখে স্বপ্নের এক রাজ্য তৈরি করে। যেখানে সুখ সর্বদা বিরাজ করে, অল্প অসুখ হলে হাতের কাছে ডাক্তার, পড়াশোনার জন্য স্কুল, হাট-বাজার, কোম্পানির মাকান সবকিছুই হাতের নাগালে। এসব শোনায় এবং বলে, "সেখানে অঢেল সুখ। বৈভব। সেখানে একবার গেলে আর ফিরে আসতে দিলচায়না।"[১] আস্তে আস্তে রঙ্গলাল সবাইকে বস মানায়, দাদনের লাল খাতায় তাদের নাম তোলে এবং পাচার করতে শুরু করে ছেলেমেয়েদের। মাঝে মাঝে তাদের নাম করে কিছু টাকা বাড়ির লোকের হাতে তুলে দিয়ে যায়। কিছু ঝাপসা ছবি দেখিয়ে তাদের ভালো থাকার কথা বাড়ির লোকের কাছে বলতে থাকে। সেই সহজ সরল মানুষগুলো তা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে।

আর এভাবেই চলছিল গজাশিমুলের মানুষদের জীবন। এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন সেখানে আসে লোকসংস্কৃতি প্রেমিক প্রফেসর মিস্টার রাজীব চৌধুরী। তাকে নিয়ে আসে তারই এক ছাত্র সুনীল। ধীরে ধীরে রাজীব পরিচিত হতে থাকে তাদের সাথে, তাদের সংস্কৃতির সাথে, এবং সে বুঝতে পারে রঙলাল কীভাবে দিনের পর দিন ঐ মানুষগুলোকে ঠকাচ্ছে। ওই প্রান্তিক মানুষেরা সহজ সরল হলেও, সহজে বিশ্বাস করতে চায় না কাউকে। বিশেষ করে শহরের মানুষদের। শহরের মানুষদেরকে দেখলে তারা বনের ভিতর লুকিয়ে পড়ে, তাদেরকে 'কাঁকড়া' বলে ডাকে। ধীরে ধীরে রাজীবের সাথে পরিচয় হয় সুচাঁদের। সেইই গজাশিমুলের একমাত্র পড়াশোনা জানা ছেলে, পুরুলিয়ার চিরুড়ি স্কুলে পড়েছে ক্লাস এইট পর্যন্ত। রাজীবের পরিচয় পেয়েও সহজে তারা ধরা দেয়নি, কিন্তু রাজীব হাল ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নয়। যেমনভাবে রঙলাল দিনের পর দিন বিলাতি মদ ও টাকা নিয়ে তাদের গ্রামে এসে থেকেছে ঠিক সেভাবে না মিশে সে পদ্ধতি বদলেছে, ঠিক যেমন রঙলালের পরিচয় দিতে গিয়ে ক্যাথি বার্ড-কে বলেছিল, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে তোমরা জঙ্গল ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে যে স্টাইলে স্লেভ-হান্টিং

করেছ, ঠিক সেই পদ্ধতিতে এখানে অবশ্য দাস-শিকার হয় না এখন। পদ্ধতি তোমরাও বদলেছ, আমরাও বদলেছি।"[২] রাজীবও যেন সুকৌশলে পদ্ধতিটা একটু পাল্টে নিল। তাদের উঠোনে চেপে বসলো, বাচ্চাদের কোলে নিল, চকলেট বিস্কুট খাওয়ালো, বয়স্ক মেয়েদের সাথে মাসি-পিসির সম্পর্ক পাতালো, আস্তে আস্তে শিক্ষিত সুচাঁদ ভক্তাকে হাতে আনল। রাজীব তাকে নিয়েই আসাম মুলকে যায় এটা দেখানোর জন্য যে, রঙলালের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মিথ্যে। তাদের পরিবারের প্রিয়জনেরা ভালো নেই। আসাম মুলুকে তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। সবার সামনে রঙলালের আসল পরিচয় জানিয়ে তাকে বিতাড়িত করেছিল। তার হাত থেকে গ্রামের মানুষদের বাঁচাতে রাজীব তৈরি করেছিল 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ' এবং তাদের নিয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। আস্তে আস্তে গজাশিমুলের বিভিন্ন লোকনৃত্যের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, আসতে থাকে সাফল্য। রাজীবের এত উৎসাহ দেখে গজাশিমুলের মানুষদের সন্দেহ যে হয়নি তা কিন্তু নয়। তারা প্রশ্ন করেছে, "তো ইয়াতে তুমার লাভটা কি মাস্টার? তুমি ক্যানে কালিজ কামাই করে পইড়্যে রয়েঁছো মোদ্যার মাঝে?"[৩] সেই প্রশ্নের রাজীব খুব সতর্কতার সাথে জানিয়েছে, "গাছে মিষ্টি আমটি পেকেছে লোক চক্ষুর আড়ালে। আমি চাই মিষ্টি আমটি দুনিয়ার তাবত মানুষ খাক।"[৪] এটাই ছিল তার প্রথম লাভ এবং দ্বিতীয় লাভ হিসেবে জানিয়েছিল রঙলালের ধ্বংস এবং তৃতীয় কারণ ছিল গজাশিমুলের দুঃখী, অসহায় মানুষগুলোকে একটু সুখ, শান্তি প্রদান করা। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় কষ্ট সেই সাধারণ মানুষরা করলেও নাম হয় রাজীবের। রাজীব আত্মহারা হয়ে দৌড়াতে থাকে সফলতার পেছনে। তার মধ্যে লোকসংস্কৃতির জন্য থাকা ভালবাসা হারিয়ে গিয়ে বাসা বাঁধতে থাকে লোভ-লালসা। ফলস্বরূপ গজাশিমুলের মানুষ এক আড়কাঠির হাত থেকে বাঁচলেও গিয়ে পড়ল আরেক আড়কাঠির হাতে। দাস ব্যবসায়ী রঙলালের হাত থেকে গজাশিমুলের মানুষদের বাঁচিয়ে তোলা এবং লোকসংস্কৃতির প্রতি বা লোকো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে তোলার উদ্যোগ সত্যিই সদর্থক। একসময় রাজীবের সেটাই নেশা হয়ে ছিল, তাও সদর্থক। কিন্তু নেশা অতিরিক্ত হয়ে গেলে যখন মানুষের চেতনা বিকার ঘটে, সচেতনতা হারিয়ে যেতে থাকে, তখন সেই নেশায় তার জীবনের চরম সর্বনাশ করে। রাজীবের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মদত দিয়েছিল ক্যাথি বার্ড, সে ছিল, "ইস্ট ওয়েস্ট ফোক ফাউন্ডেশন' এর পূর্ব ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর এবং 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করেসপন্ডেন্ট"।[৫] ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটিকে তৈরি করেছেন মার্কিন উপনিবেশবাদের এক প্রতিনিধি রূপে, মার্কিন উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের গ্রাস করার জন্য নানা সংস্থার জাল বিছিয়েছে। লোকসংস্কৃতির পণ্যায়ন-প্রক্রিয়ায় ক্যাথি বার্ড-এর মত আড়কাঠিরা বিভিন্ন এনজিওর আড়ালে থেকে রাজীবের মতো শিক্ষিত ও লোভী মানুষদের ফাঁসিয়ে ব্যবসা করে চলেছে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য তার 'উপন্যাসের বিনির্মাণ' নামক বইয়ে বলেছেন, "রঙ্গলালের মত এদের পদ্ধতি এতো খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষ-গোচর নয়; এরা অজগর সাপের মতো ধীরে

ধীরে সম্মোহন জাল বিস্তার করে বলে অনেক বেশি বিপজ্জনক ও সুদূর প্রসারী।"[৬]

একদিন যে রাজীবের লক্ষ্য ছিল গজাশিমুলের ওই সাধারণ মানুষগুলোকে রঙলালের হাত থেকে বাঁচানো এবং তাদের আগলে রাখার, তাদের গ্রামটির একটু উন্নতি করার। ধীরে ধীরে রাজীবের সেই লক্ষ্য পাল্টে গেল। একসময় রাজীব স্বপ্ন দেখত তার প্রেমিকা ও মাকে নিয়ে এক সুখের সংসার গড়ে তোলার। বাইরের শহরে কাজ করতে যাওয়া সুতপাকে সে ফিরিয়ে আনারও স্বপ্ন দেখত। কিন্তু উপন্যাস যত পরিণতির দিকে এগিয়েছে, ততই আমরা দেখতে পাই সেই সহজ সরল মধ্যবিত্ত রাজীব উধাও হয়ে গেছে এবং সেখানে গড়ে উঠছে এক লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক রাজীব। যে রাজীব থামতে জানে না, দু-দন্ড দাঁড়িয়ে ভালো-মন্দ চিন্তা করার সময় তার নেই। সে শুধু এগিয়ে যেতে জানে, বর্তমান নগর সভ্যতার প্রকৃত প্রতীক হয়ে ওঠে সে।

আগেই বলেছি, বর্তমান সমাজের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপরের ক্ষতি করা। আধুনিক মানুষ যেমন নিজেদেরকে আরও আধুনিক করে তুলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাদের ধারে। যেখান থেকে ফিরে আসা শুধুমাত্র কঠিনই নয়, অসম্ভবও। সেই রকম ধ্বংস করে চলেছে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, ভরসা সবকিছুকে। তপোধীর ভট্টাচার্য তার 'উপন্যাসের বিনির্মাণ' বইয়ে বলেছেন, "অবশ্যই আধুনিকতা যখন মানবিক অস্তিত্বের মধ্যে কেবল যান্ত্রিকতা খুঁজে পায় ভাগীরথের মতো নবীন প্রজন্মের লেখক তখন বিষয়ে প্রকরণে যান্ত্রিকতা ও দাম্ভিকতার আগ্রাসন প্রতিহত করতে চান"[৭]। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি বুদ্ধিমান শিক্ষিত রাজীবের সমস্ত জারিজুরি যখন, অল্প শিক্ষিত সুচাঁদের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে, তখন সুচাঁদ দৃঢ় স্বরে বলার সাহস রাখে, "ইবার থিক্যে আপনার পথ আমাদের পথ কিনো হইয়েঁ গেল্যাক মাস্টারদা। লিজেদ্যার ভাবনা ইবার থিকে লিজেরাই ভাবব।"[৮] এই বলে তারা তাদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে অনন্তের পথে। তারা জানে না এই যাত্রা কবে শেষ হবে, কীভাবে তারা আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এইভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলায় তাদেরকে আর কতবার আঘাত পেতে হবে, তারা তা জানে না। এই ভাবেই ভাগীরথ মিশ্র বর্তমান সমাজের এক নগ্নতার রূপকে তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। মিশ্র ভগীরথ, আড়কাঠি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯, পৃঃ ২৩
২। তদেব পৃঃ ১৯
৩। তদেব পৃঃ ৫৫
৪। তদেব পৃঃ ৫৫

৫। তদেব পৃঃ ১৬
৬। ভট্টাচার্য তপোধীর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-৫৪, প্রথম প্রকাশ, দীপাবলী ২০১০, পৃঃ ২৭৯
৭। তদেব পৃঃ ২৬৭
৮। মিশ্র ভগীরথ, আড়কাঠি, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৯, পৃঃ ১৫৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১। মুখোপাধ্যায় অরুনকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ২০২২
২। রায় অলোক, বিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, ২৪ এ, বাগমারি রোড কলকাতা-৫৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ-বইমেলা জানুয়ারি ২০১৬
৩। ভট্টাচার্য তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অজন্তা প্রিন্টার্স কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ দীপাবলি ২০১০
৪। দাশগুপ্ত রাহুল, বাংলা উপন্যাসকোশ ১৮২৫-২০১৫, প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৭, বইমেলা
৫। ভট্টাচার্য তপোধীর, আখ্যানের বহুস্বর, দে'জ পত্রিকা, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৫।

সৈ ক ত মা হা তো

রাজনীতির আলোকে সমীর রক্ষিতের ছোটোগল্প : স্বাধীনতা থেকে সমকাল

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সারা দেশ জুড়ে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সবথেকে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলার রাজনীতিতে। ওপার বাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন, তৎকালীন বাংলার সরকারকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছে। একদিকে কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি, অন্যদিকে বিপুল হারে জন-বিস্ফোরণ; সদ্য ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা তৎকালীন সরকারকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। বাংলার রাজনীতির এই অস্থির পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষজন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এই তিনটি মৌলিক অধিকারের দাবিতে সরব হয়েছে। এর ফলে সমাজব্যবস্থায় অচলাবস্থা জন্ম নিয়েছে। সরকার তার স্বৈরাচারী মনোভাবের দ্বারা বিষয়টিকে দমন করার চেষ্টা করলে, পরিণতি স্বরূপ ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালে বামপন্থী নেতাদের নেতৃত্বে খাদ্য আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

গল্পকার সেই সময় খাদ্যের জন্য মানুষের হাহাকারের চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'ফ্যাচাং দলুই' গল্পে। সেখানে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে মানুষজনের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা ধরা পড়েছে। কথক ফ্যাচাং-এর শহরে আসার কারণ হিসাবে আমাদেরকে জানিয়েছে "দেশেগাঁয়ে অনাবৃষ্টি চলছে দীর্ঘকাল, চারিদিকে মাঠ-ঘাট ফাটাবুকে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জ্বলে যাওয়া ঘাস আর ধুলো নিয়ে।"[১]

একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টি; এর পরিণতিস্বরূপ খাদ্যসংকট তীব্ররূপে আছড়ে পড়েছে সমাজের বুকে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অখাদ্য বস্তুকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে, কীভাবে তরতাজা প্রাণগুলো চোখের সামনে প্রাণ হারিয়েছে; তা এখানে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও মানুষ কতখানি অসহায় হলে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে, সমাজের বুকে জন্ম নেওয়া সেই অপ্রিয় সত্যটিও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে গল্পে। পরবর্তী সময়ে যা খাদ্য আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। একদিকে খাদ্যের জন্য মানুষের হাহাকার, অন্যদিকে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারিদের রমরমা বৃদ্ধি পেয়েছে সমাজের বুকে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য একলাফে আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে, যা ছিল সাধারণের সাধ্যের বাইরে। ফলে সেই সময় সরকারের অপদার্থতার মুখোশ সাধারণ মানুষের সামনে খসে পড়েছে।

এই খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক মায়ের আত্মত্যাগের কাহিনি ফুটে উঠেছে 'মন্দিরের বাঁধানো চাতালে' গল্পে। গল্পকার দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র দু'মুঠো ভাতের জন্য কীভাবে এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে ভূতি। তার জীবনসংগ্রামের চিত্রটি এখানে তুলে ধরেছেন তিনি "সেই গাঁ থেকে দুটো পেটের ভাতের খোঁজে নয়নের বাপের সঙ্গে শহরে চলে এসেছে আজ ভূতি।"[২]

এ শুধু ভূতির জীবনের লড়াইয়ের কাহিনি নয়। তার মতো ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করে পরাজয় স্বীকার করা মায়েদের কাহিনি, যারা সন্তানের কথা ভেবে ভিটেমাটি ছেড়ে দু'মুঠো অন্নের আশায় রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ নারীর সম্মানকে পণ্যে পরিণত করেছে। গরম ভাতের লোভ দেখিয়ে সন্তানের সামনে চেটেপুটে খেয়েছে ভূতির শরীরটাকে। এর মধ্যে দিয়ে সভ্য সমাজে বসবাসকারী মানুষজনের বর্বর মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। 'বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক' গ্রন্থে প্রকাশিত 'হাটবাজার ও পথেঘাটে মৃতদেহ' প্রতিবেদনে, তৎকালীন সময়ে খাদ্যের জন্য সারা বাংলা জুড়ে মানুষের হাহাকার, আর্তনাদের মর্মান্তিক ছবি ধরা পড়েছে— "সহরে ইতিমধ্যে দুইটি মণ্ডের লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে; কিন্তু অন্নাভাবে প্রপীড়িত লোকের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার তুলনায় এই ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত।"[৩] এর সাক্ষী থেকেছে তৎকালীন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সমাজের প্রতিটা মানুষ। উপরের গল্পগুলিতেও সেই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেছেন গল্পকার।

১৯৩৮ সাল থেকে বাংলার কৃষকরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই শুরু করে। পরবর্তীতে পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ফলে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেও, নতুন করে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে তাদের মধ্যে; কারণ বাংলার অধিকাংশ কৃষকেরাই ছিল ভাগচাষি। তারা জমিদার অথবা জোতদারদের জমি ভাগে চাষ করত। ফলে ফসলের ন্যায্য পাওনা থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়ে আসছে এই মানুষেরা। মন্বন্তরে তাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে। তাই তারা সেই সময় থেকে ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে এই দাবি তেভাগা আন্দোলনের রূপ নেয়।

১৯৪৬ সালে দিনাজপুর জেলার আটোয়ারি থানার রামপুর গ্রাম থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও, একটা সময় পর সমগ্র বাংলার কৃষক সমাজের কাছে এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই আন্দোলনের ঢেউ সুদূর সুন্দরবনেও দাগ কেটেছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে কৃষক পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে। গল্পকার সেই ভাগচাষিদের লড়াইয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'গঙ্গা যাবে সাগরে' গল্পে। চাষের জমিতে নিজের অধিকার আদায় করতে গিয়ে জোতদারদের লাঠিয়ালের হাতে কীভাবে একের পর এক চাষি শহিদ হয়েছে, সেই চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে "বাপ রাসুর লাশ পড়েছে দুবছর আগে রসিক মণ্ডলের জমিতে, ছিল ভাগচাষি।"[৪] এছাড়াও রাতের অন্ধকারে ফসল রক্ষা করতে গিয়ে, কীভাবে লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে কৃষকদের রক্তে পাকা ধানের গোছা রঙিন হয়ে উঠেছে; সেই দৃশ্যটিও গল্পে কথকের বক্তব্যে ধরা দিয়েছে।

এই আন্দোলনের জন্ম উত্তরবঙ্গের মাটিতে। সেই দিকটিকে মাথায় রেখে গল্পকার

লিখেছেন 'সনচারি ভকত' গল্পটি। সমাজের নারীশক্তি কীভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে, সেই বিষয়টি এখানে তুলে ধরেছেন তিনি। সেই সময় দাঁড়িয়ে কৃষকেরা কীভাবে সমাজের প্রভাবশালীদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস অর্জন করেছে, গল্পে ধনাদের মতো সাধারণ চাষিদের তা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "আধাআধি ভাগ করতে চায় হাটুরা, ধনারা বলে না, তেভাগা হবার লাগে। তিনভাগের দুভাগ তারা পাবে, এক ভাগ বনা।"[৫]

এই তেভাগা সাধারণ চাষিদের নতুনভাবে বাঁচার শক্তি জুগিয়েছে। গল্পের শেষে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটিয়ে কৃষকরাজের প্রতিষ্ঠা করেছে বাড়ির মেয়েরা। তবে তাদের লড়াইয়ের সফলতা একদিনে আসেনি। সনচারি, রতনের মতো সৈনিকেরা তাদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে এই পথটির সন্ধান দিয়েছে। তরুণ রায়ের লেখা 'তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি' প্রবন্ধে তৎকালীন সময়ের সেই অস্থিরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন—"এই সময়ের মধ্যে সংগ্রামের তীব্রতা, গভীরতা ও ব্যাপ্তি এবং তাৎপর্য ও ফলশ্রুতির বিচারে তিনটি কৃষক সংগ্রাম সবিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই তিনটি গ্রাম হচ্ছে চল্লিশের দশকের তেভাগা আন্দোলন—এও তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ এবং ষাটের দশকের নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম।"[৬]

বাংলার রাজনীতির বিশেষ একটি সময়কালকে নিয়ে লেখা 'দিগ্বিজয়ের ঘোড়া' গল্পটি। সেই সময় সারা দেশে জরুরি ব্যবস্থা জারি হয়েছে, বাংলায় নকশাল আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এই রকম একটি পরিস্থিতিকে গল্পকার তাঁর গল্পের প্লট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলা যুবসমাজের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। প্রতিবাদী শক্তিকে নির্বিচারে হত্যা, গণতন্ত্র, ভোটলুঠ সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতির ফেলে আসা এক রক্তাক্ত অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। পাশাপাশি বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব, সেই বার্তাও গল্পকার দিয়েছেন এই গল্পে। এছাড়াও একই পরিবারে দুটি আলাদা আলাদা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ বাস করলে কীরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা এই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন। তবে এর পাশাপাশি, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতটা দৃঢ় হতে পারে; সেই ছবিও এখানে ফুটে উঠেছে। সেই দৃষ্টান্ত ছাপিয়ে গিয়েছে সমস্ত রকম রাজনৈতিক বাতাবরণকে। দুই ভাইয়ের বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শ বহন আমাদেরকে সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাস এবং সমরেশ বসুর 'শহীদের মা' গল্পের কথা স্মরণ করিয়েছে।

নকশাল আন্দোলনকে সামনে রেখে লেখা আরেকটি গল্প হল 'মহাপৃথিবীর প্রাঙ্গণে' গল্পটি। দক্ষিণ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বালিগঞ্জ চত্বরে কীভাবে দিনের আলোতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে, সেই বিষয়টি তাঁর লেখনীতে ধরা দিয়েছে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিবাদী

মুখগুলিকে চিরকালের মতো স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তৎকালীন সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, কথকের একদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার অভিজ্ঞতায় সেই দৃশ্য ফুটে উঠেছে—"এইট্ বি বাস টার্মিনাসে নেমে দেখি ওপাশে সব অন্ধকার।...সশস্ত্র শান্ত্রীরা সঙ্গিন উঁচিয়ে রয়েছে, রাস্তার ওপরে ঠেলাগাড়ি, বাঁশ, পরিত্যক্ত পাইপের ব্যারিকেড। কিশোর তরুণদের খোঁজ হচ্ছে, আমরা বাড়ি ফেরার অনুমতি পেয়ে গেলাম।"[৭]

সারা শহর জুড়ে এক অসামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষজনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রতিটা মুহূর্তে বাঁধা পেয়েছে, এক অজানা আতঙ্ক প্রতিটা মুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে জনজীবনকে। এছাড়াও গল্পে ধর্মীয় রাজনীতির শিকার হয়ে হাজার হাজার মানুষের ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে এদেশে আসার কাহিনির পাশাপাশি, তাদের জীবন সংগ্রামকেও তুলে ধরেছেন গল্পকার।

এক মায়ের চোখ দিয়ে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশককে দেখাতে চেয়েছেন গল্পকার 'হীরকের লেখাপড়া' গল্পে। তৎকালীন সময়ে শহরের যে অঞ্চলগুলিতে নকশালরা সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেইরকম একটি অঞ্চলকে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বেছে নিয়েছেন গল্পকার। গল্পে সন্তানের আগামীর দিনগুলি নিয়ে চিন্তিত এক মায়ের চিত্র ধরা পড়েছে। আসলে সেই সময় সন্দেহবশত যেভাবে যুবকদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, সেই দিকটির কথা ভেবে গল্পের হীরকের মা খুবই চিন্তিত। তাইতো শাসকের রক্তচক্ষু থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য সমাজের সঙ্গে প্রতিটা মুহূর্তে লড়াই করেছে। হীরক মাসির বাড়িতে যাওয়ায় অসম্মতি প্রদান করলে সে বলেছে,

"পাড়ায় তো কাউকে বাদ রাখেনি, তোমাকেও কোনদিন তুলে নিয়ে যাবে, তার কিছু ঠিক আছে? ...দুশ্চিন্তায় সারারাত আমার ঘুম আসে না, বুক কাঁপে সারাক্ষণ, এই বুঝি কিছু ঘটে গেল?"[৮]

এ শুধু বনানীর একার দুশ্চিন্তা নয়, তার মতো প্রতিটা মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যেভাবে দিনের আলোতে প্রশাসনের মদতে মায়েদের কোল শূন্য হয়ে যাচ্ছিলো, তা বাংলার প্রতিটা মায়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আটটা-ন'টার সূর্য' উপন্যাসের ভূমিকায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"নকশালবাড়ি আন্দোলনের জোয়ার হাজার হাজার যুবক-যুবতী আরূঢ় হয়ে এদেশের অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস ক'রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্পে ব্রতী হন। তাদের সেই বীরত্বের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন অশোককুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বর্তমান উপন্যাস 'আটটা-ন'টার সূর্য'- তে।"[৯]

ব্যক্তিগত জীবনে গল্পকার এই মানুষজনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। কৌতূহল পিপাসু মন নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছেন তাদের লড়াইয়ের কাহিনি, যা তাঁকে

প্রতিটা মুহূর্তে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলস্বরূপ তাদের লড়াইয়ের কাহিনি জায়গা করে নিয়েছে তাঁর লেখনীতে।

বাংলার রাজনীতির এক কলঙ্কময় অধ্যায়কে 'নিতাই-এর ওপর রাগ হয়' গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকার। সমাজে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলেও, শাসকের শোষণ পদ্ধতি যে অপরিবর্তিত থাকে, সেই সত্যটি গল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—

"ওর ভাই রাজনীতি করত। এখন আর পাড়ায় ঢুকতে পারে না। ওদের মা কান্নাকাটি করে। নিতাইকেও পাড়া ছাড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেক হাতেপায়ে ধরে শেষ পর্যন্ত নিজগৃহে থাকার অনুমতি মিলেছে।"[১০]

রাজনীতির জাঁতাকলে আখের মতো পেষায় হওয়া এক পরিবারের কাহিনি এখানে তুলে ধরেছেন কথক। আজও সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে কত মানুষ আজ ঘর ছাড়া। কত মায়ের কোল শূন্য হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। আমাদের সমাজের জন্য সেই বিষয়টি কখনোই কাম্য নয়। এছাড়াও গল্পে মেরুদণ্ডহীন শিক্ষিত সমাজের কথাও তুলে ধরেছেন গল্পকার।

তৎকালীন সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ অপারেশন বর্গা লাগু হওয়ার ফলে, বহু মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তনের জোয়ার দেখা গিয়েছে। এর সুফল আজও ভোগ করছে বহু নিম্নবিত্ত পরিবার। সমাজ পরিবর্তনের সেই দিকটি গল্পকার তুলে ধরেছেন 'ভেলিয়াচাঁটির ইস্কুল' গল্পে। এছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, যা নতুন প্রজন্মকে প্রবল উৎসাহিত করেছে। সমাজ বিকাশের এই চিত্রগুলিকে তিনি গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন "অপারেশন বর্গার নতুন তরঙ্গ খেতখামারে এনেছে জোয়ার। অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে বই-টিফিনের ব্যবস্থায় উৎসুক হয়ে উঠেছে নতুন প্রজন্মের শিশুরা।"[১১]

তবে জাতপাতের গোঁড়ামি থেকে আমাদের সমাজ আজও মুক্ত নয়। কীভাবে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ধর্মের দোহায় দিয়ে একটি জাতিকে অপর একটি জাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। জাতপাতের ঝাণ্ডাধারীরা কীভাবে রাজ্যগুলিতে রক্তপাত ঘটায়। নিম্নবিত্ত মানুষজনের উপর অকথ্য অত্যাচ্যার চালায়। সমাজের সেই অন্ধকার দিকগুলিও তিনি তুলে ধরেছেন এখানে। একটি সভ্যসমাজব্যবস্থায় যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়।

নির্বাচনের আবহকে সামনে রেখে গল্পকার 'তাতা' গল্পটি লিখেছেন। সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কীভাবে নির্বাচনের সময় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে, সেই দিকটি এখানে ফুটে উঠেছে "বাহাত্তর সাল, মোহনদের দল প্রায় মুছে গেল। শম্ভুরা দলে দলে ব্যালটে ছাপ মারল। ক্ষমতায় এল ঋষু সরকাররা।"[১২]

গল্পে একটি বিশেষ সময়কালের কথা উল্লেখ করেছেন গল্পকার। সারা বাংলা জুড়ে তখন এক পালাবদলের ঝড় বইতে শুরু করেছে। সেই যুগসন্ধিক্ষণে সাধারণ মানুষের

মৌলিক অধিকার কীভাবে খর্ব হয়েছে, উপরের উক্তিটির মধ্যে দিয়ে সেই চিত্রটি ধরা পড়েছে। এছাড়াও ক্ষমতাবানেরা কীভাবে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, তাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, গল্পের শম্ভু চরিত্রটি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আজও সমাজের দিকে তাকালে এই দুই শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি সমাজে সমান ভাবে লক্ষ করা যায়, যা গণতন্ত্রের জন্য লজ্জাদায়ক।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে বাংলার মাটিতে রাজনৈতিক নেতাদের মদতে একটি নিষিদ্ধ সংগঠন জন্ম নিয়েছিল। সাধারণ মানুষের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনিকেই গল্পকার তুলে ধরেছেন 'শব্দের উৎস' গল্পে। আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের মানুষজনের জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করে তুলেছিল এরা, সেই করুণ দৃশ্য গল্পে তুলে ধরেছেন তিনি "রাস্তায় পিকরিকাটার জঙ্গলে ল্যান্ডমাইন ঘটল বিস্ফোরণ, খণ্ড খণ্ড হয়ে জ্বলে গেল সে অ্যাম্বুলেন্স।"[১৩]

শিক্ষিত সমাজের প্রতিবাদী কণ্ঠকে হত্যা করার পাশাপাশি, বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবার গতিপথেও বাধা দান করত এই সংগঠনের সদস্যরা। তবে বর্তমান সময়ে এদের সক্রিয়তা আর তেমনভাবে সমাজে লক্ষ করা যায় না।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়কাল হিসাবে ধরা হয়। সমগ্র বিশ্ব সেই সময় দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া। এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল সমগ্র বিশ্ব। ১৯৯১ সালে আমেরিকা ইরাকের উপর হামলা চালালে, ইরাকের কঙ্কালসার চেহারা সারাবিশ্বের সামনে ফুটে উঠেছিল। খবরের কাগজের পাতায় ভেসে উঠেছিল সেখানকার মানুষজনের বাঁচার করুণ আর্তনাদ। তাকে শামসুর রাহমান তাঁর 'বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর' গ্রন্থে বিশ্ব রাজনীতির টানা পোড়েনের বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন "রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের উত্থান-পতন, উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব সবকিছুর মূলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ছিল ঠাণ্ডা লড়াই।"[১৪]

সমাজ-রাজ্য-দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন একজন গল্পকার হলেন সমীর রক্ষিত, তাইতো 'শিশুদের নিয়ে স্বপ্ন' গল্পটিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। একদিকে দেশের অভ্যন্তরীণ নানারকম বিশৃঙ্খলা এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর দেশের উপর আক্রমণ, গল্পকারের মনে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। ইরাকের শতশত শিশুর কান্নার রোল তার হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে গল্পে। তাইতো তিনি নব প্রজন্মের আগামীর দিনগুলির কথা ভেবে সোপান-কে বিশ্বপিতার জায়গায় বসিয়েছেন। ধ্বংসের মাঝেও, ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য শুভচিন্তক রূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর রাষ্ট্র কীভাবে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানছে এবং সমগ্র বিশ্বে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, সে সম্পর্কে

গল্পকার আমাদেরকে একটি ধারণা দিতে চেয়েছেন 'ব্যাধ' গল্পে। সমাজের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে তিনি মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এই বিষয়টি কেবলমাত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থাতেও প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও তিনি কৃষ্ণের সাধারণ মানুষের কাছে ভগবান হয়ে ওঠার বিষয়টিকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। মহাভারতের কৃষ্ণের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি পাঠকের কাছে জানতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণ নিজের জীবন রক্ষা করতে অক্ষম, সামান্য তীরের আঘাতে যার মৃত্যু ঘটেছে; সে কেমন করে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা করবে! তাইতো ব্যাধ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গল্পকারের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন বিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে। তিনি গল্পে কৃষ্ণকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রক্ষাকর্তা রূপে দেখাতে চেয়েছেন।

আমাদের সমাজব্যবস্থার প্রতিটি অঙ্গে রাজনীতি বাসা বেঁধে আছে। এই বিষয়টি প্রতিটা মুহূর্তে সমাজের গতিপথকে ত্বরান্বিত করে। তবে কিছু মানুষ যখন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তা সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এর ফল ভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকে। উপরের গল্পগুলি তারই দৃষ্টান্ত বহন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসের কীভাবে পট পরিবর্তন হয়েছে; তার জীবন্ত দলিল এই গল্পগুলি।

উৎসের সন্ধানে :

১. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-১, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩৮
২. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১২৭
৩. কমল চৌধুরী (সংকলন ও সম্পাদনা), 'বাংলার গণআন্দোলনের ছয় দশক', পত্রভারতী, কলকাতা — ৭০০০০৯, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ — জুন, ২০২৩, পৃ. ১১১
৪. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-৩, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৫৬
৫. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-৪, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৮৩
৬. তরুণ রায়, 'তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি', অনিল আচার্য (সম্পদনা), "তিন দশকের গণআন্দোলন", অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা — ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ — এপ্রিল, ২০১৮ পৃ. ১২২
৭. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-১, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৩০
৮. তদেব, পৃ. ৩০৩
৯. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, 'আটটা-ন'টার সুর্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা — ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ — অক্টোবর ২০১৩ পৃ. ১০
১০. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-২, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩২
১১. সমীর রক্ষিত, 'গল্প সমগ্র'-৪, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১১৯
১২. তদেব, পৃ. ৩০৩ ১৩. তদেব, পৃ. ৩০৬
১৪. তারেক শামসুর রেহমান, 'বিশ্ব রাজনীতির ১০০ বছর', শোভা প্রকাশ, ঢাকা — ১১০০, প্রথম প্রকাশ — ২০০৮, পৃ. ৮১

গা ফ ফা র আ ন সা রী

একটি পরিবারের গৌরব-সর্বস্ব পতনের ইতিবৃত্ত নাকি ঐতিহ্যের স্বাভাবিক রূপান্তর : প্রসঙ্গ একরাম আলির 'দিগন্তের একটু আগে'

কবিতাচর্চার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে কবি একরাম আলি গদ্যচর্চায় স্বাক্ষর রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ যাবৎ (২০২৪ খ্রি.) প্রকাশিত অন্তত তেরোটি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি একটি জীবনী গ্রন্থ, 'অতীশ দীপঙ্কর' (১৯৯৮ খ্রি.), একটি উপন্যাস 'দিগন্তের একটু আগে' (২০১৫ খ্রি.) যেমন তিনি রচনা করেছেন তেমনই 'ধুলোপায়ে'র (২০১৫ খ্রি.) মতো উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ ও 'বেদনাতুর আলোকরেখা'র (২০২০ খ্রি.) মতো উৎকৃষ্টমানের প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করেছেন। আমরা জানি, 'ধুলোপায়ে' বইটির জন্য ২০১৬ সালে একরাম আলি 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আবার স্মৃতিকথাধর্মী গদ্য 'হ্যারিসন রোড' (২০২০ খ্রি.) গ্রন্থটিতে সৃষ্টিসুখে একরাম তাঁর হয়ে ওঠার জগৎটিকে তুলে ধরতে গিয়ে সমকালীন কলকাতাকে যেমন তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনই তাঁর 'বাঙালি মুসলমান লোকাচার ও সমাজ' (২০২১ খ্রি.) গ্রন্থটি বাঙালি মুসলমানদের যাপিত জীবনের ইতিহাস হয়ে উঠেছে। একরাম আলি মূলত কবি, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অতিজীবিত' (১৯৮৩ খ্রি.) এছাড়াও বিশেষ করে, 'ঘনকৃষ্ণ আলো' (১৯৮৮ খ্রি.), 'আঁধার তরঙ্গ' (১৯৯১ খ্রি.), 'বাণরাজপুর' (২০০০ খ্রি.), 'আঁধারপরিধি' (২০০৯ খ্রি.), প্রলয়কথা (২০০৯ খ্রি.), 'বাউটির কবিতা' (২০১৪ খ্রি.) ও 'বিপন্ন গ্রন্থিপুঞ্জ' (২০১৫ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য কাব্য। এ বছর (২০২৪ খ্রি.) প্রকাশিত একরাম আলির একটি গল্পসংকলন হল, 'মাঝরাতের পর'।

কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত প্রকাশের পাশাপাশি গদ্যচর্চায় একরাম আলি যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর সৃজনের এই বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে আমি বেছে নিয়েছি তাঁর একমাত্র উপন্যাস, 'দিগন্তের একটু আগে'। বলা বাহুল্য, মূলত গদ্যরচনায় দুয়েকজন কবি আবেগের লাগাম না দিয়ে নিজস্ব গতিতে তাকে ছুটতে দেন, একরাম আলি তা করেননি। বিশেষ করে কবিতাপ্রাণ একজন কবির কলমে আবেগের যে উচ্ছ্বাস থাকে তার বহিঃপ্রকাশ একরাম আলির গদ্যগ্রন্থগুলিতে নেই, বরং তিনি বাক-সংযমী। যে কথা কবিতায় ধরা সম্ভব হয়নি তা-ই তিনি দৃঢ়পিনদ্ধ ভাষায় গদ্যের রূপ দিয়েছেন। তাঁর গদ্যের নিজস্ব একটা শৈলী আছে এবং তা রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে নিংড়ে দিতে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। অন্যদিকে, এমনকি যে কথা উল্লেখ না করলেই নয় তা হল— একরাম আলি যিনি একজন কবি হিসেবেই পরিচিত তিনি গদ্যচর্চার পাশাপাশি চিন্তন ও মননচর্চায় সমৃদ্ধ অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের প্রবন্ধগ্রন্থও 'বেদনাতুর আলোকরেখা' (২০২০ খ্রি.) রচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে

একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে বহমান বাংলা কবিতাকে মূল্যায়ন করার সৎসাহস যেমন তিনি দেখিয়েছেন তেমনই কবিতার বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে।

আমরা জানি, কবিতাকেন্দ্রিক নানা আন্দোলন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সত্তর দশকের বাংলা কবিতার শরীরেও বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এমনকি বলা যায়, বাংলা কবিতাকে প্রথাসর্বস্বতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। সেই মুক্তির দশকে বিশেষ করে কাব্যকলা নির্মাণে, বিষয় নির্বাচনে — শহর বিমুখীনতা এবং গ্রামীণ জীবনকে আঁকড়ে শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পের প্রতিভাস নির্মাণে সামগ্রিকভাবে একরাম আলির স্বকীয়তা পাঠকের চোখে পড়বে। অবশ্য সে বিচারে 'দিগন্তের একটু আগে' সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি উপন্যাস।

একরাম আলির একমাত্র উপন্যাস 'দিগন্তের একটু আগে'। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ, ১৪২২) এই উপন্যাসটি দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির শুরুতেই 'দু-একটা কথা' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন :

"এই রচনায় কাহিনিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মূলত চিন্তার প্রতি অবিশ্বাসকে ঘৃণা করা হয়েছে।"[১]

আসলে চিন্তার প্রতি কথক সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন বা বলা ভালো পাঠককেও তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য বিশ্বাসের ওপর ভর করতে বলেছেন। সেই চিন্তার হাত ধরে একজন কবির ভাবলোকে অতীত ও বর্তমানের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আসলে ব্যক্তি-মানুষের মন ও মননের দ্বন্দ্ব, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের হিসেব না মেলার দ্বন্দ্ব। সে-বিচারে এই উপন্যাসটি একটি পরিবারের পতনের ইতিবৃত্ত। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসটির 'ব্লার্ব' অংশে লিখিত কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে হয়। লেখকের মতে উপন্যাসটি হল— "জীবিত আর মৃত ব্যক্তিদের অন্তর্দন্দ্বের আখ্যান, আটশো বছরের একটি পরিবারের গৌরবস্বর্গ যেখানে ধ্বংস হচ্ছে।" উপন্যাসটি পাঠে আমার মনে হয়েছে, এটি কেবলই গৌরবস্বর্গ ধ্বংসের বর্ণনা নয় অথবা একটি পরিবারের পতনের ইতিবৃত্ত নয় বরং বলা যায়, এই উপন্যাসটি দীর্ঘ আটশো বছরের ঐতিহ্যের স্বাভাবিক রূপান্তর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে রূপান্তর মেনে নেওয়া ছাড়া কারও কোনো উপায় থাকে না। সেই ঐতিহ্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সের একটি মানুষ বার্ধক্য বয়সে এসে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর আগের তাঁরই যাপিত জীবনের স্মৃতি-চারণাও করে চলেছেন এই উপন্যাসটিতে। কবি তাঁর এই উপন্যাসটিতে সমান্তরালভাবে এই দুটি দিক রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছেন।

উপন্যাসটির প্রচ্ছদে দেবাশিস সাহা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে কাহিনিটিকে ধরে রেখেছেন। আমরা দেখতে পাই—গল্পকথক সন্তর্পণে এসে পৌঁছেছেন তাঁর প্রিয় খুকুর কবরের পাশে,

বাগমারি গোরস্থানে। দেবাশিস সাহা বইটির প্রচ্ছদে সেই অলৌকিক আবহ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। একজন কবরের বাইরের মাটিতে আর অন্যজন বাঁধানো কবরের ভেতরে — তবুও ফিসফিস স্বরে তাঁরা কথা বলছেন প্রতিদিনকার মতোই। গল্পকথক প্রশ্ন করলে বাঁধানো কবরের ভেতর থেকে উঠে আসছে তার প্রত্যুত্তর। যেন এক অলৌকিক সংলাপ। তাঁদের এই কথোপকথনে উঠে আসে এমন এক সত্য, যে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবশেষে একরাম আলি উপন্যাসটির 'ব্যাক-কভারে' উল্লিখিত কথাগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন এবং বলতে বাধ্য হবেন :

"জরাগ্রস্থ পৃথিবীর অতি-কাঠামো খসে-খসে পড়ছে। সেই ধ্বংসস্তুপের মাঝে চলছে ব্যক্তির পরস্পরবিরোধী চিন্তার অবিরাম সংঘাত। স্বর্গ নয়— চিন্তার সংঘাত থেকে নির্মিত হচ্ছে এক নরক, যার মতো অপরূপ বাসভূমি আর নেই।"[২]

এই উপন্যাসটিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে ব্যক্তির চিন্তার অবিরাম সংঘাত। যে কারণে বাইশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণতা দানের পরেও একরাম আলি উপন্যাসটিতে অতিরিক্ত 'পরিশিষ্ট' অংশ জুড়ে দিয়েছেন। এই অংশটিতে এসে উপন্যাসটির গল্পকথকের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। আমরা জানতে পারি তাঁর আসল পরিচয়, তিনিই হলেন— সৈয়দ আবু মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম নিশাপুরি রহমতউল্লাহ আলাইহে। নতুন নিশাপুরের কবরের তলায় শুয়ে শুয়ে যিনি দেখেন তাঁর উত্তরকালের একত্রিশতম উত্তরপুরুষ সৈয়দ শাহ খালিদ আবদুল্লাহ নিশাপুরির (লোকমুখে যিনি 'ছোট হুজুর') বহমান জীবন। এমনকি এই 'পরিশিষ্ট' অংশ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, প্রকৃত অর্থে যিনি 'বড় হুজুর' তিনি সৈয়দ আবু কায়সার ইবন আবু খালিক নিশাপুরি। পড়াশোনার জন্য ছোটবেলা থেকেই তাঁকে নিশাপুরের পরিবেশের বাইরে কখনো হোস্টেলে বা কলকাতায় থাকতে হয়েছে। অবশ্য এই দুটি নাম না জানলেও উপন্যাসটির ইতিহাসের কিছু পরিবর্তন ঘটে যায় না, এমনকি কাহিনিরও কোনো ক্ষতি হয় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে 'পরিশিষ্ট' অংশে একরাম আলির উল্লিখিত কথাটির সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি :

"লেখকের কাছে সবার আগে কাহিনির চিন্তা। কাহিনির ইতিহাস তার পরে।"[৩]

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩২ হিজরি সন) যখন মধ্য এশিয়ার খোরাসানের রাজধানী ছিল মার্ভ, তখন মার্ভের খলিফা ছিলেন আবু-আল-আব্বাস। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে চিঙ্গিজ খানের নাতি হুলান খান যখন নানান ভাঙাগড়ার ঘাঁটি বাগদাদকে গুঁড়িয়ে দেন সেই তখন খলিফা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক প্রিয় নবি হজরত মহম্মদের কন্যা ফাতিমা-তুজ-জোহরা ও তাঁর স্বামী হজরত আলির বংশধর ছিলেন হজরত ইমাম বায়েজিদ ইবন আবদুল্লাহ। খলিফা শাসক আবু-আল-আব্বাসের শরীরেও এই হজরত ইবন আবদুল্লাহর

রক্ত বইছে। একসময় খোরাসান থেকে সদলবলে খলিফারা ইরাকে ফিরে গেলেও ফেরেননি এই হজরত ইবন আবদুল্লাহ। তিনি তাঁর অত্যন্ত পছন্দের শহর নিশাপুরে থেকে যান। পারস্যবাসীর কাছে এই শহরটির নাম ছিল, নায়শাবুর। বিভিন্ন সময়ে খোরাসানের রাজধানী ছিল — মার্ভ, সমরকন্দ, হিরাট, গজনি। এভাবেই একসময় খোরাসানের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নিশাপুরে। বলা হয়, খোরাসানের ১৬০০ বছরের ইতিহাসে নিশাপুর ছিল আয়তনে সবচেয়ে বড় আর খানদানিতে ছিল সবার সেরা। তাছাড়া নিশাপুরের সুফি সাধনার জগত-জোড়া খ্যাতি ছিল। ইমাম বুখারি, আল-ফারাবি, আল-বিরনি, আবু হানিফা, ইবন সিনা এমনকি ওমর খৈয়াম ও জালালুদ্দিন রুমির মতো বিশ্বখ্যাত সুফি সাধকেরা এই নিশাপুরেই জন্মেছিলেন এবং নিশাপুরের ভূমিকে পুণ্য করে তুলেছিলেন।

সেই নিশাপুরের ভয়ংকর পরিণতির মূল কাণ্ডারী ছিলেন মঙ্গোলিয়ার দুর্ধর্ষ নেতা তেমুজিন। এই তেমুজিন সারা বিশ্বজুড়ে চিঙ্গিজ খান অর্থাৎ ধরিত্রীর শাসক হিসেবে আত্ম-পরিচয় লাভ করেন। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে চিনের ইয়ানজিং (বর্তমানে বেজিং) দখল করার পর প্রকৃত অর্থে 'চিঙ্গিজ' হওয়ার স্বপ্নে তেমুজিন মধ্য এশিয়া গিলে ফেলতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দ্যেশ্যেই ১২২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গোলরা ঢুকে পড়েছিল ঐতিহাসিক মার্ভ শহরে। আর তেমুজিনের ছোট ছেলে তোলুই এভাবেই গুঁড়িয়ে ফেলে মার্ভকে। অন্যদিকে তেমুজিনের জামাতা তোকাচার একা আক্রমণ করেন নিশাপুরকে। এই আক্রমণ হিতে বিপরীত হল। হতভাগ্য নিশাপুরবাসী তোকাচারকে তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলার ভয়ংকর পরিণতি জানত না, জানলে এই ভুল করার আগে অন্তত একবার হলেও তারা ভাবতো। তোকাচারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে দ্বিগুণ ক্রোধে তোলুই নিশাপুর আক্রমণ করলে গোটা শহর যেন রক্তে ভেসে যায়। রাবিয়া-আল-বসরির সুফি কবিতায় সেই রক্তাক্ত দিন থেকে মুক্তির স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই আশ্চর্য অক্ষরগুলো ঘরময় প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতে দেখেন ফরিদউদ্দিন আত্তার :

"কোথায় সেই উড়ন্ত ডানার মুক্ত জীবন — সে জীবনের মন নেই, শরীরও নেই।"[৪]

সাতদিন ধরে মঙ্গোলদের এই কোতল-পর্বে নিশাপুরের লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। একসময় নিশাপুরের রক্তস্রোত থেকে কোনওরকমে যাঁরা বেঁচেবর্তে নিজেদের মুক্তি দিতে সক্ষম হতে পেরেছিলেন তাঁদের আলোচনায় উঠে এল মুসলমানদের জন্য নিরাপদ একটি দেশের কথা এবং তাঁদের পা এসে ঠেকল হিন্দুস্থানের মাটিতে। তখন দিল্লিতে তুর্কি সুলতান ইলতুতমিশের রাজত্বকাল। হজরত আলি ও ফাতিমা-তুজ-জোহরার বংশে জন্ম সৈয়দ আবু মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম নিশাপুরির সঙ্গে এলেন নিশাপুরের কেল্লার হিসাব-রক্ষকের পুত্র তৈয়ব ও কন্যা সাবিরা। এই সাবিরা পরবর্তীকালে আবু মহম্মদের স্ত্রী হন।

আমরা জানি, একসময় বাংলার শাসক ছিলেন ইলতুতমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ। আমরা এও জানি যে এই বাংলার মাটিতেই পায়ের ধুলো পড়েছে বিখ্যাত সুফি সাধক হজরত জালালউদ্দিন তাব্রিজির। বসবাসের জন্য স্বেচ্ছায় সেই বাংলাকেই বেছে নিয়েছিলেন সৈয়দ আবু মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম নিশাপুরি। দিল্লির দরবার থেকে দূরে, অনেকটা দূরে ২৮ বছর বয়সী আবু মহম্মদ, সাবিরা ও তৈয়ব এসে পৌঁছলেন অজয় নদের বাঁকে, এক শালজঙ্গলে। এমন জঙ্গলাকীর্ণ আর কাঁকর-মাটির জায়গার তাঁরা নামকরণ করলেন, নিশাপুর। ৬২৬ হিজরি সনে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ মারা যাওয়ার পূর্বে বাংলার এই নিশাপুরবাসীদের জন্য মোট ৪৬০ বিঘে জমি তিনি দান করেছিলেন। উল্লেখ্য সে বছরই নিশাপুরের খানকা শরিফের ইঁট গাঁথা হয়েছিল।

একরাম সর্বান্তকরণে কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণে ভাষাকে চরিত্রানুগ করতে গিয়ে স্বতন্ত্র জায়গা থেকে সরে এসে আরবি 'লঙ্গের' ব্যবহার করতে চেয়েছেন বলেই আমার মনে হয়। জিন্দা, মুর্দা, মুরিদ, মুশাফির, ইজ্জত, দোয়া, বরকত, খুসবু, বদবু, মশহুর, নজরানা, ওয়াক্ত, জিকির, নাজুক, ইন্তেজার, ইন্তেকাল, কোতল প্রভৃতি আরবি শব্দের অপ্রতুল ব্যবহার তাছাড়া পবিত্র কোরান শরিফের নানান আয়াত উল্লেখ করে একরাম একটি কৌম সমাজের ভৌম জীবন-যাপনকে তুলে ধরেছেন। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, উপন্যাসটির পাঠে এ সমস্তকিছুই সাধারণ পাঠককে বিড়ম্বনার সম্মুখীন করে। যদিও কোরান থেকে উদ্ধৃত প্রতিটি আয়াত উল্লেখমাত্রই একরাম আলি নিজে এর সরলার্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছেন তবুও বোধগম্যে অসুবিধে না হলেও সাধারণ পাঠকের পক্ষে আরবি পাঠ বেশ খানিকটা রসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বেশ কিছু জায়গায় বর্ণনা করতে গিয়ে একজন কবি তাঁর কাব্যিক সত্তাকে অতিক্রম করতে পারেননি বলেই আমার মনে হয়। মঙ্গোলদের আক্রমণকালে ছোট হুজুরের একা দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনায় একরাম আলি লিখছেন :

"কোনও মরুভুমিতে দাঁড়িয়ে, একা — যেখানে বালি-ঝড়ের ঘূর্ণি-পাক খেয়ে খেয়ে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠছে আর সে একটু-একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে গরম বালির ভিতর।"[৫]

উপন্যাসটির সামগ্রিক পাঠে জানতে পারি, গত আটশো বছরের পুরনো নিশাপুরের সৈয়দ বংশের নবীনতম উত্তরাধিকার হলেন সৈয়দ সাদ বিন খালিদ নিশাপুরি। 'ছোট হুজুর' আর ফাহিমার এই একমাত্র সন্তান যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে পড়াশোনায় ব্যস্ত। তাই সাদের পক্ষে 'নিশাপুর মঞ্জিল'-এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ বা পালন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নিজের নাম থেকে 'নিশাপুরি' শব্দটি বাদ দিলেও সৈয়দ বংশের রক্ত তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তাই সবকিছু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবশেষে

সাদ বিন খালিদ একটি ট্রাস্ট গড়ার প্রস্তাব দেন। সাদের এই প্রস্তাব তাঁর পরিবারের কেউই মানতে রাজি হননি। যদিও কাহিনির শেষে আমরা জানতে পারি যে সাদের অবর্তমানেই নিশাপুরের সমস্ত সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের অধীন করা হয়ে গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে এ আসলে নিয়তির অনিবার্য পরিণতি নাকি এই উপন্যাসটি একটি পরিবারের পতনের ইতিবৃত্ত তা পাঠক স্থির করবেন। তবে একথা অনায়াসে বলা যায়, উপন্যাসটি প্রাচীন একটি পরিবারের ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা ভেঙে যাওয়ার ইতিহাস। সার্বিক বিচারে উপন্যাসটি সম্পর্কে বলতে গেলে 'ব্লার্ব' অংশে উল্লিখিত কথাগুলির সঙ্গেই আমাদের সহমত পোষণ করতে হয় :

"এই উপন্যাসে তাই সমস্তরকম অসঙ্গতি সত্ত্বেও ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সে জীবিত হোক অথবা মৃত। কেননা, মৃতের ফেলে-যাওয়া পৃথিবীতেই জীবিতরা হাসে, কাঁদে, স্বপ্ন দেখে এবং ঘুমিয়েও পড়ে ক্লান্ত হয়ে।"[৬]

'ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে' বলেই উপন্যাসটিতে বর্ণিত উপরোক্ত কাহিনির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ষাট ছুঁই ছুঁই এক ব্যক্তির আত্মকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই ব্যক্তিই আসলে গল্পকথক। উপন্যাসটির গভীর পাঠে অনুধাবন করা সহজ যে, এই গল্পকথকই সৈয়দ আবু কায়সার ইবন আবু খালিক নিশাপুরি। উপন্যাসটির আড়ালে থাকলেও কাহিনির সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ জড়িয়ে আছেন। প্রথম অধ্যায়েই আমরা দেখতে পাই, মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সী তাঁর স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নার্সিংহোম থেকে আর সশরীরে বেরোতে পারেননি, সন্তানসহ মারা যান। আমরা দেখতে পাই গল্পকথক তাঁর প্রিয় 'খুকু'র (স্ত্রী) স্মৃতি-চারণায় নিমগ্ন হয়ে এমন একটি মায়ার জগত নির্মাণ করেন যেখানে দিনের পর দিন তাঁর খুকুর সংখ্যা বাড়তে থাকে অর্থাৎ যে কেউ তাঁর খুকু হয়ে উঠতে থাকে। এভাবে বাড়ির দেয়ালের গায়ে ফ্রেম-বন্দি বিয়াল্লিশতম খুকু সৃজাকে আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া আমরা দেখি, দেওয়ালের এক একটি খুকুর সঙ্গে নিজের খেয়ালে প্রশ্ন—উত্তরের খেলায় মেতে থাকেন গল্পকথক।

গল্পকথক হ্যারিসন রোডের মেসে থাকতেন আর রিজিয়া খাতুন (পরে কথকের স্ত্রী) থাকতেন পি জি হোস্টেলে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের বন্ধু নির্মলের প্রসঙ্গ অথবা মানি অর্ডার না আসায় গল্পকথকের মিল বন্ধ কিম্বা সূর্য সেন স্ট্রিটে তাঁর 'আস্ত একটা কয়েন' কুড়িয়ে পাওয়া, প্রতি সপ্তাহে শনিবারের লাইব্রেরি যাওয়া, লাইব্রেরি থেকে 'চাঁদের পাহাড়' পড়ে ফেলা থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয় গল্পকথকের সঙ্গে লেখকের বাস্তব জীবনসঞ্জাত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়। তাছাড়া একরাম আলির 'হ্যারিসন রোড' পড়তে পড়তেও এই একই বিষয়ের অনুবর্তনে আমার মনে হয়, গল্পকথক তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা সৈয়দ'

আর 'নিশাপুরি' শব্দ দুটির ভার বহন করতে পারেননি বলেই কাহিনির আড়ালে থাকতে চেয়েছেন ঠিকই; কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেননি। গল্পকথকের জীবনের সঙ্গে উপন্যাসটির রচয়িতার ব্যক্তিজীবনের এত মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে দু'জনকে আলাদা করে চেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মনে হয়, গল্পকথক ও ঔপন্যাসিক যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

মাটির সঙ্গেই মানুষের চিরকালীন সম্পর্ক। তাই আবু মহম্মদ যখন বাংলায় নিশাপুরের পত্তন করেন তখন তাঁর কণ্ঠেও একসময় শুনতে পেয়েছি :

"যেখানেই তুমি পা রাখবে, সেটাকেই দিল থেকে নিজের জায়গা বলে মনে করবে। মাটিকে ইজ্জত দিতে হয়, তৈয়ব।"[৭]

মাটিই যে মানুষের শেষ আশ্রয় — উপন্যাসটির পাঠে সেই দর্শনই যেন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই চরম সত্যের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া সত্যিই আমাদের গত্যন্তর নেই। একই কথার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হলেও পাঠকের জন্যই তাই উপন্যাসে অন্যত্র আরও একবার প্রসঙ্গক্রমে একরাম জানিয়েছেন,

"রোজ হাশরের দিন পর্যন্ত এই রসসিক্ত মাটিই তো বোবা আশ্রয়।"[৮]

আরবি 'হাশর' শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর লোকজন বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর মানুষের যাবতীয় পাপ-পুণ্যের বিচার হবে সেই দিন অর্থাৎ রোজ হাশরের দিন। আল্লার প্রেরিত দূত ইস্রাফিল তাঁর শিঙ্গায় ফুৎকার দিলেই পৃথিবী ধ্বংস হবে — ইসলাম মতে তাই 'কিয়ামত'। সে-দিনই প্রতিটি মানুষের হিসেব-নিকেশ। অর্থাৎ এককথায় 'কিয়ামত' পর্যন্ত মাটিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। কোরানের ৫৫নং আয়াতটি (সুরা আত-ত্বহা) সরাসরি উল্লেখ করে একরাম যেন উপন্যাসটির মর্মকথায় তুলে ধরতে চেয়েছেন:

"মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা'রাতান উখরা।"[৯]

অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই মাটিতেই তোমাকে কবর দেওয়া হবে এবং একদিন তোমাকে এই কবর থেকেই উত্থিত করা হবে। মৃত্যু থেকে কারোর মুক্তি নেই। আমরা জানি, এই চরম সত্যের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া মানুষের অন্য কোনো উপায় নেই। একসময় তিনি বলেন 'ওয়াহুয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম' অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় থাকো না কেন ঈশ্বর সবসময় তোমাদের সঙ্গেই আছেন। হয়তো তাই বলেই গল্পকথক অত্যন্তরকমের ঈশ্বর-বিশ্বাসী। উপন্যাসটির শেষ অংশে এসে দেখি জীবদ্দশায় নরকভাবনা সম্পর্কে এলমেলো গল্পগুলোয় কথকের স্মৃতিপটে যেন ভিড় করে আসছে, আর তিনি একটু ঘুমোতে চাইছেন। সদ্যোজাত ফুটফুটে বাচ্চার সেইসব গল্পকথকের স্মৃতি

থেকে এখনও অপসৃত হয়নি, জ্বরের ঘোরে মৃত্যু কিম্বা নরকের দিকে তাই তিনি এগিয়ে চলেছেন। লেখকের বর্ণনায়—

"নিজের ঠোঁটদুটো প্রাণপণ এগিয়ে দিতে চাইল সুগন্ধে-ভরা, সেই মিষ্টি নরকের দিকে। আহ, প্রাণ!"[১০]

'নরকের মতো অপরূপ বাসভূমিতে' শুয়ে শুয়ে তিনি আরও কত কত বছর এভাবেই 'জরাগ্রস্থ পৃথিবীর অতি-কাঠামো খসে-খসে পড়তে' দেখবেন? উপন্যাসটির 'ব্যাক কভার' অংশে উল্লিখিত কথাটিই যেন একরাম আলির এই উপন্যাসটির সামগ্রিক মূল্যায়ন নির্ণীত হয়েছে— 'বাংলাভাষায় সর্বার্থে একটি নতুন উপন্যাস, যেখানে নরককে গৌরবান্বিত করা হল।' সর্বোপরি বলা যায়, এই উপন্যাসটির মূল আবেদন কেবল একটি পরিবারের পতনের ইতিকথা বর্ণনা করা নয় বরং বলা যায় এই উপন্যাসে ঐতিহ্যের স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটেছে। সেই সঙ্গে বলা যায়, মাটিতে বিলীন হওয়া পর্যন্ত একটি মানুষের পরস্পরবিরোধী যাবতীয় চিন্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে একরাম আলি এই উপন্যাসটির নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। একরাম আলি, 'দিগন্তের একটু আগে', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৭
২। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, ব্যাককভার
৩। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ২৪৭
৪। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৩৪
৫। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৩১
৬। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, 'ব্লার্ব' অংশ
৭। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৫৫
৮। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ১৬৩
৯। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ৯১
১০। প্রাগুক্ত সূত্র — ১, পৃষ্ঠা: ২৪৫

সৌ গ ত মু খো পা ধ্যা য়

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'সমকালীন' পত্রিকায় বাংলায় বিদেশি ও কলকাতা প্রসঙ্গ

১৯৫০ সালে সোস্যালিস্ট মতবাদী সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সংগঠন শুরু হয়েছিল- কনটেমপোরারী রাইটার্স অ্যাসোসিয়েসন। মননশীল প্রবন্ধকার আবু সয়ীদ আইয়ুব ছিলেন এর সভাপতি। সহ-সভাপতি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ ও অনিল চক্রবর্তী। সংগঠন সম্পাদক আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। সংগঠনের মুখপত্র ছিল মাসিকপত্রিকা দ্বন্দ্ব এবং সম্পাদক ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, জীবনানন্দ দাশ ও নরেন মিত্র। পত্রিকার প্রচ্ছদ তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আনন্দগোপাল ১৯৫৩ সালে (প্রথম প্রকাশ ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে) একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যার নাম 'সমকালীন'। প্রথম বছরে প্রচ্ছদ করেন দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। ষষ্ঠ বর্ষে অন্নদা মুন্সী এবং সপ্তম বর্ষে সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায় কৃত প্রচ্ছদটি পত্রিকার শেষ সংখ্যা পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল।

১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সমকালীন' প্রথম ২৫ বছর (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ২৬তম বর্ষ (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) থেকে ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় বছরে চারটি সংখ্যা যথাক্রমে বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক এবং মাঘ মাসে প্রকাশিত হত। পত্রিকা ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ চার দশকের জীবনে অনেক ঘটনার সাক্ষী 'সমকালীন'। পত্রিকায় সমকালীন রাজনীতির বা সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের বিশেষ প্রভাব না থাকলেও পত্রিকাটির বিশেষ বিভাগগুলিতে যেমন সমাজ সমস্যা, আলোচনা ইত্যাদি শিরোনামে তার অল্পবিস্তর ছাপ দেখা যায়। পত্রিকা সম্পাদক আনন্দগোপালের মত হল রাজনীতি ও সাহিত্য এই দুটি আলাদা বিষয়। এদেরকে কখনোই একসঙ্গে মেশানো উচিত নয়। তাই আপাদমস্তক রাজনীতির লোক হয়েও তিনি পত্রিকাকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে বাঁধেননি, বরং সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রেখেছেন। তাঁর কাছে প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে বিচিত্র বিষয় নিয়ে মননশীল প্রবন্ধ ও আলোচনা। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বিপুল তালিকায় বাংলায় আগত বিদেশিদের প্রসঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে কলকাতা প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে এই দুটি প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২

বাংলায় বিদেশি বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আলোচিত হয়েছে- চণ্ডী লাহিড়ীর বিলেতের সাহেব-নবাব (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৬৯); বিদেশীদের চোখে সতীদাহ (ভাদ্র ১৩৭০);

বিদেশীদের রুচি বিবর্তন (আশ্বিন ১৩৭০); বিদেশীদের দেখা টুকিটাকি (কার্তিক ১৩৭০); বাংলায় বিদেশী (১৭৫৭-১৮৫৭) (অগ্রহায়ণ, চৈত্র ১৩৭০); দীপক সেনের ফারুক শিয়রের ফরমান ও ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০); নারায়ণ দত্তর টেভর নিঅর ও সতীদাহ (কার্তিক ১৩৭৩)।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে হুগলী নদীর তীরে ইংরেজরা নিজেদের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করে নিচ্ছিল। ডাচ, ফরাসী, পর্তুগিজ, জার্মান বণিকেরা সে সময়ে বেশ কায়েম হয়ে বাংলার বুকে বেসাতি নিয়ে বসে গেছে। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা হুগলীতে আস্তানা স্থাপন করে। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংবার সুবাদার সুজার কাছে দরবার করে ইংরেজ কোম্পানি এককালীন বাৎসরিক ৩০০০টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেছিল। আলমগীর বাদশাহ হবার পর ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ আর একটি বাদশাহী ফরমান জারি করেন ইংরেজদের স্বপক্ষে। স্থির হয় ৩.৫ শুল্ক দিলেই যাবতীয় শুল্ক থেকে রেহাই পেয়ে ইংরেজরা ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু মোগল কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ইংরেজরা। আইন অমান্য করবার জন্য হুগলীতে তিনজন ইংরেজকে ধরা হয়। ঘটনায় রেগে গিয়ে জব চার্ণক হুগলী শহরে আগুন ধরিয়ে, মোগলদের জাহাজ বিধ্বস্ত করে হিজলীতে পালিয়ে যান। পরে আলমগীর ইংরেজদের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেন। সুরাটের ইংরেজরা ১৫০০০০টাকা অর্থদণ্ড দেয়। বাংলায় তখন মোগল শাসক ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন।

১৬৯৮ সালে অধুনা কলকাতার মূলকেন্দ্রে সূতানুটী, গোবিন্দপুর আর কালিঘাট তিনটি গ্রামের মালিক ছিলেন সাবর্ণ চৌধুরীরা। তারা জমিদারী বেচে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এবং কোম্পানির কাছে মাত্র ১৩০০টাকায় বিক্রি করেন। মোগল বাদশাহকে নজরানা দিতে হল ২০০০০টাকা। আলমগীর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ তক্তে বসেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বাংলার সুবাদার ফারুখশিয়র। কোম্পানির সুযোগ সুবিধাগুলিকে দৃঢ় করবার জন্য প্রয়োজন বাদশাহি ফরমানের। সেই উদ্দেশ্যে ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন দিল্লীতে যান। মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই বাংলার বুকে কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়। (ফারুখশিয়রের ফরমান ও ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন)

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বাংলায় যে সমস্ত বিদেশিদের দেখতে পাওয়া যায় তারা হল ইংরেজ, পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসী, ড্যানিশ, প্রুশিয়ান এবং জার্মানরা। ইংরেজ কোম্পানি সুতানুটিতে ঘাঁটি স্থাপন করে, পর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে। ডেন বা ড্যানিশরা শ্রীরামপুরে সদর ঘাঁটি স্থাপন করে। ফরাসীরা চন্দননগরকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল করে। জার্মানরা 'আলামান' নামে পরিচিত হয়। ১৭৫১ সালে তারা বাংলাদেশে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করতে গেলে ইংরেজদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬২ সালে আফিঙের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সঙ্গে ডাচদের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। ডাচরা প্রায় কোণঠাসা

হয়ে যায়। কিন্তু ভারতের অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে ধীরে ধীরে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। (বাংলায় বিদেশী ১৭৫৭-১৮৫৭)

১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব সম্পূর্ণ পরাস্ত হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার স্থায়িত্ব লাভ করে। মীরজাফর নবাব হলেন এবং কোম্পানির লোকেদের জন্য তোষাখানার দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। সেই সময় গভর্ণর ড্রেক ৩১৫০০ পাউন্ড, ক্লাইভ ২১১৫০০ পাউন্ড, ওয়াটস ১১৭০০০ পাউন্ড, কিলপ্যাট্রিক ৬০৭৫০ পাউন্ড, ম্যানিংহ্যাম ২৭০০০ পাউন্ড, বীচার ২৭০০০ পাউন্ড করে পেয়েছিলেন। এছাড়াও অনেকে হাজার হাজার পাউন্ড লাভ করেছিলেন। ইউরোপের 'সাত বছরের যুদ্ধ' সমাপ্ত হবার পরেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাগ্যান্বেষীরা ভারতে চলে আসে নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর আশায়। এদের মধ্যে সেনাদল পরিত্যাগী, জাহাজি নাবিক, বোম্বেটে জলদস্যু, ব্যবসায়ী সবরকম লোকই ছিল। কিন্তু কোম্পানির লোকেরা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় লুঠ করেছে। তাদের যা মাইনে ছিল তাতে দুবেলা ভালোমতো অন্ন সংস্থানও সম্ভব ছিল না। কিন্তু উপরি পাওনার সুযোগে তারা হয়ে উঠেছিল 'বিলেতের হঠাৎ নবাব'। এজন্য স্বদেশে সেই হঠাৎ নবাবদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপেরও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। (বিলেতের সাহেব-নবাব)

পলাশী যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইংরেজদের মনে বা আচরণে কোন আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রকাশ পায়নি। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের ইংরেজ কুঠির অবস্থা বর্ণনাকালে পিটার মান্ডি লিখেছেন, "সাধারণতঃ আমরা ভাত, খিচুড়ি, দোপেঁয়াজি ও আমের চাটনি খাই। আমরা যখন বাইরে যাই, মাথায় দিই পাগড়ি। কাঁধে থাকে সাদা লিনেনের কোট। কোমরে ব্রিচেস, পায়ে জুতো, আর দুই পাশে ছোরা ও তলোয়ার।" ভারতীয় খানা ও পোষাক পরার রেওয়াজ তারপরেও বহুকাল পর্যন্ত চলেছিল। নেটিভদের মতো হুকো টানতে, তাড়ি খেয়ে নেশা করতে বা বাইজিদের নাচের আসরে বসতে ইংরেজদের প্রেস্টিজে বাঁধতো না। হেস্টিংস এর সময় ছিল ইংরেজ ও ভারতীয়দের অবাধ মেলামেশার কাল।

পলাশির যুদ্ধের পরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ইংরেজ ললনারা বেশি সংখ্যায় ভারতে আসতে থাকে তাদের স্বামীদের সঙ্গে বসবাস করবার জন্য। উনিশ শতক থেকে ইংরেজ সমাজে পরিবর্তন আসে। নাচে যাওয়া, হুকো খাওয়া বন্ধ হল, দেশি মদে অরুচি দেখা দিল। বিজয়ীর জাত হিসেবে ইংরেজের মনে অহঙ্কার দেখা দিল। ক্লাইভ ও হেস্টিংস যতদূর সম্ভব শাসনকার্যে ভারতীয় নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ণওয়ালিসের আমলে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হল। তিনি শাসনকার্য থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন দিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এক অভিজাত পদলেহী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলেন। তিনি প্রত্যেক ভারতীয়কে দুর্নীতিপরায়ণ মনে করতেন। ওয়েলেসলির সময়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে প্রভূত বেতন পার্থক্য দেখা দিল। বৌ প্রতিপালনের ক্ষমতা হলেই ইংরেজরা বিয়ে করে। নব বিবাহিত দম্পতি হয়ে পড়ে যাবতীয় ইংরেজি কুসংস্কারের বোঝা। তারা তখন

ভারতকে ঘৃণা করে। এইভাবে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে বাড়তে ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। (বিদেশীদের রুচি বিবর্তন)

ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথা ছিল একটি অমানবিক এবং বর্বর প্রথা। বিদেশিদের চোখেও ধরা পড়েছে সেই বর্বরতা। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বর্ণনায় গ্রিক ঐতিহাসিক ভারতীয় রাজপুতদের মধ্যে সতীদাহের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করেছিলেন। জন ব্যাপিস্তা টেভর নিঅর, এই বিদেশি পর্যটক সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ শক্তির বলে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে সতীদাহের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল সেগুলি গ্রন্থন করে তার একটা সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মত তিনি এই শোকাবহ ঘটনাগুলি দেখে নির্লিপ্ততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। মুঘল আমলে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মুঘলরা সতীদাহের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন না। সম্রাট আকবর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহি ধর্মে সতীদাহের নিন্দা করা হয়েছে।

টেভর নিঅর রাজপুতদের সতীদাহ যেমন দেখেছিলেন তেমন দিল্লী, আগ্রাতেও সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রাজপুতদের সতীদাহের বর্ণনা বলেছেন, যেসব জায়গায় নদী বা পুষ্করিণী আছে সেখানের তটে প্রায় বারফুট চারচৌকো একটি কুঁড়েঘর তৈরি করা হত। কাঠকড়ি দিয়ে তৈরি এই ঘরে কিছু তেল ও অন্যান্য নানা দাহ্য সামগ্রী রাখা হত যাতে শবদেহ সহ চিতা সহজেই পুড়ে যায়। এই কুঁড়েঘরের ভেতরে সতী অর্ধশায়িত হয়ে থাকতেন। তাঁর উপাধান হত কয়েক বান্ডিল কাঠ। আর পিছনের একটি খুঁটিতে সতীর কোমরের কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত কোন ব্রাহ্মণ। এই অবস্থায় সতী তাঁর কোলে মৃত স্বামীকে রেখে সারাক্ষণ পান চিবোতেন। প্রায় আধঘন্টা এই অবস্থায় কাটাবার পর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সেই ঘরে ঘি এবং তেল ঢেলে তারপর অগ্নিসংযোগ করা হত।

করমণ্ডল উপকূলে সতীদাহের বর্ণনাটি নিম্নরূপ। করমণ্ডল উপকূলে সতীদাহের জন্য একটি নয়-দশ ফুট গভীর এবং পঁচিশ-ত্রিশ ফুট চৌকো গর্ত তৈরি করা হত। তাতে আগে বহু কাঠ এবং অনেক দাহ্য পদার্থ ফেলে রাখা হত। যখন সেই ভূমধ্যস্থ চিতা বেশ জ্বলে উঠত তখন মৃত ব্যক্তিকে সেই গর্তের ধারে শুইয়ে দেওয়া হত। এরপর মৃত স্বামীর সতী স্ত্রী আসতেন সখী পরিবৃতা হয়ে। নৃত্যরত অবস্থায় আসতেন, মুখে থাকত পান, সঙ্গে সঙ্গে বাজত ভেরী, পটহ, মৃদঙ্গ। সতীরমণী তিনবার সেই গর্তটি প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণ সেরে তাঁর সখী ও আত্মীয়স্বজনকে আলিঙ্গন করত। তিনবার ঘোরার পর ব্রাহ্মণরা মৃতদেহটি আগুনে ফেলে দিত। এরপর রমণীটি চিতার দিকে পেছন করে দাঁড়ালে ব্রাহ্মণরা তাঁকেও ঠেলে গর্তের মধ্যে ফেলে দিত। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও শ্মশানবন্ধুরা সেই গর্তে ঘি এবং তেল ঢালতে থাকত।

করমণ্ডল উপকূলে আর একপ্রকার সতীদাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রথায় ব্রাহ্মণ নরনারীর সাধারণ দৈর্ঘ্যের এক ফুট বেশি গর্ত করত। সেই গর্তে মৃতকে খাড়া করে

রাখা হত। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াত তার স্ত্রী। এরপর বন্ধুস্বজনরা মৃত স্বামী ও জীবন্ত স্ত্রীর উপর বালির বোঝা ঢালতে থাকত। গর্ত বুজে গেলেও বালি ঢেলে তার উপর ঢিবি তৈরি করা হত। এই ঢিবির উপর আত্মীয়স্বজনদের নৃত্য শুরু হত। বাংলাদেশের সতীদাহ প্রথাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। (টেভর নিঅর ও সতীদাহ)

উইলিয়াম কেরী ১৭৯৯ সালে একটি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তার বিবরণ দিয়েছেন। এশিয়াটিক জার্ণালে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর মিশনের পণ্ডিত মার্শম্যান এবং বিশপ হেবারের মধ্যে সতীদাহ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। ক্যালকাটা জার্ণালে সতীদাহের অনেক বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল। সতীদাহের নিন্দা করে এবং সরকারী অকর্মণ্যতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে যেমন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তেমনি প্রগতিশীল, সতীদাহ বিরোধী হিন্দুদের পত্রও ইউরোপীয় সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন। (বিদেশীদের চোখে সতীদাহ)

বিদেশিরা যেমন আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথা প্রত্যক্ষ করেছেন তেমন মশা, ব্যাঙের ডাক, তাড়ি, চৌকিদার, ভ্যাগাবন্ডদেরও দেখেছিলেন। সেই দেখার চোখ কেমন ছিল তার বিবরণও পাওয়া যায়। যেমন তাড়ি। আঠারো শতক পর্যন্ত ভারতের প্রধান মদ আরক। জনৈক ক্যাপ্টেন সিম্পসনের বর্ণনা থেকে জানা যায় আরক তৈরি হত চাল বা তাড়ি থেকে। কখনও বা চিনির রস থেকে। এর সঙ্গে মেশানো হত বাবুল গাছের রস। তখন একে বলা হত 'জাগর আরক'। তাড়ি সম্পর্কে তার মন্তব্য, "It effects the head as much as English Beer. In the morning it is laxative and in the evening astringent."। আরকের পর পাঞ্চও ইউরোপীয় মহলে পানীয় হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল। আরক গোলাপ জল, চিনি ও জল মিশিয়ে পাঞ্চ তৈরি হত। যেমন ষাঁড়। ষাঁড়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কলকাতার সাহেবরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ১৮১৫ সালের আগস্ট মাসে শহর থেকে তাদের বিতাড়িত করে হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময় ষাঁড়কে মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা বহনের কাজেও লাগানো হত। প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক। (বিদেশীদের দেখা টুকিটাকি)

৩

কলকাতা বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি আমরা পাই সেগুলি হলো চণ্ডী লাহিড়ীর কলকাতার প্রতিরক্ষা-১৭৪২ (পৌষ ১৩৬৯); নারায়ণ দত্তর কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র (আশ্বিন ১৩৭৪); কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল (চৈত্র ১৩৭৪); কোম্পানীর নথিপত্রে আদিকলকাতার দিশি চাকুরে (আশ্বিন ১৩৭৫); পুরনো কলকাতা ও একটি জীবনীকাব্য (কার্তিক ১৩৭৬); পঙ্কজকুমার দত্তের চিড়িয়াখানার রূপরেখা (চৈত্র ১৩৮১)।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার গোটা ছবি পাবার নির্ভরযোগ্য কোন উপায় নেই। আকর তথ্য হিসেবে বিদেশি পর্যটকদের ডায়েরি, ভ্রমণকাহিনি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে ব্যক্তিচিন্তার মিশেল হয়ে সত্যকে আচ্ছন্ন করেছে। এদিক থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নথিপত্র একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কোম্পানির নথিপত্র থেকে ১৭০৩ থেকে ১৭১১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোম্পানির দেশি কর্মচারীদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়। ব্যবসাপত্রে যাতে ঢিলে না পড়ে, অসুবিধা না হয় সেই সবের তদারকির জন্য নবাবী দরবারে কাজ করতেন উকিলরা। এরপর আছে জমিদার যারা কোম্পানির হয়ে খাজনা আদায় করবে। তারপর বেনিয়ান, দালালরা। জমিদারি, চালাবার জন্য কোম্পানি নিয়োগ করত কোতোয়াল, রাইটার, পিয়ন, পাইক, খাজনা আদায়কারী তহশিলদার, নির্দেশ প্রচারের জন্য ঢুলি ও শিঙাবাদক এবং হালালখোর। তাদের মাইনেরও হিসাব কোম্পানির নথি থেকে পাওয়া যায়। আদি কলকাতার দেশি চাকুরে হিসেবে এদেরকেই চিহ্নিত করা যায়। (কোম্পানীর নথিপত্রে আদিকলকাতার দিশি চাকুরে)

কোম্পানির নথিপত্র থেকে জানা যায় ১৭১০ সালে কলকাতায় খুব ভারী একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। চারদিকে চালের আকাল পড়ে যায়। এই সময় কলকাতার বন্দরে দু'তিনটে জাহাজ চালের জন্য এসে ভিড়েছিল। কোম্পানি প্রথমেই চালের মূল্য বেঁধে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে কোম্পানির নিজের গুদাম থেকে নির্ধারিত দামে পাঁচশ মণ চাল বাজারে ছেড়েছিল। ১৭৩৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কলকাতা আবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। প্রায় তিন হাজার লোক এই ঝড়ে মারা যায়। কলকাতায় পরবর্তী দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৭৫১ সালে। কোম্পানি এই সময় চাল ও তেলের শুল্ক মকুব করে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য কোম্পানি ১৭৬০ সালে চালের রপ্তানি একদম বন্ধ করে দেয়। ঐ বছর কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা এবং লক্ষ্মীপুর কুঠিতে চাল সংগ্রহের জন্য টাকা পাঠিয়েছিল। কোম্পানির কাগজপত্র থেকে সেকালের দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, চালের বাজার, চালের দাম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। (কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার সমাজচিত্র)

কলকাতায় প্রথম হাসপাতাল তৈরি হয় সামরিক কারণে। হাসপাতাল তৈরির জন্য কোম্পানির ক্যাম্প থেকে দেওয়া হয় দুহাজার টাকা। দেশি বিদেশি যে সমস্ত জাহাজ কলকাতা বন্দরে ভিড়বে তাদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কলকাতার বাসিন্দাদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায়ের হুকুম হয়। হাসপাতাল তৈরির দায়িত্বে ছিলেন কোম্পানির স্টোরকিপার আব্রাহাম অ্যাডামস। ১৭১৩ সালের ২০ আগস্ট হাসপাতালের জন্য ডাক্তারদের সুপারিশ থেকে জানা যায় তিরিশটি চৌকি আর বিছানাপত্র, কুড়িটি গাউন সরবরাহ করা হয়। অসুস্থদের দৈনিক টাকা দিতে হবে। সেই হার ছিল সাধারণ সৈনিকদের চার আনা, কর্পোরেল ছয় আনা এবং সার্জেন্ট আধুলি। হাসপাতালের পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। একজন স্টুয়ার্ড রাখা হয় যার মাইনে তিরিশ টাকা ইত্যাদি। এই সুপারিশ ও নিয়ম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। (কোম্পানীর নথিপত্রে কলকাতার প্রথম হাসপাতাল)

মারাঠা আক্রমণের ভয়ে কলকাতার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল। যদিও অধিক ব্যয়বহুলতার জন্য সেই পরিকল্পনার প্রায় সমস্তটাই বাতিল

হয়েছিল। প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন হলকম্ব। তারপর ফরেস্টি। এই দুজনের প্রস্তাবের বেশিরভাগই ছাঁটাই হয়ে যায়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মূল কেল্লার মধ্যে যেসব করা হয়েছিল তা হল—গানরুমে একশো লোক নিয়োগ করা হয়। খাদ্যশস্য মজুদ করা হয়। ১২০টি মাস্কেট গান কেনা হয়। ৫০০টি তলোয়ার কেনা হয়। মাদ্রাজ থেকে ৭৫০টি বড় কামানের ব্যবস্থা করা হয়। যদিও মারাঠারা কলকাতা আক্রমণ না করেই বাংলা থেকে বিদায় নেয়। (কলকাতার প্রতিরক্ষা- ১৭৪২)

কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে চিড়িয়াখানার প্রতিষ্ঠায় পথিকৃতের ভূমিকার পালন করেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ব্যারাকপুরে গভর্নর জেনারেলের জন্য আবাস স্থাপন করা হয়। প্রায় ৩৫০ একর জুড়ে বাগ-বাগিচা সহ এই উদ্যানবাটিকে মনোরম করে গড়ে ওয়েলেসলি। উদ্যানবাটির উত্তর পূর্ব ভাগে তিনি একটি চিড়িয়া ও জানোয়ারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২১ সালের ২৫ আগস্টের সমাচার দর্পণ-এ এবং ১৮২৩ সালে ব্যারাকপুরে পরিভ্রমণে আসা কলকাতা মেট্রোপলিটনের বিশপ হিবারের বিবরণ থেকে এখানকার পশুপাখিদের সম্পর্কে জানা যায়।

ঊনবিংশ শতকে দেশীয় নৃপতি, অর্থশালী পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলকাতা এবং তার আশেপাশে কতকগুলি জানোয়ারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চিৎপুরে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, দমদমে জেনারেল হার্ডউইক, চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যার নবাব এবং বর্ধমানের মহারাজের জানোয়ারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে জীববিজ্ঞানের উৎসাহী বেশ কয়েকজন কৌতূহলী মানুষ ও উৎসাহী গবেষক কলকাতা ও তার আশেপাশে বাস করতেন। কলকাতায় একটি বিজ্ঞান সম্মত পশুশালা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে তাঁরা প্রায়ই আবেদন জানাতেন। এই সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল বাংলার লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হন। পশুশালা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ঠ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার কলকাতায় একটি পশুশালা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং একটি কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট গঠিত হয়। লর্ড উলিফ ব্রাউন কমিটির সভাপতি এবং সি ই ব্রাউন কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

বাংলার সরকার পশুশালার ঘরবাড়ি ও বাগান তৈরির জন্য আলিপুরে প্রায় তেত্রিশ একর ভূমি দান করেন। মূলধনী ব্যয়ও প্রধানত সরকার বহন করেন। পশুশালার প্রথম জন্তুটি আসে ১৮৭৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ইংলন্ডের তৎকালীন যুবরাজ পশুশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জনসাধারণের জন্য ঐ বছরেরই মে মাসের পয়লা তারিখে এর দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। (চিড়িয়াখানার রূপরেখা) চিড়িয়াখানার আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। কলকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানার এই ইতিহাস আমাদের কাছে চিড়িয়াখানাটির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করেছে।

১২৭৩ সালে লিখিত নন্দরাম সেনের অধস্তন পুরুষ জয়ন্তীচন্দ্র সেনের লেখা কাব্যে পুরোনো কলকাতার চিত্র পাওয়া যায়। কলকাতার প্রাণপুরুষ নন্দরাম সেনকে নিয়ে লিখিত এই কাব্যে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে অতিরঞ্জন থাকলেও আদি কলকাতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিতান্ত অবহেলা করা যায় না। সেই হিসেবে কাব্যটি মূল্যবান। (পুরনো কলকাতা ও একটি জীবনীকাব্য)

আদ্যন্ত প্রবন্ধের একটি পত্রিকা 'সমকালীন'-এ এই মহামূল্যবান প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই পত্রিকা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকাটি যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। ১৩৬০ বঙ্গাব্দে একটি কবিতার পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল-'কৃত্তিবাস'। কবিতার এই পত্রিকাটিকে শিক্ষিত বাঙালি মনে রেখেছে। কিন্তু 'সমকালীন'-এর মতো মননশীল পত্রিকা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।

*বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সৌগত মুখোপাধ্যায়ের 'সমকালীন' পত্রিকার উপর গবেষণা সন্দর্ভ।

অ জ য় কৃ ষ্ণ ব্র হ্ম চা রী

লোক সংস্কৃতির নিরিখে বাংলার সূর্যপূজা

সূর্যের অপর নাম আদিত্য। বাংলায় বিশেষ প্রচলন ইতু ব্রত। আদিত্য শব্দ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে ইতু নামকরণ। যথা— আদিত্য > আইচ্চ > আইচ > আইত > ইত > ইতু।

বহু ধর্ম প্রিয় ব্যক্তি আজও গঙ্গায় পুকুরে স্নানের পর সূর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে উদাত্ত কণ্ঠে'—

"ওঁ জবা কুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম।"

সূর্য পূজা জনজীবনে এক তেজময় রূপের ভাস্বর। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রাত্যকৃত্য সেরে স্নান করার সময় সূর্যকে পূজা করা হয়। স্নানকালে নাভি পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে দুই হাতে জল নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে সূর্য মন্ত্র পাঠ করার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন শুরু হত। বর্তমানে এই ধারা অনেকাংশে কমে গেছে। প্রথমত: নেই পুকুর। নেই তেমন কোনও জলাশয়। যদিবা কোথাও আছে বিশ্বাসের অভাবে উক্ত নিয়ম থেকে অনেকেই সরে আসছে। বিশ্বাসটা কিসের? বিশ্বাসটা সংস্কৃতির। লোক সংস্কৃতির নিরিখে যে কোনো নিদান বা বিধান জগতে উঠে এসেছে তা যেমন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তেমনই সর্ব কু শোধনেও তৎপর। সকালে ঘুম থেকে উঠলে আয়ু বৃদ্ধি হয়। হার্ট ও মন ভালো থাকে। চর্মরোগ এবং চক্ষু রোগ থেকেও নিস্তার পাওয়া যায়। সেই সাথে সকাল সকাল স্নান করা মানে প্রাতঃকৃতের ন্যায় শরীরের রোম কূপের রোমগুলি শুদ্ধ ও মুক্ত হয়ে যায়। যার ফলে মানুষের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের ধারাটি অব্যাহত হয়। মানুষ সুস্থ ও স্বাস্থ্যোজ্বল এক নিরোগ জীবন লাভ করে। পাশাপাশি পুকুর, নদী ও জলাশয়গুলো নিজস্ব স্বার্থেই পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। উদিত সূর্যের ন্যায় তেজোদীপ্ততার সাথে কর্মে অটুট থাকার মন্ত্র যাপিত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে কেন, কী কী হবে। এই প্রশ্ন ও সঠিক উত্তরের ব্যাখ্যা না পেয়ে মানুষ সেই সব ধারা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছে। সব কিছুর মধ্যে লাভ খোঁজার চেষ্টায় মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সূর্য পূজা ও তার নিয়মকানুনের মধ্যে যে জীবন সুন্দর ও সুস্থ হয়, তার ব্যাখ্যা নিজে নিজেই জানতে পারত যদি তারা সংস্কারকে 'কু' না বলে 'সু' নজরে দেখত। বর্তমানে গঙ্গা-সহ নানান জলাশয়গুলো যে-হারে দূষিত হচ্ছে তা সমাজের অস্বচ্ছ পরিবেশ দেখলেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে অনেক কিছু জানা যায়, কিন্তু বলা যায় না, বোঝানো যায় না। মানুষের চেতনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, ফলে সব কিছু প্রাকটিক্যাল দেখতে চাইছে, না পেলে তার বিশ্বাস যোগ্যতা হারাচ্ছে। এই করেও সূর্যপূজা বহুলাংশে কমে যাচ্ছে। সূর্যপূজা কমে যাওয়ার আরো কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থাভাব। অর্থের নেশায়, উপার্জনের নেশায়

অধিকাংশ মানুষই সময় মতো স্নানাদি করতে পারে না। কিছু মানুষের মধ্যে পৌরাণিকত্ব বিরাজ করে বলে দেখা যায় গাঁ-গ্রামে মধ্য দুপুরে পুকুর জলে ডুব দিয়ে সূর্য প্রণাম করছে, কেউ বা চাতালের কুয়োয় স্নান করে সূর্য প্রণাম করছে। তবে তাও অনেক কম। আরেক দিকে দেখা যায় প্রকৃতির বুকে ধরণীর হৃদয় চিরে প্রকাশিত বৃক্ষ লতাগুল্ম। এই সকল বৃক্ষরাজিও সূর্য কিরণেই পুষ্ট। বৃক্ষরাজির ফলেও মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে সুস্থ থাকে। বৃক্ষের আহার সংগ্রহ করা, বেঁচে থাকা সব কিছুই নির্ভর করে সূর্যের উপর। সুতরাং মানুষের জীবন প্রবাহ সূর্যের উপরই নির্ভরশীল। সেই সূর্যকে পূজা করে তাই আত্মতৃপ্তি লাভ করা। বর্তমানে টোল পন্ডিতেরা এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা নিত্য নৈমিত্তিক সূর্য পূজা পালন করে থাকে। কিছু কিছু অন্য সম্প্রদায়গণও এই সূর্যপূজা করে থাকে। নানান প্রকার কু-গ্রহের প্রভাব কাটাতেও সূর্য প্রণাম ও পূজা হয়ে আসছে। ভারতের ধ্রুপদী লোক সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে সূর্য সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ হয়েছে তা হল—প্রথমত: সূর্যের স্বরূপ ও মহিমা। দ্বিতীয়ত: সূর্য চেতনার নিরিখে ধর্ম, কৃষি ও ব্যাধির উদ্ভব ও বিনাশ হয়। এখন আধুনিক সমাজে অনেকে সূর্য পূজা থেকে বিরত কিন্তু ডাক্তারের কথায় সূর্যস্নানে মশগুল।

সেদিনের সংস্কার যদি আজকের কুসংস্কার হয়ে থাকে তবে অনায়াসেই বলতে হয় আজকের অনাচার, অত্যাচার ও রোগপোষণ দেহ সংস্কারবিহীন রোগেই উদ্যাপিত। আদিমতার অসভ্য সংস্কৃতি থেকে ধীরে ধীরে জামা-কাপড় পরে আমরা সভ্য হইনি বরং জামা-কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি আমাদের উচ্ছৃঙ্খল মনকে, নিতান্ত অসভ্যতাকে। প্রকৃতপক্ষে সেদিনের আদিমতাই ছিল প্রকৃত সভ্যতা। সে যুগের মানুষ সংস্কার মেনে যশ ও আয়ু বৃদ্ধি করেছে। মাটি বিচালীর বাড়ি ছিল বলে আজ অট্টালিকা হাঁকাতে পারছে। সেই সময়ের মানুষ গাছ-পালা ও সূর্যকে মেনে ছিল বলে আজ তার অংশাংশ নিয়ে রোগ প্রতিষেধক ঔষধ তৈরি হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে। এই সূর্য পূজা আজকের নয়, সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল এই পূজা। সেই সময়ের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যেই ছিল সৌর উপাসকের দল। ইরানে অগ্নি উপাসক ছিল। পাশাপাশি সূর্য উপাসকও ছিল। সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ বাঁধলে সূর্য উপাসকেরা উক্ত দেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেশে এঁরা 'মগ' নামে পরিচিত ছিল। এই মগেদের দ্বারাই ভারতে সর্ব প্রথম সূর্য পূজা চালিত হয় এবং সূর্যমন্দির গঠিত হয়।

হিমাচল প্রদেশে 'কুলু' জেলা অবস্থিত। এই কুলু জেলায় 'বজোরা' নামে একটি গ্রাম ছিল। ষষ্ঠ শতকে একটি পাথরের সূর্য মূর্তি পাওয়া যায় এই বজোরা গ্রামে। পায়ে জুতো, কোমরে ঘাঘরা এবং লম্বা কোর্ট পরিহিত ছিল দীর্ঘদেহী মূর্তিটির। মূর্তিটির দু'হাতে ফুল শোভিত এবং মাথায় মুকুট পরিহিত। ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্য করেন, ইরানী ও কুষাণ জাতির পোশাকের সাদৃশ্য দেখা যায় মূর্তিটির মধ্যে। মাথায় মুকুট দেখে অনুমান করা হয় মূর্তিটি

ভারতীয়। গুপ্ত যুগ শুধু নয়, গুপ্তত্তোর যুগে বাংলাদেশে সৌরধর্ম আংশিক স্থান করে নেয়। একই বিশিষ্ট সৌর সম্প্রদায় গড়ে ওঠে এই বাংলাদেশে।

শুধু ধর্ম নয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপরও সূর্যের বহুবিধ গুণ লক্ষিত হয়। যথা— সূর্যের কিরণ শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে সহায়তা করে। সূর্য থেকে উদ্ধৃত প্রাণ। তেমনই বসুন্ধরা থেকে উদ্ধৃত বৃক্ষ। লতা-পাতা, ফুল ও ফল সূর্য ব্যাতীত এ সকলের কোনও অস্তিত্বই নেই।

ধরিত্রীর নাম সূর্য। তাই ধরিত্রী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'সূর্যসনাথা'।

ঋক বেদে দেখা যায়, আর্য জাতির প্রাচীন এক দেবতার নাম 'মিত্র'। যিনি ঋষিদের উপাস্য। সমগ্র পৃথিবীতে মিত্র দেবতার পূজার তারতম্য আলাদা হলেও উদ্দেশ্য ছিল এক। এই মিত্র দেবতা তেজের অধিকারী দেব স্বরূপ মিত্র, মিহির, মিত্রস মিত্রেকা, মাইলিত্তা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন দেশে যথা- পারস্য, ইথিওপিয়া, মিশর, গ্রীস এবং ভারতেও পূজিত হতেন। রোম সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি হেতু জার্মানেও উক্ত পূজার সূত্র মেলে। এই মিত্র দেবতা থেকে ইতু ব্রতের প্রাদুর্ভাব। যথা— মিত্র > মিত্ত > মিত > মিতু > ইতু।

পাকিস্তানের সুলতান জেলায় সূর্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মেলে। গুজরাটে প্রভাসপত্তনে বর্তমানে মূর্তিহীন সূর্যমন্দির আছে। উড়িষ্যার কোনারকের সূর্য মন্দির আজও বিখ্যাত। কাশ্মীরে মার্তন্ড নামে ছিল সূর্য মন্দির। বিহারের হাজারীবাগে, সহরসা জেলা এবং গয়া জেলায়ও সূর্য মন্দিরের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

ইরানে সূর্য ও অগ্নি উপাসকের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সূর্য উপাসকগণ ভারতে প্রবেশ করেন এবং এরা মগ নামে প্রচারিত। এই মগেরাই ভারতে সর্বপ্রথম সূর্যপূজা সহ মন্দির স্থাপন করেন।

হিমাচলে কুলু জেলার বজোরা গ্রামে একটি প্রাচীন সূর্য মন্দিরের হদিশ মেলে। সূর্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণে যে ঋতু আবর্তিত হয় তার ফলে ধরণী শস্যপূর্ণা হয়। তাই ফসল ঘরে তোলার সময় বাংলার কৃষকেরা সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করে।

এই সূর্য বা সৌর উপাসকগণ প্রাচীন ও মধ্য যুগে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল।

বাংলাদেশের চুঙ্গীর ব্রত ও পশ্চিমবঙ্গের ইতু ব্রত প্রকারান্তরে সূর্যেরই পূজা। বাংলাদেশে এই পূজার প্রচলন হয়ে আসছে কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে। এপার ওপার বঙ্গের রমণীরাই প্রধানত এই পূজা করে থাকে। রবি গ্রহ যখন বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিটি রবিবারেই রমণীরা এই ব্রত লালিত করে।

সূর্য রশ্মি ছটায় পরিপূর্ণ। তিনি আটটি সংখ্যায় ভূষিত। যথা—নিজের সাতটি রশ্মি এবং ঘোড়া সংযুক্ত স্বয়ং সূর্যদেব এই মোট আট সংখ্যা। সুতরাং এই ব্রতের মূল উপকরণ আটটি। ব্রত কথাতেও উল্লিখিত—

হাতে অষ্ট চাউল অষ্ট, দূর্বা লয়ে।
শোন সবে ইতুকথা ভক্তিযুক্ত হয়ে।।
ইতুদেবের বর।
ধন ধান্যে পুত্রে-পৌত্রে ভরে উঠুক ঘর।।

যারা ব্রত রক্ষা করে থাকে তারা আটটি দূর্বা এবং আটটি আতপ চাল নিয়ে ব্রত কথা শোনে। সূর্যদেবের প্রভাব প্রতিপত্তি মাটিতেই। তাই তার পূজায় মাটির উপকরণ লাগে। সেখানে শুধু মাত্র মাটি ব্যাবহার না করে মাটির সরা ও ঘট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাটির সরার মধ্যে ভিজে মাটি নিতে হয়। এবং তাতে ধান, গম, যব, শর্ষে, মোটর ও ছোলার দানা রোপন করা হয়। মাটির সরায় গঙ্গা জল নিয়ে প্রতি রবিবার সূর্যমন্ত্র পাঠ করে তা সিক্ত করা হয়। ব্রতের দিন নিরামিষ গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ নিজ গৃহে উক্ত পূজা না করে মন্দিরেও করে থাকে। রবি বৃশ্চিক রাশি ত্যাগ করলে শঙ্খ বাজিয়ে উলু ধ্বনি দিয়ে ইতুর ঘট জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এই পূজার ব্রত কথা দীর্ঘ। সংক্ষেপে বলছি—'উমা' ও 'ঝুমা' নামে এক ব্রাহ্মণের দুইটি কন্যা সন্তান ছিল। মতান্তরে সেই কন্যা দুইটির নাম ছিল— 'উমনো' ও 'ঝুমনো'। ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। একদিন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাওয়ার ইচ্ছা হলে ব্রাহ্মণী পিঠের সরঞ্জাম আনতে বললেন। অর্থাভাব নিত্য তবু ব্রাহ্মণ পিঠের লোভে বহু কষ্টে পিঠের সরঞ্জাম সংগ্রহ করলেন। ব্রাহ্মণী পিঠে তৈরি করলেন। কিন্তু ঐকান্তিক পিঠের লোভে ব্রাহ্মণ কন্যাদের পিঠে দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু স্নেহ বৎসলা ব্রাহ্মণ গৃহিণী ব্রাহ্মণকে আড়াল করে দুই কন্যাকে পিঠে খাওয়ালেন। জানতে পেরে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ মামারবাড়ি যাওয়ার নাম করে দুই কন্যাকে রেখে আসে বনবাসে। বনের মধ্যে তারা ভীষণ কষ্টে দিনযাপন করতে থাকে। একটি সুফল লাভ হয়েছিল সেই কন্যা দুইটির। তা হল, বন পথে থাকবার দরুণ তাদের সাথে দেবকন্যাদের পরিচয় লাভ হয়। দেবকন্যারা বন পথে রাত্রিবেলা প্রকাশিত হতেন। উমা ও ঝুমার কষ্ট জানতে পেরে দেবকন্যারা তাদের ইতুপূজা করবার বিধান দিল। সেই মত দুই বোন ইতুর ঘট মাথায় নিয়ে নিজ বাড়ি ফেরে। এবং দারিদ্রের মধ্যেও নিষ্ঠাভরে ইতু ব্রত পালন করে। ইতু পূজা করবার ফলে ব্রাহ্মণেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

ইতু পূজার পরে ব্রাহ্মণের বাড়ি বেশ স্বচ্ছলতায় কাটছিল। একদিন রাজা তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বনে যাত্রা করলেন শিকার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বনপথে প্রচন্ড ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হলেন রাজা-সহ অন্যান্যরা। রাজা নির্দেশ করলেন, স্থানীয় কোনও বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসো। দেখ যেন সেই জলে সকলের তৃষ্ণা মিটে যায়। বেশ কিছু সৈন্য জল খুঁজতে খুঁজতে সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। এবং তাদের সকলের তৃষ্ণার্তের সংবাদ জানিয়ে, জল চাইলেন। ব্রাহ্মণ কন্যারা তাঁদের এক ভাঁড় জল দিল এবং রাজার জন্যও এক ভাঁড় জল

পাঠাল। ব্রাহ্মণ কন্যারা বলে দিল, এই জলেই সকলের তৃষ্ণা মিটবে। দূর থেকে রাজা সৈন্যদের হাতে দুইটি ছোট ছোট ভাঁড় দেখে কুপিত হলেন। জানলেন, এই ভাঁড় দুইটি ব্রাহ্মণ কন্যারা দিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যাদের উপর কুপিত হলেন। কিন্তু সৈন্যরা সামনে এসে এই ভাঁড়ের বৃত্তান্ত জানালেন। রাজা পরীক্ষা করলেন। দেখলেন সত্যি সত্যিই সেই ভাঁড়ের জলেই সকলের তৃপ্তি হয়েছে। রাজা সন্তুষ্ট হলেন এবং ঘোষণা করলেন এই ব্রাহ্মণের দুই মেয়ের সাথে আমাদের রাজসভার দুই মন্ত্রীর বিয়ে দেওয়া হবে। এই বিয়ের সংবাদ ব্রাহ্মণের কানে পৌঁছাল। মহা ধুমধামে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল।

সময়টি ছিল অগ্রহায়ণ মাস। বিয়ের পরের দিন ছিল রবিবার। ইতুপূজার দিন। নিয়ম করে যে পূজা উমা ও ঝুমা করে এসেছে। এই প্রথম সেই পূজা করতে ভুলে গেল বড় মেয়ে উমা। ঝুমা পূজা করে যাত্রা করে শ্বশুরবাড়ি। ফলে সব দিকে তার শুভ লক্ষণ দর্শিত হয়। কিন্তু উমা শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে সকল কিছু অশুভ লক্ষণ প্রতিভাত হতে দেখল। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার ঝুমা ইতু পূজায় উমাকে উৎসাহিত করলেও উমার ইচ্ছাতেই তা পণ্ড হতে থাকে। কিন্তু ঝুমা তাঁকে নানান ভাবে সহযোগিতা করায় উমা সেই ব্রত নিষ্ঠা ভরে পালন করল। এবং পুনরায় ইতু পূজার ফল লাভ করল। কিছু দিন পরে উমার ঘর আলো করে কার্তিকের মতো এক পুত্র সন্তান আসে। উমার সুখ বৃদ্ধি হতে থাকে। সূর্যপূজাকে কেন্দ্র করে যেমন ইতুব্রত পালিত হয়, ঠিক তেমনই রালদুর্গা বলেও একটি ব্রত পালিত হয় প্রকারান্তরে সেই পূজা হয় সূর্য উপাসনাকে কেন্দ্র করে। পূর্ব ময়মনসিংহে রাল শব্দটি রাউল নামেই প্রচলিত। মিশর দেশে সূর্যের আরেক নাম 'রা'। সুতরাং 'রা' 'রাউল'। তৎসম শব্দে রাতুল > রাউল > রাল শব্দটি মেলে। অতি মাত্রায় সূর্যের লাল রং বোঝাতেই 'রাল' শব্দটির উত্থাপন। এই পশ্চিমবাংলাতেই এই পূজার প্রচলন আছে। এই পূজার ফলে সূর্যকৃপা লাভ হয়। যাদের রবি গ্রহ খারাপ বা নিচস্থ তারা এই ব্রত পালন করে। ফলে কুপিত রবি গ্রহ, ব্রত প্রভাবে ভালো হয়। লোক প্রবাদ ও বিশ্বাস এই ব্রত পালনে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল হয় এবং পুত্র সন্তান লাভ হয়। ইতু ব্রত ও রাল ব্রতের মধ্যে একটু আধটু অমিল পাওয়া গেলেও দুই ব্রতেই সূর্যের কৃপা লাভ হয়ে থাকে। রাল ব্রত মূলতঃ সধবা রমণীরাই করে থাকে। মূলতঃ পুত্র সন্তান লাভ ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের আশায় রমণীরা এই পূজা করে থাকে। কুষ্ঠ রোগে পর্যাপ্ত পরিমাণ সূর্যরশ্মি প্রয়োজন। তাই এই ব্রত পালন করে সূর্য পূজার নিমিত্ত বিভিন্ন ব্রত ও নিয়ণ পালন করে কুষ্ঠ ব্যাধিকে উপশম করা হয়। ব্রত কথায় উল্লিখিত শিবের বরে রাজকন্যারা রালদুর্গা ব্রত পালন করে এবং সূর্য দেবের কৃপায় সুস্থ দেহ লাভ হয় এবং সুন্দর পুত্র সন্তান লাভ হয়।

সূর্য পূজার আরেক নিদর্শন পাওয়া যায় মাঘমণ্ডল ব্রতে। উত্তর গোলার্ধের মানুষ শীতের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই সময় দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়। দিন বড় মানেই সূর্যের আধিক্য বেশি। সূর্যের আধিক্য বেশি হওয়ার ফলে শীতের প্রকোপ থেকে মানুষ রক্ষা

পেয়ে থাকে। পৌষের পর আগামি শস্যের চাহিদায় ও রমণীরা সূর্যের উত্তাপের প্রয়োজন বোধ করেন। ফলে কৃষির লক্ষ্যে, রমণীরা সূর্য আরাধনার উদ্দেশ্যে 'মাঘমণ্ডল ব্রত' উদযাপিত করে থাকে। ব্রতকারিণীরা ঘরের আঙিনায় ব্রতমণ্ডল অঙ্কন করে। পুবে সূর্য, পশ্চিমে চন্দ্র এবং মধ্যস্থলে অয়নমণ্ডল। মাঘের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস যাবৎ এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। ছায়া'র সঙ্গে সূর্যের বিবাহের প্রসঙ্গ এই ব্রতেই উল্লিখিত। ছায়া ও সূর্যকে কেন্দ্র করেই নিজেদের কার্য ও বিধান পালন করে থাকে সমাজ। এই ব্রতে আহার-বিহারের তেমন কোনও পালনীয় কিছু না থাকলেও পূজার নিয়ম আছে। সূর্যের প্রতীক স্বরূপ কলাগাছকে ভাবা হয় বা আনা হয়। এঁকেই টোটেম রূপে পূজা করা হয়। কাছাকাছি পুকুরের ধারে এই কলাগাছ পুঁতে, সিন্দুর লাগিয়ে পূজা করা হয়। জলের স্পর্শ ও রোদের অর্থাৎ সূর্যের আধিক্যের ফলে বৃক্ষটি যথাসম্ভব শীঘ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অতি তাড়াতাড়ি ফল লাভেও সমর্থ হয়। ঠিক তদ্রুপ এই ব্রতে গৃহিণীরা শস্যাদি ও মানব জীবনের অগ্রগতি স্বরূপ বিবাহ, বৈবাহিক সুস্থতা সুখ ও সন্তানাদির সুফল ও সফলতার কামনা করে থাকে।

বঙ্গে আর একভাবেও সূর্য পূজা হয়। যাকে সূর্যাগ্যি বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে সূর্য কিরণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সূর্যের কিরণে আবর্জনা নাশ হয়। এই সূর্যাগ্যিও সেই রকমই একটি পূজা। সাধারণতঃ এই পূজা সংঘটিত হয়ে থাকে নবজাতক সহ প্রসূতি যখন পনের বা এক মাস পরে আঁতুর ঘর থেকে বের হয়, তখন। তখন তাকে লক্ষ্য করে সূর্যাগ্যি করা হয়। অর্থাৎ সূর্য পূজা করা হয়। আঁতুর থাকাকালীন যে সূর্যের স্পর্শ নেওয়া হয়নি এবং সন্তানের শারীরিক সুস্থতা ও জননীর সুস্থতার লক্ষ্যে দীর্ঘ বিশ্রামের পরে সূর্যের আলোকে শুদ্ধতা লাভ করবে। নবজাতক ও প্রসূতি স্নান পূর্বক নতুন বস্ত্র ধারণ করে। এবং পুরোহিতকে এনে সূর্যপূজা করানো হয়। জননী ও অন্য সকলেরা সেই পূজা ও ব্রত মন দিয়ে শোনে ও নিষ্ঠা করে পালন করে। এমনকি কন্যা সন্তানকে পাটের উপর শোয়ানো হয়। পাটের মতো দীর্ঘ চুলের আশায়। প্রসূতিকে সূর্যালোকে পঞ্চগব্য খাওয়ানো হয়। এইভাবে শুদ্ধ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগেও এই সকল দুধ, দই, ঘি, মধু এবং গোচনা সহযোগে পঞ্চগব্য খাওয়ানোর রীতি আছে। এবং সূর্য পূজার নামে সূর্যের আলো শরীরে গ্রহণ করবার বিধান আছে।

মানব জীবন ও সমাজ জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে সূর্যের উপকারিতা। তাই তাকে প্রসন্ন করার লক্ষেই সূর্য পূজার আয়োজন। রোগ প্রতিরোধে যেমন সূর্যের আধিক্য প্রয়োজন, শস্যাদি ও বৃক্ষের ফলন বৃদ্ধিতে এবং অক্সিজেনের চাহিদায় সূর্যের আধিক্য প্রয়োজন, রমণীদের ঋতু ধর্মে ও সন্তান ধারণে এবং জননীসহ সন্তানের সুস্থতার স্বার্থেও সূর্যের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবি। এই কারণে লৌকিক ধর্ম বা ব্রতে সূর্যপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য বিরাজিত। আজকাল এই সকল পূজা সচরাচর চোখে না পড়লেও গাঁ-গ্রামে এই পূজার প্রচলন আছেই।

এই পূজা পাঠ ও ব্রত পালনের মধ্যে জাগরিত থাকে পৃথিবীর ও প্রকৃতির সকল কিছুই প্রয়োজনীয় বিষয়। কেবল ঔষধ বাঁচাতে পারে না। প্রকৃতি জরা হলে ঔষধই তৈরি হবে না। এই লক্ষ্যে আজও পুরানো সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে এখনও মহাসমারোহে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ সূর্যপূজা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ববঙ্গের উত্তর ফরিদপুর, দক্ষিণ ঢাকা সহ অন্যান্য জেলায়। পূর্বে অল্প বয়স্ক ছেলেদের দ্বারাও এই পূজা পালিত হত। অংশ গ্রহণ করত নারী-পুরুষ সকলেই। পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলার বহিরাগাছির কাছেই হেমায়েতপুর এবং তার আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় এবং উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটী পৌরসভার অন্তগর্ত গাঁতী অঞ্চলে সূর্য পূজার প্রচলন আছে। শ্রীপঞ্চমীর পর মকর সপ্তমী তিথিতে এই সূর্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গঙ্গা'র ধারে বিশেষ বিশেষ তিথিতে সূর্য পূজার প্রচলন চলে আসছে। নানানভাবে সূর্যকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে আবেদন জানানো হয়ে থাকে। পূজার আগের দিনে আতপ চালের ভাত কিম্বা ফল মূল খেয়ে সংযম থাকতে হয়। পূজার দিনে সূর্য ওঠবার আগেই স্নানাদি সেরে নির্দিষ্ট বেদিতে নৈবদ্য সাজাতে থাকে সকলে। ধুনুচি ও প্রদীপের আলো জ্বালে। প্রদীপ হাতে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যকে ওঠবার আহ্বান জানানো হয়। যথা—

"উঠো উঠো সূর্যদেব শুদ্ধ করো কিরণে
আমরা আনত হই তোমার চরনে।"

ধীরে ধীরে ওঠে সূর্য ঝিকিমিকি হাসি
গাছ হাসে শিশু হাসে কিরণ ভালোবাসি
হে সূর্যদেব তুমি মিত্র সকলের
শান্ত স্নিগ্ধ তুমি তুমি অমল বিমলের
চন্দন চিনি কলা দিব এই ক্ষণে
বৈকালে অন্য আহার দিব্য আছে মনে
চিনির ঘোড়া, বাতাসা আর আছে কদমা
তোমার পূজার তরে আছে মা মাসি দিদিমা।

সন্ধ্যা হ'ল রবি গেলো আলোরই প্রত্যাশা
আবার কল্য আলো ফুটিবে এই আশা।
দিনের আশিষে ফোটে চাল ডাল সব্জি
সকলে ত্বরিতে আয় আহারেতে মজি।
সূর্যের আশিষে পূর্ণ ধন যশ আশা
সংসার আবর্তে থাকি পেয়ে ভালোবাসা।

শস্য শ্যামল বৃদ্ধি এবং গৃহে বছরভর শস্য তুলে রাখার হেতু সূর্যের প্রতি নিবেদন

পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি লাভেও ভক্তি ভরে নিয়মাচারে চলে পূজার আয়োজন। যথা—

প্রত্যুষে—

এসো এসো বসো সূর্য শস্য শ্যামল ক্ষেতে
তোমার আলোকে নিত্য উঠি যেনো মেতে।
তোমার আশিষে পূর্ণ হোক ফসলাদি
রবি শস্যে ভাণ্ড ভরুক ফলুক কলাকাঁদি।
জলাশয় শুদ্ধ হোক তোমার কিরণে
রোগ ব্যাধি দূরে যাক কিরণ আকর্ষণে।
হওবা দেবতা তুমি কিম্বা শক্তিধারী
সুস্থ্য দেহ, খাদ্য পূর্ণে তুমিই তো কান্ডারী।
দিনমণি, ভাস্কর নাম আরেক নাম রবি
দেওয়ালে অঙ্কিত করি তোমার রূপ ও ছবি।

মধ্যাহ্নে—

মধ্যাহ্নে তুমি তো বীর আশিষে তৎপর
তোমারি পূজা হয় প্রতি ঘর ঘর
তোমারি আলোকে দেখি তোমারি স্বরূপ
তুমি বিনে নষ্ট হয় সকলকালের ধূপ।
এসো এসো বসো সূর্য, শস্য শ্যামল, ক্ষেতে:
রৌদ্র স্নাত সোনার ফসল ডাকে আসন পেতে।

সায়াহ্নে—

বেলা হলো সূরয সখা তুমি কোথাতে লুকাও
জগত শীতল করি কোথায় ঘুমাও।
সারাদিন তাপ দিয়ে জগত রক্ষিলে
সন্ধ্যায় চলে গিয়ে ঘুমেতে মজিলে।
যাও যাও যেথা খুশি আরবার এসো
সমাজ প্রকৃতিকে তুমি পুনঃ ভালোবেসো।
জয় জয় রবি আদিত্য দিনমণি ভাস্কর
বিশ্ব যাতে শান্তি হয় দিও সেই বর।
(সূর্য পূজা ব্রত ও গান- অ. কৃ. ব্রহ্মচারী, ২০১১)

সমাজ সংগঠনের, ব্যক্তি পরিবারের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনাই এই পূজার উদ্দেশ্য। এই

পূজা ও বিধি নিয়ম বর্তমানে অবলুপ্ত হতে চলেছে, অতি আধুনিকতার ছায়ায়। কর্ম চঞ্চল ও ব্যস্ততার মোড়কে মানুষ আকাশ, মেঘ, সূর্য, চন্দ্র দেখতে ভুলে যাচ্ছে। পূজা ও ব্রত তাই লুপ্ত হতে বসেছে। তবুও কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়। উত্তর ২৪ পরগণার বিরাটী পৌরসভার অন্তগর্ত গাঁতী অঞ্চলে এবং নদীয়ার বহিরগাছির কিছু অঞ্চলে আজও ভক্তিভরে এই পূজার প্রচলন লক্ষিত হয়।

তথ্য সূত্র :

১। লোকসংস্কৃতির আঙিনায় গ্রন্থের 'বিহার ও বাংলার সূর্য পূজা': ড. শিপ্রা ঘোষ; পরিবেশক: পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯; প্রথম প্রকাশ: জন্মাষ্টমী ভাদ্র, ১৪০৪; আগষ্ট ১৯৯৭

২. সূর্য পূজা ব্রত ও গান: অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; প্রকাশক: সম্পর্কের শিকড়, বারাকপুর-শ্রীপল্লী, গোপালনগর, উত্তর ২৪ পরগণা। সূচক- ৭৪৩২৬২; প্রথম প্রকাশ: ২৬ আগষ্ট ২০১১

৩. বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ: বরুণকুমার চক্রবর্তী; পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩; তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১৬ (পৃষ্ঠা: ৬০২- ৬০৩)

৪. 'সূর্য পূজা: যতীন্দ্রনাথ রায়" প্রসঙ্গ 'বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ, সম্পাদক: বরুণকুমার চক্রবর্তী' পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩; তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১৬ (পৃষ্ঠা: ৬০২)

৫. 'সূর্যাগ্যি: ড. বিকাশ পাল' প্রসঙ্গ 'বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ, সম্পাদক: বরুণকুমার চক্রবর্তী' পরিবেশক: দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩; তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ: জানুয়ারী ২০১৬ (পৃষ্ঠা: ৬০২-৬০৩)

শ ম্পা হা ল দা র

লোক সংস্কৃতির আলোকে অষ্টক

অষ্টক হল বসন্তকালীন সুর। বসন্তকাল মানব জীবনে স্বপ্নে জাগা এক কাল বা সময়। অষ্টক গান হ'ল, জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। শিব ও দুর্গার বিয়েকে উপলক্ষ্য করে এই উৎসব পালিত হলেও রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের ধারা তুলেই এই অষ্টক আস্বাদন করা হয়। রাধাকৃষ্ণের অষ্টসখী নিয়ে যে লীলাবিলাস সেইগুলিকে সামনে রেখে সুর, তাল, মান দিয়ে উজ্জীবিত করা হয় এই অষ্টক উৎসব। বসন্তে কোকিলের কুহু কুহু রব, কর্মশীল মানুষকে কর্মহীনতায় ডেকে নিয়ে যায়। মনকে উদাস করে তোলে। উদাসীমন বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের মত নিজে চলতে চেষ্টা করে। শাসন বারণ তাড়ন ভর্ৎসন কিছুরই ধার ধারে না, সময়। বুড়ো মনে দোলা দেয় কচি কচি শিষ। কচি মন হয়ে যায় উদ্ভ্রান্ত। আসলে ঐ যে হ্লাদিনি শক্তি। সে তো নিজের মধ্যেই নিজে। মানুষ সহজে বোঝে না তাই অন্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে চেষ্টা করে। অন্যের মধ্যে নিজের চাহিদা দেখতে পায়, কিন্তু পাওয়া যে শক্ত। তাই তো রাধাকৃষ্ণের অষ্টসখী। যথা—ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই হল অষ্টসখী। এঁনাদের সকলের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। নব যৌবনা এক এক সখীর রূপ রস গন্ধ তার ঢঙ ও লালিত্য মনকে লালিত করে, প্রাণিত করে। কখনও রাধাকে প্রবোধ দেয় তো কখনও কৃষ্ণকে প্রবোধ দেয়। তাঁদের সেই প্রবোধ যেন ঠিক কোকিলের সুরের ন্যায় হৃদয় বিগলিত করা স্বর। রাধাকৃষ্ণের মান ফেরানোর তাগিদেই অষ্টসখীর বিলাপ। এই অষ্টসখী অর্থাৎ অষ্টভাব তো প্রতি মানুষের মধ্যেই বিরাজিত। মানুষ ভাবের ঘরে বিরাজ করলে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বিকশিত হয়। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব, যথা—স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, স্বরভেদ, পুলক ও মূর্ছা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত—

"স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্ছিত।।" ৭২।।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

প্রেমোন্মাদের রূপ বর্ণনা করছেন অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের মধ্য দিয়ে। কামনায় মন বিগলিত হলেও সেই রূপ বিকারগ্রস্ত হয়, শরীর ও মন। অর্থাৎ কিছু জেনেছি। অনেক বুঝেছি। ধরতে পারছি না। এই ধরবার ব্যাকুলতা। প্রাণ ভরে দেখবার আকুলতা। এই আকুল-ব্যাকুল ভাবই এই সময়ের অষ্টকে উদ্ভাসিত হয়েছে। শিব ও দুর্গার বিবাহের সময় তাই অষ্টসখীর মধুর রসালাপে সিক্ত করা হয়ে থাকে বিবাহ বাসর। বসন্তকালের এই উৎসব চলে এসেছে

অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে। উৎসবের ধারাকে অব্যাহত রাখতে শিল্পীরা সুর করে গানের মাধ্যমে, নৃত্য শিল্পীরা নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দদান করে থাকেন। চড়ক শুরু হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে কোথাও পনের' দিন আগে থেকে এই পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে এই অষ্টক গান ও নাচ করা হত। বর্তমানে ঘুরে ঘুরে তেমন না হলেও এক স্থানে জমায়েত হয়ে এই উৎসব, উৎসবের মেজাজেই বিরাজ করছে।

বসন্তে কোকিলের কুহু কুহু রবে রাধারাণীর বিরহ জেগে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে না কতকাল। কোকিলের ডাকে রাধারাণী মূর্ছা যায়। এই ভাবটিও অষ্টকের পালার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, এইভাবে—

"ও তোর আর এক সখী দুষ্টুমতি
নিষ্ঠুর পাপিয়া
যখন করে কুহুকুহু
প্রাণ করে মোর উহু উহু
অতি কষ্টে ধৈর্য রাখি চাপিয়া।"

এই অষ্টকের আদি উৎপত্তি রাহু সেন-এর থেকে। রাহু সেন রাজা ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। পরবর্তীতে প্রগতির ধারা বেয়ে রূপান্তর হতে হতে বর্তমানের ধারায় উপস্থিত। বর্তমানে দুই-ভাবে এই অষ্টক পালিত-লালিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে। আদি রূপ ধরে রেখেছে উত্তর ২৪ পরগণা অঞ্চলের অষ্টক দলগুলি। কিছুটা ধারা বদলেছে নদিয়া অঞ্চলের শিল্পীগণ। প্রচলন ও প্রচারের ধারা বেশি আছে নদিয়ায়। চৈত্র মাসের পর থেকে বর্ষা যতদিন না নামে ততদিন। উত্তর ২৪ পরগণার অষ্টক দলগুলি স্বরলিপি ধরে, ব্রতচারী নির্ভরতায়, কিন্তু নদিয়ার অষ্টক দলগুলির নাচে কোনও স্বরলিপি ঠিক রাখে না। ইচ্ছাখুশি মতো করে। গায় এক-কলি অষ্টক আর বাজায় নানান সুর। তাল মানে ঠিক থাকলেও ঠিক নেই নাচ ও সুর। নাচ ও সুরের এই পরিবর্তন এনেছে নদিয়ার অষ্টক দলগুলি। নদিয়ার মধ্যে অষ্টক গানের প্রচলন বেশি হাঁসখালি, বগুলা। মুর্শিদাবাদেও এই অষ্টক গানের প্রচলন চোখে পড়ার মতো।

উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যে বনগাঁ ও গাঁইঘাটা মিলে প্রায় দশ-বারোটি দল আছে। তার মধ্যে প্রতিপত্তি ছড়িয়ে রেখেছে—'মণ্ডলপাড়া প্রগতিশীল অষ্টক সমিতি'। নদিয়াতে প্রায় তের' থেকে পনেরটি দল আছে। এর আদি উৎপত্তি বাংলাদেশে। অধিক প্রচলন বাংলাদেশের যশোর জেলায়। এছাড়া এই অষ্টকের প্রচলন ছিল ফরিদপুরে, খুলনায়, বরিশালে। বাংলাদেশে এই অষ্টক গ্রামে গ্রামে হত। বর্তমানে অতটা না হলেও তবুও কিছু জায়গায় বেশ সুনামের সাথেই এই অষ্টক প্রথা চালু আছে।

বনগাঁ মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে অষ্টক গান প্রচলিত। বর্তমানেও একইভাবে

চর্চা চলছে। এর মধ্যে বনগাঁ, গোপালনগর, বাগদা ও গাইঘাটা অঞ্চলে অষ্টকের প্রভাব আজও বিদ্যমান। বনগাঁ ও গোপালনগর থানার অন্তর্গত যে সকল স্থানে আজও অষ্টক নিয়ে চর্চা চলছে, তা হল—গোপালনগর, আকাইপুর, ঘাটবাঁওড়, ট্যাংরা কলোনী, নহাটা, পাল্লা, চৌবেড়িয়া, দিঘাড়ি, ভবানীপুর, কালুপুর, বৈরামপুর, কৈখালির পাবনা পাড়া ও পার্শবর্তী পাড়া কনকপুরে, গাড়াপোতা ও সুন্দরপুরে অষ্টকগানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও শুল্ক দুর্গাপুর, রঘুনাথপুর, বেলতা, ভাণ্ডারকোলা, রসুলপুর, গোলকপুর, হরিশপুর প্রভৃতি গ্রামে অষ্টক গানের দল আছে। নদিয়া জেলার মধ্যে অষ্টক গানের প্রভাব দেখা যায়—চাকদহ, রানাঘাট, হাঁসখালি, কৃষ্ণগঞ্জ, ধানতলা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া মালদহ, হবিবপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, কোচবিহার, আসামে, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানেও কম বেশি অষ্টক গানের প্রচলন আছে।

নাচ, গান ও অভিনয়- এই তিনের সংমিশ্রণেই অষ্টক। অষ্টকের গান ও নাচ করতে এক এক দলে কমপক্ষে কুড়ি থেকে বাইশজন লোক লাগে। যাত্রামুখী করে পরিবেশন করতে গেলে আরও অধিক লোকের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ দোতরা, সারিন্দে, দুটো বাঁশি, বেহালা, হারমোনিয়াম, দুটো চাকি, ঢোলক ও পদকর্তার প্রয়োজন হয়। আগে এত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো না, মূলতঃ বেহালার উপরই অনুষ্ঠানের নির্ভরতা ছিল। গানের পদ নির্ণায়ক ও সৃষ্টি কর্তাকেই মূলতঃ পদকর্তা বলা হয়ে থাকে। পদকর্তাই বিষয় ভিত্তিক রচনার মূল মূল কথা তুলে দেন। বাকী সকলে তার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। যিনি পদগুলো বলে বলে দেন তাঁকে 'সরকার' বলা হয়। অষ্টকের সর্বস্তরে এই 'সরকার'-এর অবস্থান। সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণকৃত অষ্টসখীর লীলা কেন্দ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পৌরাণিক পালা বলতে শিবের বিবাহ, কুচনী পাড়ায় শিব, শঙ্খ বিলাস, নৌকাবিলাস, বেহুলা, রামের বনবাস, রাধার মানভঞ্জন, চন্ডীদাস-রজকিনী, দাতাকর্ণ, নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, হরিশচন্দ্রের শ্মশান মিলন, জেলের মেয়ে মৎস্য গন্ধা এমনকি ক্ষুদিরামের ফাঁসিও পালা করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এই অষ্টকের সুর সঙ্গীত নির্দিষ্ট একটি তালের উপর সীমাবদ্ধ নয়, অনেক প্রকার তালের সংযোগ সাধনে অনুষ্ঠান পরিবেশন হয়। একতলা তালই বেশি প্রচলিত, তবে এর পাশাপাশি দোঢুকিও ব্যবহৃত হয়। পৌরাণিক সুরের বিবরণ দিতে বলা যায়:

"তুমি শুন মা কালী-
আমি তোমাকে বলি,-
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে
জোড়াপাঁঠা দিব বলি।"

অনুরূপ—

"ওরে কাল বসন্ত কুসুম কান্ত
কোন বা দেশে ছিলি
ফাগুন চাঁদের আগে আগে
আবার রে তুই উঠলি জেগে
বিরহিণীর প্রাণে ব্যথা দিলি।"

ড. তপন রায় মহাশয়ের অষ্টক সম্বন্ধে যে ভাব পাওয়া যায় তা উক্ত মনোভাব থেকে অনেকটাই ভিন্ন। তাঁর কথায়—"অষ্টক লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিকের গানের মধ্যে 'অষ্টক' একটি আঙ্গিক।" 'অষ্টক' কথার সাথে গানের বিষয়বস্তুরও বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করেছেন ড. রায়। আটটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদকে সচরাচর 'অষ্টক' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এখানে সে সবের কোনও মিল পাওয়া যায় না।

চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে নীল গাজন উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী যে সকল গান চতুর্দিকে পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে একটি অষ্টক গান। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই গানের প্রচলন বেশি দেখতে পাওয়া যায়। মূলতঃ শিব-পার্বতী কেন্দ্রিক উৎসবানুষ্ঠান হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশি মাত্রায়। বৈষ্ণব ধর্মের ভাব, গান ও লীলাই এখানে বেশি করে প্রাধান্য পেয়েছে। লৌকিক প্রেম, তার ভাব ও সেই আঙ্গিকের সঙ্গীতও এই অষ্টক গানে শুনতে পাওয়া যায়। অষ্টক গান গাইবার, তাতে সুর সংযোজন করবার ও পদবিন্যাস গাজনের থেকে একটু স্বতন্ত্র। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত অষ্টক গানের দুইটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল। যা থেকে অষ্টকের কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যথা-

এক.

'শিব বলে, সুন্দরী।
তুই তো বড়ো রূপসী।
আমি একটু হইছি বুড়ো
তাতে তোর ক্ষতি কি?
আমি দিব সোনার মুকুট মাথায়,
সোনার মল গড়ে দিব পায়,
দুই হাতে দুই কঙ্কণ দিব,
যাতে তোর শোভা হয়।"

দুই.

"শচীরাণী কেন্দে বলে
নৈদেবাসী দেখবি আয়,
আমার নিমাই আমায় ছেড়ে যায়।
আর বুঝি মা বলে নিমাই আমার,

ডাকবে না আমায়।
এই নদীয়া আঁধার হলো
নিমাই চান্দ ছেড়ে গেল,
আমার ভাগ্যে এই ছিল
বাঁচার চেয়ে ওরে নিমাই,
মরণ আমার ভালো।"

মূলতঃ শিব-পার্বতীকে কেন্দ্র করে অষ্টক-এর পালা উৎসবের সূচনা। কোনও কোনও স্থানে আটজন সখী ছাড়াও অনেক বেশি সংখ্যক সখীকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করতে দেখা গেছে। কিন্তু আটজন সখীই মুখ্য। আটের বেশি সখী কখনও হয়ে যেত পালায়। এর কারণ, যারা এই পালাগুলিতে অভিনয় করত তাদের মধ্যে আটজনকে তো প্রশিক্ষণ দেওয়া হত না। কখন কার কি অসুবিধা থেকে যায়, সেই দিক নির্ভর করে অনেককেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সখীরা পালায় এসে উপস্থিত। পালা কর্তা তাদেরও আসরে নামিয়ে দিত। এই হিসাবে কোনও কোনও স্থানে আটের অধিক সখি দেখা যায়। মূল বিষয় হল: এই অষ্টকে একজন হত শিব। শিব হল এখানে ভাঁড়, আধ-পাগল এবং বোকা। চেহারাটাও বেখাপ্পা। একটু রসিকতা প্রিয়। হাতে শিঙ্গা থাকত। থাকত তালপাতার পাখা। পালা চলাকালীন কখনও শিঙ্গা বাজান, কখনও পাখার বাতাস খান, কখনও আবার তালে তালে নাচতে থাকেন। শিবের বিয়ে সংক্রান্ত গানের কিছুটা লক্ষ্য করা যাক—

"শিবের বিয়ে লাগে গো
পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে বরণ করে।
তোলা পালকী দে গো রায়।
হিমালয়ে যায়
এই বাসনা মনে।
এই খানে রাখা হ'ল
মুখে মুখে হরি হরি বোল।"

গানের শেষ পংক্তিটি ভারী অদ্ভূত। "মুখে মুখে হরি হরি বোল।" শিবের সম্পর্কিত লীলা গানে বোল ঢুকে পরছে রাধা-কৃষ্ণের ভক্ত গৌর-নিতাইয়ের ভক্তিভাব। প্রচারের বানী 'হরি হরি বোল'। বৈপরীত্য ভাবের মধ্যে মিশ্র সমাহার দ্বারা লক্ষিত হয়, পূর্বে শৈব ছিল। সে সময়ে কেবল শৈব কেন্দ্রিক প্রথাই প্রচলিত ছিল কিন্তু কালের প্রবাহে যুগের স্রোতে রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাইয়ের ভক্ত অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। ফলে শিব কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়। পুরানো শিব ভক্তরা তাই যুগের তালে তাল মিলিয়ে শিব কেন্দ্রিক ব্রত'র মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাইকে স্থান দিয়েছে। ফলে গৌরের ভক্তরাও এই

অনুষ্ঠানাদিতে আনন্দের সাথে অংশ গ্রহণ করতে পারছে। আরো পরে এই সকল রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই ভক্তরা যখন এই শিব কেন্দ্রিক লীলায় সরকার, পদকর্তা রূপে অংশ নিল তখন আরও বেশি করে শিব কেন্দ্রিক প্রথায় রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই'এর লীলা প্রচারিত হতে থাকল। শিব সম্পর্কিত গানের পাশাপশি "রাধা-কৃষ্ণ" লীলার গানও পরিবেশিত হচ্ছে। যথা—

"আমরা অষ্টসখী মিলে,
যাব যমুনার জলে
জল ছিটিয়ে করি খেলা।"

অষ্টকের মধ্যে রামায়ণের প্রভাব পড়েছে। তার জনপ্রিয়তাও দৃষ্টি আকর্ষণের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথা—

"লঙ্কার রাবণ রাজা,
বিনা অপরাধে,
রামের ভাই লক্ষ্মণে মারিবে,
দেখিবে সকলে।"

শিব উৎসবে শিব লীলা গান, রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই গান, রামায়ণ লীলা পাশাপাশি লৌকিক উপাদানও অষ্টকের মধ্যে নিয়োজিত হয়েছে। যথা—

"জামাই এলো বাড়ি,
লাগলো তাড়াতাড়ি।
ডাল ঘুটাঘুটি পটল ও ভাজি।
জামাই এলো গো বাড়ি।
বসো গো জল তুলি।"

—এর সাথে সখীদের কোমরে একহাত, অন্য হাতে রুমাল। কোমর দুলিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে এবং ডান হাত উঁচু করে রুমাল ওড়াতে থাকে।

অষ্টক গানের মধ্যে পয়ার অন্তে মিল পাওয়া যায় না এবং তেমন কোনও জটিল শব্দও পাওয়া যায় না। লোক-কবিগণ সহজ ভাষায়, সহজ কথায় ব্যঞ্জনাময় দর্শন-তত্ত্ব তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে অষ্টক গানের বা পালার তেমন প্রভাব নেই, এর মূল কারণ পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবে অষ্টক পদাবলীর রসোপলব্ধি হারাচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দুর্বল হেতু এই সকল পালা থেকে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন বেশি ছিল। এই চৈত্র নির্ভর অনুষ্ঠানের মাসে নদী-নালার দেশে হাঁটাচলায় তেমন বেগ পেতে হত না। মানুষ অনায়াসেই এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলাফেরা করতে পারত। ফলে গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে এই অনুষ্ঠান চালাতে কোনও প্রকার বেগ পেতে হত না। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন

ঘটেছে, পাশাপাশি দেশ ভাগ, শিক্ষার ব্যাপকতা, কৃষি নির্ভরতা ছেড়ে শহর কেন্দ্রিক মনোভাবে ব্যবসা ও চাকুরির দিকে ঝোঁকবার হেতু অষ্টক কেন্দ্রিক উৎসব প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। আবার যারা সারা বছর এই পালাকে উজ্জীবিত রাখছেন, বছরে একবার নূন্যতম অনুষ্ঠানের খরচ না উঠলে হতাশ হতেই হয়। তবুও যারা চালিয়ে রেখেছেন তারা নিজস্ব তাগিদে, পৌরাণিক প্রথাকে মর্যাদা দিতেই চালিয়ে রেখেছেন।

আত্ম চেতনা বৃদ্ধি ও তার বিকাশের একমাত্র রূপই হল দর্পণ। আত্ম দর্পণ। যার মধ্যে যত বেশি আত্মিকচেতনা সমৃদ্ধ ও তার বিকাশে যত্নশীল তাঁরই দর্পণ তত শুদ্ধ। সেই শুদ্ধ চেতনার বিকাশেই সামাজিক সত্ত্বা পূর্ণতা পায়। শিল্প, সাহিত্য সমাজ থেকে আলাদা নয়। তাই তার নান্দনিক চেতনায় বুদ্ধিজীবীরা আপ্লুত। ত্রিকালের নথি স্বাক্ষরিত হয়, উক্ত চেতনায়। অষ্টকের ভাবনা চিন্তার মধ্যে সেই সময়ের এবং বর্তমান সময়ের চিত্রই গাঁথা হয়েছে এবং হচ্ছে।

অষ্টক গান ও পালা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমান মর্য্যাদা লাভ করত। ফলে একটা সমন্বয় সাধনও হত এই অষ্টক গানে। সমাজে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হত। একটি অষ্টক গানে তার পরিচয়ও মেলে। যথা-

"বন্দি ভগবতী, লক্ষ্মী সরস্বতী
গনেশ জননী তারা
আমি বন্দি কড়জোড়ে সবার ভিতরে
হিন্দু মুসলমান যত জনে।"

অষ্টক গানগুলিকে গীতিনাট্যের মধ্যে ফেলা যায়। তাৎক্ষণিক বিষয়ের উপরও গান রচনা হয়ে থাকে অষ্টকে। একটা নিজস্ব সুর আছে। কাব্যরসের মাত্রাও অনেক বেশী। যথা—

"বেলা দুই ফরের কালে, বাঁশি বাজল রাই বলে,
আমি প্রাণ ভরে শুনতে পারলাম না,
তখন আমি পাকশালে।
কেন হেন অসময়, বাঁশি বাজাও রসময়,
ঘরে থাকা হল দায়।"

শিল্পী মানেই সাধক। সাধনাই শিল্পীকে নিয়ে যায় শিল্পের উচ্চাসনে। এই উচ্চাসনে যাওয়ার আগে তাঁকে পার হতে হয় নিদারুণ অভাব, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা। নিজেকে হতে হয় বিবাগী, উদাসী। এরকমই কয়েকজন অষ্টক শিল্পীর আলোচনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করি। যথা—

দেবেন্দ্রনাথ গোলদার ঃ

দেবেন্দ্রনাথ গোলদার ছিলেন অষ্টক-গায়ক ও সরকার। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে জন্ম। পূর্ব বাংলার যশোহর জেলার মালিয়া গ্রামে। দরিদ্র পরিবারে দারিদ্র্যকে মাথায় নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বছর বয়স থেকেই পরের বাড়ি থেকে মানুষ হতে হয়েছিল।

পড়াশুনার চর্চা ছোটবেলায় হয়নি এবং অন্যস্থানেও হয়নি। কোনও এক সময়ে এক ব্রাহ্মণের সহযোগিতায় শিক্ষাজীবনে এগোতে পেরেছিলেন। বিদ্যালয়ে নয়। নদীর বুকে খেয়ার পারে। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার পড়াশুনার খরচ চালাত বিনিময়ে দেবেন্দ্রনাথবাবুকে যাত্রা ও থিয়েটারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হত। বেশ কিছুদূর পড়াশুনা করতে করতে এক সময়ে তা ছেড়ে দিলেন। কাঁধে এল সংসারের দায়িত্ব। এই সময়ে বাগডাঙা অপেরায় যোগ দিলেন। ব্রজেনবাবুর 'রক্ততিলক' বইতে অভিনয় করে সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এরপর 'আকালের দেশ', 'রক্তপূজা'য় অভিনয় করেন। এই ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠার আলোকে উদ্ভাসিত হন।

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস ঃ

গৌরাঙ্গ বিশ্বাস অষ্টক গানের রচয়িতা ছিলেন। মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সেই বার্ধক্য নেমে এসেছিল। দুরারোগ্য হাঁপানী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। খুলনা জেলার তেরখদো থানার পিলকানগরে তাঁর বাড়ি ছিল। বর্তমানে তিনি নদিয়ার বাসিন্দা। বিভিন্ন প্রকারের গান তিনি রচনা করতেন। প্রায় দুশোর মতো গান তিনি রচনা করেছেন। নদিয়া জেলায় অষ্টক গান প্রতিযোগিতায় পুরষ্কার পেয়েছেন।

নিত্যানন্দ বিশ্বাস ঃ

নিত্যানন্দ বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের ছোট ভাই। অষ্টক গানের অন্যতম পুরোধা। পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম গ্রহণ করলেও বর্তমানে নদিয়ার চাকদহে অবস্থান করেন। সমাজদার পাড়ায় 'অনুরাগী' অষ্টক দলটি এঁনাদের অনুপ্রেরণাতেই তৈরি হয়েছে। অন্ততঃ দেড়শটি অষ্টক গানের রচয়িতা ইনি। 'তাঁর শিব-বিবাহ' বিষয়ক ক্রটি গানের কিছুঅংশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"তোমরা শুন সর্বজনে,
ও শিবের বিয়ের বিবরণ।
ওরে বরণ কুলা লইয়া এল,
যত ছিল আইয়াগণ।।
তোমরা সকলে জুটে,
চল জামাই ধরিতে।
ওরে চোখ ঠ্যাংরা পেটটি মোটা,
মন লাগে না ধরতে।।
শুনে কাঞ্চনের ধ্বনি,
ও শিবের মাথায় সাপ ফণি।
ছো মারিতে যায় সাপে
দেখে ওই সব বরণী।।"

এই রকম ভাবে শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসে অষ্টক গান, নাচ প্রদর্শিত হয় সমাজে। অষ্টক গানের মধ্যে সমাজের নানান দিক যেমন ব্যক্ত হয় তেমনই ফার্টিলিটির বিরাট বড় কাজ হয়। যৌন সম্পর্কিত সংযোগ এখানে সৃষ্টির ধারক রূপেই বর্ণিত। শিবের বিবাহ-মিলন > প্রকৃতির সাথে ধরিত্রীর মিলন-সংযোগ > নারী-পুরুষের মনের চাহিদার থেকে মেল বন্ধন ও সংসর্গতা থেকে সামাজিক ধারা মেনে বিবাহের বিধান। সামাজিক বিধান দ্বারা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের মেল বন্ধন রক্ষা করা। একের সুখে অন্যে সুখি। একের দুঃখে অন্যে দুঃখী। সুতরাং একবদ্ধতার মধ্যে যে সুরের ঝঙ্কার ওঠে তার পূর্ণ প্রমাণও রেখে গেছে অষ্টকে। অষ্টকে পদকর্তা, বাদ্যকার, অভিনেতা, শ্রোতা সব মিলিয়ে একটা আনন্দের জোয়ার। একটা নব উন্মেষের উন্মাদনা। কিন্তু এইভাব ধারা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে, বিভিন্ন কারণে। লুপ্ততার মধ্যেও সংরক্ষণের যে বাতাবরণ তাকেও শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

তথ্যঋণ :

১। লোকশিল্পীর মুখোমুখিঃ দীপঙ্কর ঘোষ; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগঃ পশ্চিমবঙ্গ; প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৫

২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত, শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ; দ্বিতীয় মুদ্রণ: শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি, ইং ১৪/০৩/২০০৬

৩। শ্রীরাধার ভাবকান্তিঃ অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ গৌড়ীয় মঠ, বারাকপুর (স্কুলপাড়া), গোপালনগর; প্রথম সংস্করণ ঃ রাধাষ্টমী, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

৪। অষ্টকঃ সুজিত বিশ্বাস; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ; প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ২০০৪

৫। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী; পরিবেশকঃ দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩;
তৃতীয় পরিবর্জিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০১৬

৬। 'অষ্টক: ড. তপন রায়', (পৃষ্ঠা: ১৬-১৭); বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী; পরিবেশকঃ দে বুক স্টোর, ১৩
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩; তৃতীয় পরিবর্জিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০১৬

৭। 'অষ্টকঃ ড. তপনকুমার বিশ্বাস', (পৃষ্ঠা: ১৭-১৮); বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী; পরিবেশকঃ দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩; তৃতীয় পরিবর্জিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০১৬

৮। 'অষ্টসখীর গান : লোকেশচন্দ্র বিশ্বাস"; ড. তপনকুমার বিশ্বাস', (পৃষ্ঠা: ১৯-২০); বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী; পরিবেশকঃ দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩; তৃতীয় পরিবর্জিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬

তি থি ঘো ষ

নদীয়া জেলার লোকাচার : জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ

বাংলার একটি সুপ্রাচীন জনপদ ও ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা নদীয়া, মধ্যযুগে এই স্থান শাস্ত্র চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নদীয়ার গৌরবময় অবস্থান অবিস্মরণীয়। নদীয়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্মচর্চা বাংলার জাতীয় জীবনধারায় এক মূল্যবান সম্পদ। এক কথায় নদীয়া ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির অভিকেন্দ্র। নদীয়ার লোকাচার জানার পূর্বে লোকাচার কি তা জানা প্রয়োজন। লোকের হিতার্থে যে আচার তাই লোকাচার অর্থাৎ কল্যাণের জন্য যে ধরনের আচরণবিধি সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাই লোকাচার। স্থান, কাল ও সময়ের বিবর্তনে লোকাচারের পরিবর্তন এসেছে। তবে পরম্পরায় বাহিত নিয়ম-নীতিকে মানুষ বিনা দ্বিধায় সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে। মানুষের জীবন নানা আশঙ্কা, প্রত্যাশা, অপ্রাপ্তি, কল্যাণ কামনা ইত্যাদি অভিব্যক্তির মাধ্যমে আবর্তিত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি, দুর্যোগ শঙ্কা থেকে মঙ্গল কামনার্থেই মানুষ বিভিন্ন আচার, নিয়ম পালন করে চলেছে। লোকাচার মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার দ্বারা লালিত এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের গহ্বরেই লোকাচার পুষ্ট হয়। প্রযুক্তির যুগে মানুষের জীবনে, চিন্তা চেতনায় এই সমস্ত সংস্কার আচার প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের সহযাত্রী হয়েছে, সেই সঙ্গে মনোগত বিশ্বাসের নৈমিত্তিক প্রকাশে তৎপর হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে লোকাচারের পরিবর্তন ঘটে। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটি বাঙালিকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এই লোক ঐতিহ্য প্রাচীন থেকে উৎসারিত হয়ে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কোনো না কোনো ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, 'Active Tradition Bearer' সংহত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা এই ধারা দেখতে পাই। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মননের প্রতিফলন ঘটে লোকাচারের মধ্য দিয়ে। আচারগুলি তিথি, মাস ও ঋতুভিত্তিক। দৈব বিশ্বাস ও ঐহিক মঙ্গলকামনা থেকেই লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রচলিত লোকায়ত লোকাচারগুলির মধ্যে আলোচ্য বিষয়গুলি জন্ম কেন্দ্রিক লোকাচার, বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার, মৃত্যু কেন্দ্রিক লোকাচার। জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু-জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে অসংখ্য ছোট বড় সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে লৌকিক আচার। বিবাহের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার নিয়মের শাস্ত্রীয় বিধান শৃঙ্খলাবদ্ধ।

জন্ম পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে চলেছে। স্থানের বৈচিত্র্য অনুসারে জন্মের পর সদ্যজাতের মঙ্গল কামনার্থে বিভিন্ন নিয়ম, আচার পালিত হয়। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে

ভিন্ন ভিন্ন আচার পালিত হয়। হিন্দু মতে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আতুর পালিত হয় ৭/৯/১১/১৩ দিনের। নবজাতকের ৬ দিনে 'সেটেরা' করা হয়। ছটি উপাদান সেখানে রাখা হয়- খাতা, বাঁশের কলম, দোয়াত, তালপাতা, সাপের খোলস, ডোর। উপাদানগুলিকে একটি কাঠের পিঁড়ির উপর রাখা হয়। মানুষের সংস্কার মতে সন্ধ্যার পূর্ব লগ্নে এই দিনেই বিধি লিখন দেয়। সপ্তম দিনে নবজাতকের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠী পূজা করা হয়। বিভিন্ন উপাদান সহযোগে পূজা করা হয়- ঘট, প্রদীপ, ধূপ, সরা (সরার মধ্যে থাকে খই, পান, বাতাসা, লাল চেলি কাপড়, কাজল লতা), সেই সঙ্গে দেওয়া হয়- পাঁচ প্রকার ফল, পাঁচ প্রকার মিষ্টি, নৈবেদ্য, দই, কাঁচা দুধ, তিল। কাঁচা দুধ, তিল ও গঙ্গাজল মন্ত্রপুত করে আঁতুড়ঘরে ছিটিয়ে দিয়ে স্থানটিকে শুদ্ধিকরণ করা হয়। নবজাতক ও তার মা নতুন বস্ত্র পরিধান করে পূজায় বসে। নবজাতক পুত্র হলে তার কামান হয় ৯/১১/২১ দিনে। নবজাতকের নাভি শরীর থেকে খসে গেলে সেটি মাদুলি করে পড়ানো হয় অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য। শিশুর প্রথম ভাত খাওয়া অনুষ্ঠানের নাম অন্নপ্রাশন। ছেলের ক্ষেত্রে ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন হয়। আর মেয়ের ক্ষেত্রে ৫ বা ৭ মাসে পালন হয়। এই দিন শিশু সন্তানদের নতুন বস্ত্র পরিয়ে ফুল, চন্দন দিয়ে সাজানো হয় ৫/৭ রকম ব্যঞ্জন, পায়েস দিয়ে খাবার সাজানো হয় এবং বড়রা তার মুখে খাবার তুলে দিয়ে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মের পর আজান দেওয়া হয়। শিশুর ৬-৭ দিনে নমাজ পড়া হয়। সাধারণত জন্মের ৭ দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যে আফিকা দেওয়া হয়। মুসলমানদের মধ্যে জন্মের পরপর অথবা তার জীবদ্দশায় যেকোনো সময় ধর্মীয়ভাবে নাম রাখার জন্য 'আফিকা' করা হয়। আফিকার অনুষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানো হয়, প্রাণী কোরবানি দেওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজনরা নিমন্ত্রিত থাকে। নবজাতকের জন্য দোয়া দুরুদ পড়া হয়। প্রথম ভাত খাওয়ানোর সময় ধর্মীয়ভাবে আফিকা করে, এছাড়া আজান দেওয়ার রীতি আছে। ৪১ দিনে নবজাতকের মাথা কামানো হয়। ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে ৩-৫ বছরের মধ্যে হাজাম ডেকে মুসলমানি বা খাতনা দেওয়া হয়।

বিবাহ জীবনের একটি বিশেষ স্তর। বস্তুগত অর্থে বিবাহ জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণের কৃত্যানুষ্ঠান। বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষ পূর্বের জীবন ত্যাগ করে নতুন জীবন আরম্ভ করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিন, লগ্ন ও ক্ষণ স্থির করা হয়। উভয়কে আশীর্বাদের জন্য আশীর্বাদের অনুষ্ঠান পালিত হয়। বিবাহের ৭ দিন কিংবা ৩০ দিন পূর্বে শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠান হয়। মিষ্টি, দই, পান, সুপারি, বাতাসা, মাছ, স্বর্ণের জিনিস, পোশাক, টাকা প্রভৃতি উপকরণ থাকে। বর-কনেকে নিজ নিজ বাড়িতে আলাদাভাবে বসিয়ে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা হয় এবং বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিবাহের দুইদিন পূর্বে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে মা রান্না করে দেয় এবং মাতৃস্থানীয়রা

তিনজন বা পাঁচজন মুখে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে অন্ন তুলে দেয়। এর পরের দিন- আইবুড়ো ভাত, সেই দিন বাড়িতে কোনো অন্ন গ্রহনের রীতি নেই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকে। সধবা নারীরা বিজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ ৩/৫/৭ জন এয়ো কামায়। সবশেষে ছেলে/মেয়েকে কামানো হয়। এয়োদের আলতা, সিঁদুর, মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। নাপিত কে কলাপাতায় সিধে দেওয়া হয়- আলতা, সিঁদুর, মিষ্টি, চিঁড়ে, মুড়কি। এই দিন বিকেলে 'শ্রী' প্রস্তুত করা হয়। মাতৃস্থানীয়রা বা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে 'শ্রী' প্রস্তুতের উপকরণ দিয়ে আসা হয়। একটি পাত্র, কলাইয়ের ডাল, সরষের তেল, সিঁদুর, হলুদ বিবাহের দিন প্রত্যুষে ঘটিতে জলের ফোটা ফেলতে ফেলতে স্থানটি শুচি শুদ্ধ করতে করতে শ্রী টিকে আনা হয়। বিবাহের দিন সকালে সূর্য্যোদয়ের আগে এয়োরা মিলে গঙ্গায়, বিলে কিংবা পুকুরে গিয়ে কাঁচি দিয়ে পুকুর কেটে গাড়ুতে জল ভরে পুকুরকে নিমন্ত্রণ করে আসে। বাড়ি ফিরে এয়োরা প্রদীপ ধরিয়ে পাঁচ পোয়া আতপ চাল হাঁড়িতে নিয়ে নোড়া দিয়ে চাল ভাঙ্গে।

এরপর দধিমঙ্গল আচার পালিত হয়। চিঁড়ে, দই, মিষ্টি ও জল দিয়ে উভয় বাড়িতে তাদের মাতৃস্থানীয়রা ছেলে/মেয়ের মুখে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করে এবং উপস্থিত প্রত্যেকে অল্প অল্প করে মুখে নেয়। সূর্য সম্পূর্ণ উদয় হওয়ার পর ব্রাহ্মণ এসে নান্দীমুখের অনুষ্ঠান করে। সেখানে পিতৃস্থানীয়রা নান্দীমুখ করে থাকে এবং উভয়ের বাড়িতে এটি পালিত হয়। বর-কনের নিজ নিজ বাসভবনে নতুন বস্ত্র পরিধান করে মাথায় বিয়ের টোপর পরে পিঁড়িতে বসে পূজার জন্য। কলাপাতায় পাঁচ মুষ্টি সিদ্ধ চাল, পাঁচটি কাঁচকলা, পাঁচটি আলু দেওয়া হয়, অন্য একটি কলাপাতায় পাঁচ মুষ্টি আতপ চাল, পাঁচটি পাকা কলা, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি দেওয়া হয়। এছাড়া ধুতি, গামছা, ঘট, ফুল, বেলপাতা, তুলসীপত্র, দূর্বাঘাস, চন্দন, হলুদ, পাঁচটি ফল, পাঁচ রকমের মিষ্টি দেওয়া হয়। নান্দীমুখের পর কলাপাতা আর লাল সুতো দর্পণে বেঁধে ছেলেকে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কাজল লতা দেওয়া হয় যেটি ছেলের বাড়ি থেকে পাঠানো হয়, যা সর্বদা তাদের হাতে রাখতে হয়। তারপর ছেলের বাড়ি থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা মেয়ের বাড়ি আসেন সঙ্গে গায়ে হলুদ ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রী আনে। এই হলুদটি ছেলের গায়ের লাগানো হলুদ এয়োরা ছেলেকে বরণ করে এই হলুদের আচারটি পালন করে। মেয়ের বাড়িতে যে সমস্ত তথ্য সামগ্রী আসে সেগুলি হল - দই, মিষ্টি, পান, সুপারি, কাঁচা মাছ, পোশাক, ধান, দূর্বা, চন্দন, কাঁসার বাটিতে হলুদ, তামার পাত্রে সরষের তেল, কাজল লতা, (যেটি মেয়ের হাতে থাকে) এছাড়াও মাটির হাঁড়িতে থাকে খই, বালি, ঘি, মধু, পাকা কলা, পান, সুপারি, বেলকাঠ, পাটকাঠি, ক্ষেত্রবিশেষে এটি আশীর্বাদের সঙ্গে দেওয়া হয়, কেউবা এটি কোলবরের কোলেও দেয়। মেয়ের বাড়ি থেকে যে আশীর্বাদ ও তত্ত্ব সামগ্রী আসে তা হলো দই, মিষ্টান্ন সামগ্রী, পোশাক সামগ্রী, ধান, দূর্বা, ঘি, মধু, চন্দন, কাঁচা মাছ যার মধ্যে পান, সুপারি, মিষ্টি, টাকা দেওয়া হয়। আশীর্বাদের অনুষ্ঠানটি বিবাহের পূর্বে হয়ে থাকলে বিবাহের দিন কেবল ছেলের বাড়ির থেকে আনা

হলুদটি দিয়েই গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। মেয়ে ছেলের বাড়ি থেকে পাঠানো শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত্র পরিধান করে এবং এয়োরা বিভিন্ন আচার পালন করে। মেয়ের মা বরণ করে গায়ে হলুদ দেয় এবং বাকিরা প্রত্যেকে মেয়ের গায়ে হলুদ ছোঁয়ায় এবং পুকুরের আনা জলে স্নান করায়। তারপর জল সইতে যাওয়া হয় ৫/৭/৯ টি বাড়িতে। ছেলের বাড়িতে হলুদ অনুষ্ঠানটি আগে হয়ে যাওয়ায় জল সইতে যাবার প্রস্তুতি শুরু করে। যে সমস্ত উপকরণ গুলি এক্ষেত্রে প্রয়োজন সেগুলি হল — বরণডালা- যার মধ্যে থাকে কলার ছড়া (বিজোড় সংখ্যায়, চেলি দিয়ে ঢাকা), ধান, দুটি সুপারি, দুটি পাত্র, কাপড় (কড়ি লাগানো), বরণের কুলো - যার মধ্যে থাকে ২১ টি সিঁদুরের ফোঁটা, ২১ টি হলুদের ফোঁটা, চারটি গুটি ছোপা (যার মধ্যে থাকে পাঁচটি কড়ি, পাঁচটি হরিতকি, পাঁচটি বয়রা, পাঁচটি কাঁচা হলুদ) সরষের তেল, হলুদ মাখানো চাল, কলার ছড়া (চেলি ঢাকা), গাড়ু (যার মধ্যে পুকুরের জল, পান, সুপারি, মিষ্টান্ন থাকে)। আয় হাঁড়িতে গোবর/মাটি দিয়ে প্রদীপ ধরিয়ে রাখা হয়।

এরপর নিজের বাড়ি ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে জল সইতে যাওয়া হয়। একটি পাত্রে মিষ্টান্ন, সরষের তেল, পান, সুপারি, আলপনার খড়িমাটি ইত্যাদি উপাদান নেওয়া হয়। মা বা কাকিমা বা বৌদি স্থানীয়রা কুলো মাথায় সর্বাগ্রে যায়। পাঁচটি বা সাতটি অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যায় আত্মীয়দের বাড়ি যাওয়া হয়। প্রতিটি বাড়ির জল গাড়িতে নেওয়া হয়, সেই সঙ্গে আলপনার ছড়া দিয়ে মিষ্টি, তেল, পান, সুপারি দিয়ে আচার সম্পন্ন করা হয়। সবশেষে পুকুর/বিল/নদীকে বরণ করা হয়। যে কুলো মাথায় করে সেই পান, সুপারি, মিষ্টি দিয়ে বরণ করে। এয়োরা গাড়ুর জল দিয়ে পাঁচ থেকে সাত বার জলে প্রদক্ষিণ করে এবং যার বিয়ে তার নাম উচ্চারণ করে। বাড়ি ফিরে গাড়ুর জল দিয়ে শুদ্ধ হয়ে বরণ পর্ব শুরু হয়। জাঁতার উপর মাচা বা লোহার বস্তুর উপর মাঝখানে দাঁড়াতে হয় মেয়ে/ছেলেকে। খড় বা বিচুলি দিয়ে পাঁচটি স্থানে দুটি করে অর্থাৎ ১০ টি খড়ের গিট বাঁধতে হয়। তারপর মাতৃস্থানীয়রা কেউ একজন চারকোনা করে মাঝখানে দুহাতে দুটো খড় বা বিচুলি আগুন ধরিয়ে উভয়ের বুড়ো আঙ্গুল স্পর্শ করে মাঝখানে রাখা হয়। সবশেষে খরগুলো সম্পূর্ণ আগুনে ধরিয়ে ছেলে বা মেয়েকে মাতৃস্থানীয়রা জিজ্ঞাসা করে কার আগুন পোহাচ্ছে, যার সঙ্গে বিবাহ হবে তখন তার নাম তারা উচ্চারণ করে। তারপর পাঁচজন বা সাতজন সুতোর মধ্যে আবিষ্ট হয়ে পা দিয়ে সেটি নামিয়ে ছেলে/মেয়ের কপালে তিনবার ছুঁইয়ে হলুদ, সরষের তেল মাখিয়ে ছেলে হলে ডান হাতে আর মেয়ে হলে বাঁ হাতে পরিয়ে দেয়। এরপর এয়োরা মাচাটিকে তিনবার উঁচু করে জলের ধারা দিয়ে ছেলে/মেয়েকে ঘরে নিয়ে যায়। ছেলের ক্ষেত্রে তার মা তাকে ঘরে যা আছে খেতে বলে আর চিঁড়ে মুড়কি হাতে দেয়। তারপর বিয়ের পোশাক পরে দুধ মিষ্টি দেওয়া হয় এবং বাবা মাকে প্রণাম করে শ্বশুর বাড়ি রওনা দেয়। ছেলে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর শাশুড়ি সোনা রুপোর জল দিয়ে চোখ ধুয়ে দেয় ও মিষ্টিমুখ করায়। তারপর কলাতলায় জামাই বরণ হয় ও সাত পাকে সুতো দিয়ে জামাইকে আবিষ্ট করার পর সেই সুতো জামাইয়ের হাতে

পড়ানো হয়। কনে পান পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে বরকে কেন্দ্র করে সাত বার প্রদক্ষিণ করে। ছাউনিনারা ফুল দিয়ে উভয়ে গন্ধ শোকে তারপর শুভদৃষ্টি, মালাবদল হয়। তারপর মন্ত্র পাঠ, সিঁদুর দান সম্পন্ন হয়। বালি, বেলকাঠ, পাটকাঠি আগুন জ্বালিয়ে পান, সুপারি, ঘি, মধু, কলা, কুলোতে খই নিয়ে আগুনে সাতবার আহুতি দেয় বর কনে। এরপর প্রণাম আশীর্বাদ, মিষ্টি মুখ করে বিয়ের সম্পন্ন হয়।

বিয়ের পরের দিন মেয়ে জামাইকে চিঁড়ে, মিষ্টি দই খাওয়ানো হয়, বাড়ির বড়রা আশীর্বাদ করে। রীতি অনুসারে মেয়ে মায়ের কোলে চাল দিয়ে বলে — 'যা খেয়েছি ঋণ শোধ করলাম'। তারপর মেয়ে জামাই চলে যাওয়ার পর খই, জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে বিভিন্ন ঠাকুরের স্থানে প্রণাম করে। তারপর বাড়িতে প্রবেশ করে পিঁড়ির উপর ছেলের বাঁ দিকে বৌ দাঁড়ায়, সঙ্গে কোমরে গাড়ু ও বাঁ হাতে মাছ কলা পাতায় মোড়ানো থাকে। ছেলে বউয়ের মাথায় কাঁঠা ধরে, বরণ করা হয় পুত্র নববধূকে, তারপর নববধূ আলতায় পা দিয়ে সাদা কাপড়ের উপর দিয়ে হাঁটে এবং ছেলে তার দর্পণ দিয়ে ধান কাটতে কাটতে গৃহে প্রবেশ করে। এরপর কড়ি খেলা ও অন্যান্য আচার দিয়ে নিয়ম সম্পন্ন হয়। বৌভাতের দিন সকালে ছেলের বাড়িতে বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। ছেলেকে জাঁতায় এবং বউকে পিঁড়িতে বসিয়ে সামনে চারকোনা গর্ত কাটা হয় (যাকে পুকুর বলে কল্পনা করা হয়)। সাবান জল দিয়ে স্থান শুদ্ধি করে বরণ করা হয়। পুকুরের জলে (কাল্পনিক) আংটি ও সুতো নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়, বৌ বরের পিঠে হলুদ দিয়ে দুটি করে পুতুল আঁকে এবং বর বৌয়ের পিঠে সিঁদুর দিয়ে দুটি করে পুতুল আঁকে। এটি মূলত সন্তান, বংশ রক্ষার সূচক হিসেবেই করা হয়। এরপর রাত্রে বৌভাতের অনুষ্ঠানে নতুন বৌ সকলকে পায়েস পরিবেশন করে। ফুলশয্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে আসা তত্ত্বে ফুলশয্যার বস্ত্র পরিধান করে উভয়ে এবং ফুলের সাজ পড়ে। নতুন পাত্রে চিঁড়ে, দই, মিষ্টি খাওয়ানো হয় এবং বিবাহের নিয়ম সম্পন্ন হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের আচার তেমন দীর্ঘ নয়। হিন্দুদের মতোই তাদের মধ্যেও আশীর্বাদের অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যা রাতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়, মেয়ের হাতে লাল সুতো পরিয়ে দেওয়া হয় সেই দিন। হলুদ জিনিস দিয়ে মেয়েকে সাজানো হয়। ছেলের বাড়ি থেকে আসা তত্ত্বে মেয়ে সজ্জিত হয়। পায়েস, মিষ্টি, ফল প্রভৃতি সামগ্রী সেখানে সাজানো থাকে। ছেলের গায়ের হলুদ মাখিয়ে মেয়েকে স্নান করানো হয়। বিয়ের দিন মেয়ে, মা, বাবা উপবাস থাকে। ছেলের বাড়ি থেকে বিভিন্ন তত্ত্ব সামগ্রী আসে। সাধারণত বিবাহ অনুষ্ঠান দুপুরের সম্পন্ন হয়। মৌলানা সাহেব বিয়ে পড়ান। মেয়ে ও ছেলেকে আলাদা আলাদা স্থানে বসানো হয়। সর্বপ্রথম ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে বিয়ের জন্য রাজি কিনা। তারপর ছেলের হ্যাঁ সূচক সংকেত এলে মেয়েকেও জিজ্ঞাসা করা হয়। উভয়ের সম্মতিতে বিয়ে পড়ানো শুরু হয়। ছেলের বাড়ি থেকে আনা নথ মেয়েকে

পড়ানো হয় এবং মেয়ের হাতের লাল সুতো খুলে দেওয়া হয়। এরপর শিরজা দেওয়া হয় অর্থাৎ বর-কনে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে তিনবার মাটিতে মাথা ঠেকায়। এইভাবে বিয়ের সমস্ত নিয়ম সমাপ্ত হয়।

মৃত্যু জীবনের পরিণাম, সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মৃত্যুর রহস্য ভেদে প্রয়াসী। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মে নানা বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার্থেই এই সমস্ত আচার পালন করা হয়। সে যাতে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় তার আপনজনেরা তাই সদা সচেষ্ট হয়। কোন মানুষের প্রাণ মুখ দিয়ে বেরোলে তার মুখে চাল দেওয়া হয় আর চোখ দিয়ে গেলে তার চোখে তুলসী পত্র দেওয়া হয়। মৃতদেহটিকে বাড়ির উঠোনে তুলসী মন্দিরের সামনে দক্ষিণ দিকে মাথা করে রাখা হয়। সধবা নারীর স্বামী মারা গেলে তার সিঁদুর তুলে দেওয়া হয় এবং শাখা পলা মৃত স্বামীর কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই সমস্ত কিছুই সধবার চিহ্ন বলে মনে করা হয়। মৃতদেহটিকে কাঁচা বাঁশের খাটিয়া করে 'হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে ঘি, মধু মাখিয়ে চিতায় তোলা হয়। মৃতদেহ নিয়ে চলে যাওয়ার পর গোবর জল ছিটিয়ে স্থানটিকে শুদ্ধ করা হয় এবং মৃতদেহ দাহ হবার পর তিনটি/পাঁচটি চাল জল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে হাঁড়ি কালি করতে হয়, এরপর আকাশের তারা দেখে নমস্কার করে ফালাহার করা 'হয়। যে বা যারা কাছা নেয় তারা দশ দিনে দশা পিন্ডি করে পুকুর বা গঙ্গায় গিয়ে। ক্ষৌরকার্য্যের দিন পর্যন্ত তারা, এবং আত্মীয় পরিজনেরা হবিশ্যি করে থাকে এবং বেনা গাছে চাল, তিল, জল দিয়ে আত্মার উদ্দেশ্যে শান্তি কামনা করে। ১১/১৩/ ১৫ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, পিন্ডদান করা হয়, সাত পুরুষ পর্যন্ত জল দান করা হয়। পরের দিন আঁশমুক্তি ঘটিয়ে অশৌচ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন মানুষের মৃত্যু হলে তার জান্নাত পাওয়ার জন্য তার পরিজনেরা সমস্ত আচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। মৃত ব্যক্তিকে কাঠের পাটার উপর রেখে গোসল (স্নান) করানো হয়। এই সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে কোন মহিলা মারা গেলে পুরুষেরা তার মুখ দেখেনা আবার পুরুষ মারা গেলে মহিলারা তার মুখ দেখেনা। তবে এই রীতি সবক্ষেত্রে পালন হয়না। মৃত ব্যক্তির সামনে নমাজ পড়া হয়। এরপর পুনরায় জল গরম করে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে সুগন্ধি (গোলাপ জল, কর্পূর আতর) ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং কাফন দেওয়া হয়। পুরুষ মারা গেলে তিন টুকরো সাদা কাপড় এবং মহিলারা মারা গেলে পাঁচ টুকরো সাদা কাপড় দেওয়া হয় ও শেষে মৃত ব্যক্তির মুখ বেঁধে দেওয়া হয়। খাটিয়া করে নিয়ে যাওয়ার সময় কোনো ফাঁকা স্থানে তার আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া পড়ার রীতিকে 'জনাজা' বলা হয়। মৌলানা সাহেব কোরান পড়েন এবং বাকীরা কলেমা শরীফ পড়তে পড়তে কবরস্থানে নিয়ে যায়। তিনজন কবরের মধ্যে নেমে মৃতকে শুইয়ে দেয় এবং শরীরের বাঁধন খুলে দেয়। প্রত্যেকে এক মুঠো করে মাটি দেয় কবরে। শেষে মাটি

দিয়ে কবরটিকে ভরাট করে তার উপরে বাঁশ কেটে ঢাকা দেওয়া হয়। তিন দিন শোক পালন করা হয়। তবে কোন স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তাকে ৪ মাস ১০ দিন নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোনো স্থানে রাত্রি বাস করা যায় না এমনকি নতুন বস্ত্র, অলংকারে সজ্জিত হওয়া যায় না। চতুর্থ দিনে মৌলানা সাহেব মিলাদ মহফিল পড়েন এবং তার আত্মীয় পরিজনেরা আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করেন।

বহুভাষা বহু ধর্মের দেশে অবাধ বৈচিত্রের সম্ভার। সেখানে জাতি ধর্মের পার্থক্যে আচার, সংস্কারে বৈচিত্র্য সাধন ঘটেছে। পুরাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক নদীয়া জেলা। সেখানে জাতিভেদে, ধর্মভেদে লোকাচারের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছিলেন—"সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুলধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষের নিজের মনুষত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, জীবের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একক বহন করছে। প্রকৃতির লক্ষ কোটি বছরের সংস্কারের ভার তাকে আশ্রয় করেছে"। আসলে সমস্ত লোকাচার, বিশ্বাস, সংস্কার পালনের মধ্যে আছে মানসিক তুষ্টি। মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক মঙ্গল হিতার্থে এই সমস্ত কৃত্যানুষ্ঠান পালন করেন। এইভাবেই মানুষ তার চিরায়ত লোকাচার নিয়েই সভ্যতার রথের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরের পথে।

তথ্যের সন্ধানে :

১। মন্ডল মৃত্যুঞ্জয়: নদীয়া চর্চা, অমর ভারতী, ৮ সি ট্যামার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
২। গুঁই মৃত্যুঞ্জয়: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি নিবন্ধ)
৩। ঘোষ বিনয়: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খন্ড), দীপ প্রকাশন, ১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬
৪। সেনগুপ্ত পল্লব: লোক সংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

তথ্যদাতা :

১। ক্ষেত্র সমীক্ষা, তারিখ ১১/৬/২০২৪, তথ্যদাতা: অর্চনা হালদার, ইটলা দক্ষিণপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পেশা-গৃহবধূ, বয়স-৪৪ বছর
২। ক্ষেত্র সমীক্ষা, তারিখ ২/৭/২০২৪, তথ্যদাতা, মোসলেম শেখ, দিগনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পেশা-মৌলানা, বয়স-৫৮ বছর
৩। ক্ষেত্র সমীক্ষা, তারিখ ৪/৭/২০২৪, তথ্যদাতাঃ নাজিমা খাতুন, খলসী, দেউলি, হরিণঘাটা, নদীয়া, পেশা-স্বাস্থ্যকর্মী, বয়স-৪২ বছর।
৪। ক্ষেত্র সমীক্ষা, তারিখ ২২/৭/২০২৪, তথ্যদাতা: রেখা ঘোষ, আইশতলা, গড়ের বাগান, রানাঘাট, নদীয়া, পেশা-গৃহবধূ, বয়স-৭৭ বছর।

কৌ শি ক দে

মনুসংহিতার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও বাংলা সাহিত্য : একটি পর্যালোচনা

আধুনিককালে যে শাস্ত্রকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলি, হয়তো ঠিক সেই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কথাটি প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত হয়নি। সম্পূর্ণ করে না বোঝানো গেলেও, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে যেসব শব্দ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত সেগুলির একটা অনুক্রমিক পর্যায়শব্দ ব্যবহার করলে আমরা এই শব্দগুলি পেতে পারি 'রাজশাস্ত্র', 'রাজধর্ম', 'দণ্ডনীতি', 'অর্থশাস্ত্র', এমনকি 'রাজনীতি' শব্দটিও। 'রাজশাস্ত্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছেন মহাভারতের রচয়িতা। 'রাজধর্ম' শব্দটা বিখ্যাত করে দিয়েছেন স্বয়ং 'মনু'। মহাভারতের রাজধর্মানুশাসন পর্বের ৫৬-তম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলেছেন যে, সমস্ত জীবলোক রাজধর্মেই আশ্রিত। ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি চতুর্বর্গ রাজধর্মেই সমাহিত।

ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু হলেন ধর্মশাস্ত্র তথা মনুসংহিতার প্রণেতা। গ্রন্থটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে সপ্তম, অষ্টম ও নবম এই তিনটি অধ্যায়েই মূলত রাজনৈতিক আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে রাজার সৃষ্টি, দণ্ডদান, রাজাদের দৃষ্টফল ও অদৃষ্ট ফল সবরকমেরই কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য ঋণদানাদি বিষয়ক কাজের তথ্য বিচার করে যা সত্য তা নিরূপণ করা এবং নবম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হল স্ত্রী-পুরুষদের আচরণীয় ধর্ম ধনাধির বিভাগ বিষয়ক নিয়ম প্রভৃতি। প্রধানত এই অধ্যায়েই আচার্য মনুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজার সৃষ্টি ও তাঁর মহিমা :

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা রাজাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। তাই মনু সপ্তম অধ্যায়ে রাজা ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চারটি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়রাই রাজা হওয়ার যোগ্য। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী উপনয়ন সংস্কার হয়ে গেলে রাজা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সমস্ত প্রজাকে পরিপালন করতেন। এটাই ছিল তাঁর কর্তব্য:

"ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণে যথাবিধি।
সর্বস্যাস্য যথা ন্যায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্।।"[১]

রাজার প্রয়োজন সম্পর্কে মনু বলেছেন—সমাজ যদি রাজাশূন্য হয়, তাহলে সকল মানুষ বলবানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়। ভয়ে লোকে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে। তাই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ভগবান রাজাকে সৃষ্টি করেছেন

"অরাজকে হি লোকেস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।।"[২]

দেশে রাজদণ্ড না থাকলে বলবানেরা দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তাদের ধনসম্পদ

ও স্ত্রীকে অপহরণ করবে। এইসব দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের দণ্ডদানের জন্য রাজার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে—

"যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিত।
শূলে মৎসানিবাপক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ।।"[৩]

এইসব অন্যায়কারীদের দমন করার জন্য ভগবান প্রজাপতি রাজা ও দণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। দণ্ডের প্রভাবে রাজা সকলকে বশীভূত করেন এবং ব্রহ্মচর্যাদি চার আশ্রমের ধর্মকে নিজ নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত হতে দেন না—

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃত।।"[৪]

রাজার গুণাবলী :

রাজ্যরক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজাকে ঠিকমতো রাজধর্ম পালনের জন্য নিজেকে বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়। তিনি হবেন শান্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং প্রজাহিতে রত। রাজা ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদের বিষয়ে আয়ত্ত করবেন। তিনি পরম্পরাগত দণ্ডনীতি (অর্থশাস্ত্র) শিখবেন অর্থশাস্ত্রবিদদের কাছ থেকে। তার্কিক ও বৈদান্তিক পণ্ডিতদের কাছ থেকে শিখবেন তর্কবিদ্যা। কৃষক ও বণিকদের কাছ থেকে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ধনার্জন বিষয়ক জ্ঞান লাভ করবেন। অর্থাৎ সবরকম মানুষের কাছ থেকেই রাজার শিক্ষণীয় আছে। মনু রাজাকে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য জোর দিয়েছেন। কারণ, জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাদের নিজের বশে রাখতে সমর্থ্য হন"জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ।"৫ মনু রাজাকে দশটি কামজ দোষ ও আটটি ক্রোধজ দোষ ত্যাগ করতে বলেছেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এইসব দোষ বর্জন করতে পারেন। এই দোষগুলি হল দুরন্ত অর্থাৎ যার সমাপ্তি দুঃখকর। এগুলি প্রথমে সুখকর হয়, কিন্তু পরিণামে বিরসতা আনে। এই দশটি কামজ দোষের মধ্যে মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি এবং মৃগয়া—এই চারটি বহুদোষযুক্ত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়। ক্রোধ থেকে জাত আটটি দোষের মধ্যে দণ্ডপারুষ্য, বাক্‌পারুষ্য ও অর্থদূষণ এই তিনটিকে সর্বদায় কষ্টতম বলা হয়েছে—

"কষ্টমেতৎ ত্রিকং সদা।"[৬]

রাজার দৈনন্দিন কাজ ও চিন্তনীয় বিষয় :

প্রজা পালনই হল রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ধর্ম পালন করতে গিয়ে তাঁকে নানা পরিস্থিতিতে নানা দায়িত্ব পালন করতে হত। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি হওয়াটা অসম্ভব নয়। কিন্তু সামান্য ভুলের জন্যও গুরুতর ক্ষতি হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না, তাই রাজাকে সাবধানে সংযতভাবে জীবনযাপন ও দায়িত্ব পালন করতে হত। মনু রাজার কর্তব্য পালন এবং নিজের ও প্রজাদের শুভচিন্তা বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, যা শুধু প্রাচীন যুগের রাজাদের ক্ষেত্রেই নয়, বর্তমানের রাজনীতিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাজা

রাত্রির শেষ প্রহরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে হোমের কাজ সম্পাদন করবেন। ব্রাহ্মণদের যথাযোগ্য পূজা করবেন এবং তারপর শুভক্ষণে সভাগৃহে প্রবেশ করবেন। সেখানে রাজার দর্শনার্থী সমাগত সমস্ত প্রজাকে দৃষ্টিপাত, সম্ভাষণ প্রভৃতির দ্বারা খুশি করে তাদের বিদায় দেবেন। এবং তারা চলে গেলে মন্ত্রীদের সাথে সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রাজ্যসংক্রান্ত কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরূপণ করার জন্য মন্ত্রণা করবেন—

"উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম।
তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ।।"[৭]

মন্ত্রণার বিষয় যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় তবে রাজা পাহাড়ের উপরে, প্রাসাদের উপরিস্থিত ঘরে অথবা নির্জন অরণ্য প্রদেশে মন্ত্রীর সাথে অন্যদের অলক্ষিত ভাবে মন্ত্রণা করবেন। মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য সাধারণ লোক যদি রাজার মন্ত্রণা জানতে না পারে, তবে সেই রাজা সমস্ত পৃথিবী ভোগ করতে সমর্থ হন :

"গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিত।।
যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্‌জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোষহীনোপি পার্থিবঃ।।"[৮]

দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে চারজন রাজাকে 'মূল প্রকৃতি' বলা হয়। এই চারজন রাজা হলেন—'মধ্যম', 'বিজিগীষু', 'উদাসীন' এবং 'শত্রু' (অরি)। এই চারজন রাজার ক্রিয়াকলাপ, ভাবগতিক ও আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক রাজার কর্তব্য।

যুদ্ধনীতি :

রাজার প্রধান কাজ ছিল প্রজাদের পালন করা "ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্"৯। এবং সেজন্যে তাঁকে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হত। কোনও রাজার পক্ষেই দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আততায়ী হয়ে যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তখন রাজা কোনও রকম বিবেচনা না করেই তাকে বধ করবেন—

"আততায়িনময়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।।"[১০]

আততায়ী হল সেই ব্যক্তি, যে কারোর শরীর, ধন, স্ত্রী বা পুত্রকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। মনু রাজাকে উপদেশ দিয়েছেন, যুদ্ধ জয় করাই তাঁর স্বধর্ম এবং যুদ্ধে বিমুখ হওয়া কখনই তাঁর কর্তব্য নয়:

"স্বধর্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎ পরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্যমাহারয়েদ্বলিম।।"[১১]

রাজা শস্ত্রধারণ করে বৈশ্যগণকে রক্ষা করবেন, পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে কররূপে

ধন গ্রহণ করবেন। বীর রাজার পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুও আকাঙ্ক্ষিত। ক্ষত্রিয় রাজা যে যুদ্ধ করবেন, মনুর মতে তা হবে ধর্মযুদ্ধ। অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করে নিরীহ ব্যক্তির প্রাণহানি নয়। প্রজাপালক রাজার সমবল, অধিকবল বা হীনবল বিপক্ষ নরপতির দ্বারা যুদ্ধের জন্য আহূত হলে 'যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম' এই কথা স্মরণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। এই অবস্থায় কখনোই তিনি যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত হবেন না—

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন।।"[১২]

প্রজাদের পালন করার মতোই যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া (সংগ্রামেষ্বনিবত্বম্) রাজার পক্ষে স্বর্গপ্রাপ্তির অনুকূল। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে ইচ্ছুক রাজারা অপরাঙ্মুখভাবে যুদ্ধ করতে করতে দেহত্যাগ করলে নির্বিঘ্নে স্বর্গলাভ করে থাকেন

"আহবেষু মিথোন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।।"[১৩]

যুদ্ধে যথেচ্ছাচারিতার স্থান ছিল না। যোদ্ধাকে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়, এই নিয়ম অনুসরণ করে যুদ্ধ করাই হল যোদ্ধার ধর্ম। এই নিয়মগুলিকেই মনু যোদ্ধাদের চিরন্তন ও সনাতন ধর্ম বলেছেন। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহত্যায় রত ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের এই ধর্ম চিরকাল মনে রাখতে বলেছেন। মনুর যুদ্ধবিষয়ক এইসব চিন্তাভাবনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মহাভারতের ভীষ্মপর্বে।[১৪]

মন্ত্রী নিয়োগ ও তাদের সঙ্গে রাজার মন্ত্রণা :

রাজ্যশাসনের যে গুরুদায়িত্ব তাহা কখনই একা বহন করা সম্ভব নহে। যতই ধীর, স্থির, এবং জিতেন্দ্রিয় নরপতি হন না কেন রাজ্যপরিচালনার জন্য অমাত্য, সেনাপতি, অধিকরণিক প্রমুখ নেতৃত্বদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। এমনকি ঋষিগণ ঋত্বিক হয়েও রাজকার্যে সহায়তা করতেন তার নিদর্শন আমরা রামায়ণেও পেয়ে থাকি। কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেন শকটাদির একটি চক্র যেমন চক্রান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে চলে না; সেইরূপ অমাত্যাদির সহায় ব্যতিরেকে রাজার একাধী রাজকার্য পরিচালনা সম্ভব নয়। সচিব নিযুক্তি ও তাহাদের মন্ত্রশ্রবণ রাজার আবশ্যিক কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। বীর শাস্ত্রবিদের সহায়তায় উন্নভি-সুপুরুষ, বীর, শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ এবং কৃতপ্রজ্ঞ মিত্রের সহায়তাই নরপতি সমস্ত কিছু জয় করিতে সমর্থ হন—

"সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ততে।
কুর্বীত সচিবাংস্তস্মাত্তেষাং চ শৃণুয়ান্মতম।।"[১৫]

অমাত্যহীন রাজার তিনদিনও রাজঐশ্বর্য ভোগ করা সম্ভব নহে; সেইজন্যই রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হত এবং রাজা এই মন্ত্রিসভার পরামর্শে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। রাজা বংশপরম্পরাগত, বেদাদিধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী, যুদ্ধবিদ্যায়

নিপুণ, সৎকুলজাত এবং সুপরীক্ষিতএই রকম সাতজন বা আটজন সচিব (মন্ত্রী) নিয়োগ করবেন। কোনও রাজার একার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা অসম্ভব। আর রাজ্য যদি বড় হয় তাহলে তো আরও অসম্ভব। সেই কারণে মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যের খুবই দরকার। রাজা ওই মন্ত্রীদের সঙ্গে সাধারণ সন্ধি ও বিগ্রহ চিন্তা করবেন। মন্ত্রীদের সাথে রাজা দণ্ড, পুর এবং দেশবাসীদের রক্ষার বিষয় চিন্তা করবেন; ধান-হিরণ্য প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান নিরুপণ করবেন; নিজেকে এবং রাষ্ট্রের প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন; এবং লব্ধ ধন যাতে সৎপাত্রে ন্যস্ত হয় সে বিষয়ে চিন্তা করবেন—

"তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ।।"[১৬]

আবার কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারে রাজা তাঁর মন্ত্রীদের অভিমত আলাদা আলাদা ভাবে জেনে নেবেন; পরে সকলের মিলিত অভিপ্রায় পর্যালোচনা করে নিজের মঙ্গলজনক বলে যা মনে করবেন তারই অনুষ্ঠান করবেন

"তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথকপৃথক সমস্তানাঞ্চ কার্যেষু বিদধ্যাদ্ হিতমাত্মন।।"[১৭]

দূতনিয়োগ :

রাজার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দূতের আবশ্যকতা ছিল। রাজা দূতের মাধ্যমেই দেখতেন, কারা তাঁর মিত্র, আর কারাই বা শত্রু, আর রাজ্যের প্রকৃত অবস্থাই বা কেমন। যিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, যিনি অন্যের ইঙ্গিত, আকার এবং চেষ্টার দ্বারা তার মনের ভাব বুঝতে পারেন, যিনি শুচি, যিনি কর্মকুশল ও সদ্‌বংশজাত এমন লোককে রাজা দূতরূপে নির্বাচন করবেন। যিনি দূত নির্বাচিত হবেন তিনি যেন অনুরক্ত, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি বিশিষ্ট, দেশকালজ্ঞ, সুশ্রী, নির্ভীক ও বাগ্মী হন

"দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্‌গতম।
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমানদেশকালবিৎ।
বপুষ্মানবীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে।।"[১৮]

এইসব গুণভূষিত দ্যুতই রাজার মঙ্গল সাধনের সমর্থ্য। রাজা সন্ধি, যুদ্ধ প্রভৃতি যে ষড়গুণ চিন্তা করেন তাদের মধ্যে সন্ধি ও যুদ্ধ, এই দুটি প্রধানত দূতের অধীন। এ সম্পর্কে মেধাতিথির ব্যাখ্যা এইরূপদূত যদি অন্য রাজার নিকট মিষ্ট কথা বলতে পারে, প্রভুর কাজ যদি ঠিকমতো বিবেচনা করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে দুই রাজার মধ্যে সন্ধি হতে পারে। আর তা না হলে যুদ্ধ বাধে। অতএব এই দুটি বিষয় দূতের উপর নির্ভরশীল—

"অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্যয়ৌ।।"[১৯]

পররাজ্যে উপস্থিত হয়ে দূত এমন কাজ করতে পারেন, যার দ্বারা উভয় রাজ্যের মধ্যে

ভেদ বা মিলন সংগঠিত হয়। দূত প্রতিপক্ষ রাজার অনুচরবর্গের সাথে মিশে তাদের গুপ্ত ইঙ্গিত বা চেষ্টার দ্বারা কর্তব্য বিষয়ে ওই শত্রু রাজার অভিপ্রায় বুঝবে; ভৃত্যবর্গের প্রতি ওই শত্রু রাজার ঠিক কি মনোভাব তা বুঝবে এবং এইরকম নানা উপায়ে ওই প্রতিপক্ষ রাজার সব অভিলষিত কাজ সতর্কতার সাথে ঠিকমতো বুঝে নিয়ে প্রভুকে এসে নিবেদন করবে।

"স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢ়েঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম।।"

"বুদ্ধা চ সর্বং তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ।।"[২০]

দূর্গস্থাপন :

রাজার দিক থেকে দুর্গনির্মাণের প্রথম প্রয়োজন রাষ্ট্রের সুরক্ষা। সুষ্ঠু রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যে দুর্গের পরিকল্পনা রাজনৈতিক মাত্রা লাভ করেছে, সে কথা মনু থেকে আরম্ভ করে কৌটিল্য, সকলেই সমস্বরে স্বীকার করেন। কৌটিল্য চার-রকমের দুর্গের কথা বলেছেন—ঔদক বা জলদুর্গ, পার্বত বা গিরিদুর্গ, ধন্বদুর্গ এবং বনদুর্গ। ঔদক দুর্গের চার দিকে নদীর জল থাকবে। যে দুর্গের সর্বত্র বা চার দিকে পাহাড়, অথবা যেখানে প্রচুর স্বাভাবিক গুহা আছে, সেটাই গিরিদুর্গ। ধন্বদুর্গকে মোটামুটি মরুদুর্গ বলা যায়। ঘনসন্নিবিষ্ট গাছ যেখানে শত্রুর প্রবেশ কষ্টকর করে তোলে, সেটাই বনদুর্গ। মনুসংহিতা এবং মহাভারতে আরও দুইরকমের দুর্গের কথা বলা আছে। তার একটি হল পাষাণ বা ইটের তৈরি মহীদুর্গ, আর দ্বিতীয়টি হল চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীরক্ষিত নৃদুর্গ, অস্ত্রধারী মানুষই এখানে দুর্গমত্ব তৈরি করে। ছয়-রকমের দুর্গের মধ্যে, মনু সবচেয়ে পছন্দ করেন গিরিদুর্গ; কারণ, পর্বতের নিজস্ব প্রাকৃতিক সুবিধেটা এত বেশি যে, অন্যান্য কৃত্রিম দুর্গের চেয়ে রাজাকে অনেক বেশি সুবিধে দেয় এই দুর্গ। তা ছাড়া, যুদ্ধ এবং শত্রুসৈন্যকে পালটা আক্রমণ করার সুযোগও গিরিদুর্গেই বেশি। পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলা বা শরক্ষেপণও গিরিদুর্গের সুবিধের মধ্যে পড়ে বলেই, গিরিদুর্গের ওপর মনু-মহারাজের আকর্ষণ বেশি। মহাভারতের কবি আবার নৃদুর্গই বেশি পছন্দ করেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশের চূড়ান্ত পরিণতি হল এই গ্রন্থটি। গ্রন্থে রাজত্ব, রাজার গুণ ও কর্তব্য, বিচারব্যবস্থা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। মনু রাজার কর্তব্য পালন এবং নিজের ও প্রজাদের শুভ চিন্তা বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, যা শুধু প্রাচীন যুগের রাজাদের ক্ষেত্রেই নয়, বর্তমানের রাজনীতিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এজন্যই আচার্য মনুকে ভারতীয় রাজনীতির জনক বলা হয়। তাঁর রাজনৈতিক ধারণা ও নীতি আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। মনুসংহিতাকে বলা যায় প্রাচীন ভারতের আইনশাস্ত্র বা সংবিধান। আচার্য মনু অন্য ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা সকল ঋষিগণের মধ্যে সর্বপ্রধানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন। মনুসংহিতার সঙ্গে অন্য ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ পরিলক্ষিত হলে আচার্য মনুর বাক্যই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মমুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ।

মনুসংহিতা ভারতীয় আইনব্যবস্থা ও সামাজিক দর্শনের অন্যতম প্রাচীন এবং প্রামাণিক একটি গ্রন্থ হলেও বর্তমান সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে কিছু বিতর্ক ও সমালোচনার উদ্ভব ঘটেছে, বিশেষত সমাজে নারীর অবস্থান ও বর্ণবৈষম্য এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের লেখায় সামাজিক লিঙ্গবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আজকের ভারতীয় সাহিত্যের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের লেখায় সামাজিক বর্ণব্যবস্থা ও নারী স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, অমিতাভ ঘোষ, অরুন্ধতী রায়, মনোরঞ্জন ব্যাপারী ইতাদি লেখক। এই সামাজিক বর্ণব্যবস্থা প্রধানত 'আইনগতভাবে' স্বীকৃত পায় মনুসংহিতাকে কেন্দ্র করে।

অমিতাভ ঘোষের 'দ্য শ্যাডো লাইনস'(১৯৮৮) উপন্যাসে অমিতাভ ঘোষ যদিও সরাসরি মনুসংহিতার সমালোচনা করেননি তবুও, এই উপন্যাস একটি কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং ভারতীয় সমাজে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে লড়াইয়ের বিস্তৃত প্রভাবকে গভীরভাবে তুলে ধরে। উপন্যাসটির চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনার মাধ্যমে, উপন্যাসটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে এই বিভাজনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বারবার। লেখকের অপর একটি উপন্যাস 'দ্য গ্লাস প্যালেসে'র(২০০০) মধ্যেও এই জাতীয় যে শ্রেণিবদ্ধ ব্যবস্থাগুলি সামাজিক সংঘাত এবং বিভাজনের দিকে নিয়ে যেতে পারে তার সমালোচনাও করেছেন।

অরুন্ধতী রায় তাঁর 'দ্য গড অফ স্মল থিংস' (১৯৯৭) উপন্যাসে জাতি ও লিঙ্গ বৈষম্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি এই নিয়মগুলির নিষ্ঠুর এবং অমানবিক প্রভাবগুলি উন্মোচন করেছেন, দেখিয়েছেন যে কীভাবে তারা সমাজে অসমতা এবং সহিংসতাকে স্থায়ী করে। বর্ণ-ভিত্তিক বৈষম্য এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের স্থায়ীকরণে এর ভূমিকা তুলে ধরার জন্য লেখিকা মনুসংহিতাকে দায়ী করেছেন। দলিত এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নিপীড়ন এবং বর্জনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য কিভাবে এই পাঠ্যটি ঐতিহাসিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলার নিম্ন বর্ণ ও উপজাতি প্রধানত শবর সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাপনের কঠোর বাস্তবতাকে উন্মোচিত করার জন্য মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যিক শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রায়শই মনুর বর্ণ ব্যবস্থার শিকার। তৎকালীন সমাজ তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ধীরে ধীরে মুণ্ডারা তপশিলীরা, আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। এই দুনিয়া বদলের ছবিই মহাশ্বেতা দেবী এঁকেছেন তাঁর নিম্নবর্গীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কেন্দ্র করে লেখা হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), অরন্যের অধিকার(১৯৭৯), চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর (১৯৮০) ইত্যাদি উপন্যাসে। স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যায় অধিকাংশই নিম্নবর্ণ জাতি, এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আদিবাসীরা। সে কারণেই জাতীয় অর্থনীতিক প্যাটার্নে

তারা ব্রাত্য। এই ব্রাত্যসমাজের কথাই বলেছেন মহাশ্বেতা দেবী। এখন কেউ কেউ বলতে চান তাঁর উপন্যাসে আমরা বহুকণ্ঠস্বরকে শুনতে পাই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপন্যাস আকীর্ণ। হয়ত তাই। কিন্তু মহাশ্বেত দেবীর উপন্যাসে যে কণ্ঠস্বরটি বেজে ওঠে তা তীরের ফলার মতো প্রতিবাদী এবং পাপন্ন।[২১]

আশাপূর্ণা দেবী মনুস্মৃতির পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তার আঁকা নারী চরিত্রগুলি পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসে সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা মনুসংহিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বলা যায়। লেখিকা তাঁর লেখা ট্রিলজির অন্যতম উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে দেখাচ্ছেন যখন আমাদের সমাজে অন্তঃপুর ছিল অবহেলিত, যখন সেখানকার নারীরা পুরোপুরি আস্ত মানুষের সম্মান কখনো পেত না, তখন সামান্য কটি মেয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে, সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর আলো এনে দেবার সুযোগ করে দেয় অন্তঃপুরে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র 'সত্যবতী' ছিল সেই সামান্য কজন মেয়ের অন্যতম। মেয়েমানুষকে সেই সময়ের পুরুষতান্ত্রিক তথা রক্ষণশীল সমাজ যে সমস্ত বিধিনিষেধের মধ্যে বেঁধে রেখেছিল, সেই সমস্ত বিধিনিষেধকে আর পাঁচজন সাধারণ, নিতান্ত নিরীহ, নির্বিবাদী নারীর মতো করে মেনে নিতে পারত না সত্যবতী। সেই সমাজের সাধারণ নারীরা সমস্ত বিধিনিষেধকে ভগবানের নির্দেশ মেনে করত, কিন্তু সত্যবতী ছিল তাদের থেকে আলাদা। আর তাই বারেবারে মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ বলে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের আটকে রাখার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাত সে। মেয়ে বা ছেলে দুজনেই যে মা-বাবার সন্তান, তাদের মধ্যে শারীরিক গঠনগত পার্থক্য ছাড়া যে আর কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই- এই সহজ সত্যটা তার মতো একটা ছোট্ট মেয়ে উপলব্ধি করতে পারত। যুক্তি দিয়ে সে সেই সহজ সত্যটাই বোঝাতে চাইত বারে বারে। প্রতিবাদ করত সেই সময়কার এই সমস্ত বিধিনিষেধ (taboo), লোকাচারের বিরুদ্ধে।[২২]

বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারীও দলিতদের জীবনে মনুসংহিতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় (ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন — ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব) মনুসংহিতা দ্বারা সংযোজিত বর্ণপ্রথা কীভাবে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাংলার দলিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি আধুনিক ভারতে বিদ্যমান সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদস্বরূপ।

কথাসাহিত্যের বাইরে, মনুসংহিতা বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এবং আইনি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে। বাংলার পণ্ডিত ও চিন্তাবিদরা পাঠ্যটির সাথে সমালোচনামূলকভাবে জড়িত, বাঙালি সমাজে এর প্রভাব এবং আধুনিক বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিদ

ডক্টর সুকুমার সেনের রচনায় মনুসংহিতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাঙালি সমাজে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সমসাময়িক সময়ে, মনুসংহিতা বাংলায় গবেষণা এবং বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষাপটে। লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি ভারতীয় সমাজে গভীরভাবে বসে থাকা বৈষম্যগুলি দূর করতে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আরও প্রগতিশীল ব্যাখ্যার পক্ষে সমর্থন করার জন্য মনুসংহিতার কিছু সংশোধন করা হলে মনুসংহিতার রাজনৈতিক চিন্তাধারা আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রেরও আদর্শ হতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা. ও অনু.); মনুসংহিতা; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দোলযাত্রা ১৪১০, শ্লোক সংখ্যা- ৭/২
২. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৩
৩. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/২০
৪. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/১৭
৫. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৪৪
৬. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৫১
৭. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/১৪৫-১৪৬
৮. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/১৪৭-১৪৮
৯. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/১৪৪
১০. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৮/৩৫০
১১. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ১০/১১৯
১২. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৮৭
১৩. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৮৯
১৪. মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস- প্রণীতম্; মহাভারতম্(ভীষ্মপর্ব), শ্লোক সংখ্যা- ১/২৬-৩২
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পাদনা ও অনুবাদ);কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্(প্রথম খণ্ড); সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০২১, শ্লোক সংখ্যা- ১/৭/৩
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা. ও অনু.); মনুসংহিতা; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দোলযাত্রা ১৪১০, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৫৬
১৭. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৫৭
১৮. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৬৩-৬৪
১৯. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৬৫
২০. তদেব, শ্লোক সংখ্যা- ৭/৬৭-৬৮
২১. ভৌমিক, তাপস (সম্পা.); কোরক সাহিত্য পত্রিকা(মহাশ্বেতা সংখ্যা), বইমেলা- ১৯৯৩
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ(সম্পা.); এবং এই সময় সাহিত্য পত্রিকা (আশাপূর্ণা শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা), উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, শীত সংখ্যা ১৪১৫

উ ষ্ণী ষ প তি

বাঙালির ভোজনবিলাস : আমিষ পর্ব

বুদ্ধদেব বসুকে একবার বক্তব্য রাখার জন্য আমেরিকার এক ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় শহরে যেতে হয়েছিল। আয়োজকরা এক ভারতীয় তামিল পরিবারে তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেই রাতটি অধ্যাপক কবিকে উপোসে কাটাতে হয়েছিল। কয়েক চামচ খাবার ও এক কাপ কফি ছাড়া কিছুই খেতে পারেননি। আয়োজকরা হয়তো জানতেন না ভারতীয় রান্না বলে আসলে কিছু নেই — আছে কয়েকটি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন রন্ধন প্রণালী যা আঞ্চলিক ভূগোল-ইতিহাস নির্ভর। মাছে-ভাতে বাঙালির পক্ষে তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারের নিরামিষ খাবার পছন্দ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোনো প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বিষয় নেই। কিন্তু বাঙালির এই মৎস্য প্রীতি কবে থেকে? এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও খাল-বিল-নদনদী বহুল প্রশান্ত সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি-অস্ট্রেলীয় মূলেই যে বাঙালির মৎস্য প্রীতির রহস্য লুকিয়ে আছে তা বোঝা যায়। বাঙালি হয়তো তাদের পূর্বপুরুষদের সেই অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। বাঙালিদের এই মৎস্য প্রীতি বৈদিক আর্য্যরা ভালো চোখে দেখেনি। এখনও 'নর্ডিক আর্যদের উত্তরসূরী' উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা মৎস্যভূক বাঙালিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

বাঙালির মৎস্য প্রীতির কিছু প্রাথমিক সূত্র পাওয়া যায় নানা শিলালিপিতে। যেমন চন্দ্রকেতু গড়ে মাছের ছবি-সহ একটি ফলক পাওয়া গেছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, যার আনুমানিক সময় চতুর্থ শতক। এছাড়া আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে কিছু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। যেখানে মাছ কোটা ও ঝুড়িতে ভরে হাটে নিয়ে যাওয়ার দুটি বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে (আর্য) ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও প্রাণীহত্যা বিষয়ে অনিহা তৈরি হয়। সে থেকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ নিরামিষ খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু ধর্মের ভয়ে লোভনীয় মাছ-মাংস থেকে বাঙালি বেশিদিন দূরে থাকতে পারেনি। তৎকালীন বাঙালি সমাজের ধর্মীয় বাধা নিষেধের থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় প্রাক-রঘুনন্দন যুগের ভবদেব ভট্ট, শ্রীনাথ আচার্য, চূড়ামণি প্রমুখ বাঙালি স্মৃতিকারদের ধর্মীয় উদারীকরণ নীতির মধ্য দিয়ে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস, ছাগলেয় প্রমুখ প্রাচীন স্মৃতিকারদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ভবদেব ভট্ট১ চতুর্দশী তিথি বা এই ধরনের বিশেষ বিশেষ বার বা তিথি বাদ দিয়ে বাঙালি ব্রাহ্মণদের মাছ ও মাংস খাওয়ার চলকে সমর্থন করলেন।[২] শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকদের মধ্যে হরিণ মাংস ভোজনের চল ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর পোড়ামাটি ফলকে তার প্রমাণ মেলে। ছাগ-মাংসও সমাজের সব স্তরে প্রচলিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের অনুমান, কোনো কোনো প্রান্ত এলাকায় আদিবাসী কৌমের মধ্যে শুকনো

মাংস খাওয়ারও চল ছিল।'[৩] ভবদেব ভট্ট শুকনো মাংস খাওযার চলকে কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করেননি। স্মার্ত রঘুনন্দনের অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি বিষ্ণুপুরাণ থেকে দুটি শ্লোক ব্যবহার করে; কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া মৎস্য ও মাংসকে ছাড়পত্র দিয়েছেন। আনুমানিক খ্রিস্টীয় বারো-তেরো শতকে রচিত শ্রীহর্ষের 'নৈষধরিত' কাব্যে নলদময়ন্তীর বিয়ে উপলক্ষে প্রচুর শাক-সবজি, পিঠা, সুগন্ধি পানীয়, তাম্বুলের সঙ্গে মাছের তরকারি, ছাগ-মেষ-হরিণের মাংসেরও বর্ণনা পাই। বৃহর্দমপুরাণ মতে, সাদাবর্ণ ও আঁশযুক্ত রোহিত (রুই), শফর (পুঁটি), শকুল (শোল) প্রভৃতি মাছ ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য। বাইবেলেও এমন বিধান রয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন - 'ইহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ (খণ্ডিত-খুর) নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। ...আবার হিঁদুর মতো ইহুদীরা বৃথা মাংস ওদেবতার উদ্দেশ্যে যা নিবেদিত বা বলি দেওয়া নয়] খায় না।'[৪] অনেক বাঙালি ব্রাহ্মণ এখনো শিঙি, মাগুর, বোয়াল মাছ খান না। বারো শতকে রচিত সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব'তে শুঁটকি মাছের প্রসঙ্গ এসেছে। 'কলাবিবেক' গ্রন্থে জীমূতবাহন ইলিশ মাছ ও তা তেলের প্রশংসা করেছেন। ভবদেব ভট্টের, 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ / নিরূপণ' গ্রন্থে গোধা, কচ্ছপ, শশক প্রভৃতি পাঁচনখ বিশিষ্ট মাংস খাওয়ার কথা আছে। যদিও আদিবাসী বা নিম্নবর্গের মধ্যে শামুক, কাঁকড়া, মোরগ, সাপের মত বাণ মাছ খাওয়ার চল ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র নাম না জানা এক কবির লেখা শ্লোকে কলার পাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, গরম দুধ, নালিতা (পাট) শাকের সাথে 'মোইনিমচ্ছা' (মৌরলা মাছ) পরিবেশনের কথা পাচ্ছি। যিনি খাচ্ছেন তাঁকে পূণ্যবাণ বা সৌভাগ্যবাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থে মাছের প্রসঙ্গ তেমন না এলেও মাঝ নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার ইঙ্গিত রয়েছে কাহ্নপাদের তেরো নম্বর চর্যায়। আর ভুসুকু পাদের ৬ ও ২৩ নম্বর চর্যায় হরিণ শিকারের চিত্র উঠে এসেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'পদ্মাপুরাণ'। প্রথম জন পূর্ববঙ্গের আর দ্বিতীয় জন পশ্চিমবঙ্গের। খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের শেষ দিকে রচিত বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ষোলো রকম নিরামিষ তরকারির পাশাপাশি আমিষ রান্নার কথা ও রয়েছে। পুত্রদের পান্তা ভাত খাওয়ার আবদার শুনে আনন্দিত মাতা সোনেকা ছয় পুত্রবধূদের ডেকে রান্নার আয়োজন করতে বললেন। স্নান করে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে রান্না শুরু হল। প্রথমে ষোলো রকম নিরামিষ পদ রান্না করে মাছের ব্যঞ্জন রান্নাতে হাত লাগালেন। রান্না চড়ানোর পূর্বে মাছ-মাংস কাটাকুটি করে আলাদা আলাদা পাত্রে ভাগ করে রাখলেন। তারপর রুই মাছ দিয়ে রান্না করলেন কলতার ডগা। আর গুচ্ছ গুচ্ছ তিক্ত গিমা শাক রান্না করলেন মাগুর মাছ সহযোগে। ঝাঁজ যুক্ত সরষে তেলে ভাজলেন খরশুলা মাছ। চিংড়ির মাথার ভিতরে গোলমরিচ গুড়ো ঢুকিয়ে সুতো জড়িয়ে রান্না করলেন এক বিশেষ

পদ। তারপর একে একে ভাজলেন রুই ও চিতল মাছের কোল (পেটি)। শল্কহীন বান মাছের ছাল খসিয়ে খৈ সংযুক্ত করে প্রস্তুত করলেন 'বাইন মৎস্যের খৈ'।"[৫] "শেষে জিরা, মরিচ ও ভাজা নারকেল দিয়ে বুড়া খাসির চর্বি রান্নার মধ্য দিয়ে আমিষ পর্ব শেষ হলো।"[৬]

কবিকঙ্কন মুকুন্দ রামের 'চণ্ডীমঙ্গল' জুড়ে মাছ-মাংসের ছড়াছড়ি। আখেটিক খণ্ডের 'নিদয়ার সাধ ভোজন' অংশে জামিরের রস দিয়ে পোড়া মাছ, লোন (নুন) দিয়ে নকুল ও গোধিকা (গোসাপ) পোড়া, হাঁসের ডিমের বড়া, রাই খড়া ভাজা, চিংড়ির বড়া, সজারুর শিক-পোড়া (শিক-কাবাব) প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।[৭] এছাড়া ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের 'খুল্লনার রন্ধন' অংশে আদা ও মরিচ রস সহযোগে গণ্ডাদশেক কইভাজা, চিতল মাছের কোল (পেটি) ভাড়া, মান-বড়ি ও মরিচ গুঁড়ো সহযোগে রোহিত (রুই) মাছের ঝোল, চিতল মাছের কোল (পেটি) ভাজা, বোদালি (বোয়াল) মাছ ও হেলেঞ্চার রান্না, রাই খড়া ভাজা, চিংড়ির বড়া, খরশোলা ভাজা, আম যোগে শোল মাছ, তেঁতুলের রস দিয়ে পাঁকাল মাছের অম্বল।[৮] আবার 'খুল্লনার রন্ধন ও কুটুম্ব ভোজন' অংশে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাজা মীন (মাছ), মাংসের ঝোলের মত আমিষ রান্নার উল্লেখ রয়েছে। যার 'গন্ধে আমোদিত হৈল ভোজন-ভবন।।'[৯] 'কালকেতুর ভোজন' অংশে হরিণ মাংসের ঝোলের কথা পাই। একটু উল্টো চিত্র দেখি 'ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ' অংশে। 'মৃগ-খগ-বরা' মাংসের পসরা সাজিয়ে ফুল্লরা হাটে বেচতে যায়। কিন্তু সবদিন সমান চলে না। যখন, 'মাংস নাহি খায় সর্ব লোক নিরামিষ।।'[১০] কেউ আর মাংসের আদর করে না। কারণ 'দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।।'[১১] তাই শিকার করা 'বৃথা মাংস' আর কেউ কেনে না। তবে, মাংস খাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়না। আকবরের বঙ্গ বিজয়ের (১৫৭৫ খ্রি.) কাছাকাছি সময়ে লেখা কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।[১২] ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী জানাচ্ছেন - "আকবর আর জাহাঙ্গিরের আমলে বাংলায় খাসি, বাছুর, বনমোরগ, বুনো শুয়োর, খরগোশ, হরেক রকম পাখি খাওয়ার চল থাকলেও ছুঁতমার্গ ছিল শুধু মোরগ, হাঁস-মুরগির ডিম, পোষা শুয়োর, আর গৃহপালিত পশু পাখি নিয়ে।"[১৩] বঙ্গদেশে যে সব মোগল কর্মকর্তা থাকতেন তারা বাঙালির মাছ-ভাত খাওয়াকে ঘৃণার চোখে দেখত। চৈতন্য পর্বে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ঢেউ বাঙালিকে কিছুটা নিরামিষ ঘেষা করলেও, বাঙালি তাতে আটকে থাকেনি। যদিও এই সময় লাবড়ার মতো উপাদেয় নিরামিষ খাবারও আমরা পেয়েছি।

সতেরো শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে' মাংস ভাজা, মাংসের ঝোল, হাড়ের মাজা দিয়ে বড়া, আদারস সহযোগে মাংসের পিঠার উল্লেখ রয়েছে।[১৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' ও আমিষ রান্নার ছড়াছড়ি। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক কী কী মাছ পাওয়া যেত - 'নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর।।/ চীতল ডেকুট কই কাতলা মৃগাল।/ বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।।/ পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।/ গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা।।/ মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা

কই।/ কাল বসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই।।/ শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।/ চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।। / গাঙ্গ দাড়া ভেদ চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।/ খরশুল্বা তপসিয়া গাঙ্গাশা ইলিশা।।'[১৫]

এই সব মাছ দিয়ে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনের কথা বলেছেন ভারতচন্দ্র। যেমন - কাতলা, ভেটকি ও কইয়ের ঝাল ও শিকপোড়া; চিতল, ফলুই, কই ও মাগুরের ঝাল ও ঝোল, বাগদা চিংড়ির ঝাল, আমে শোলে ঝোল ও চচ্চড়ি, কাছিম ডিম ও মাছের ডিমের বড়া, সোনাখড়কীর ঝোল ও ভাজা, রুই-কাতলার কণ্ঠা ইত্যাদি। এছাড়া কচি ছাগ ও হরিণ মাংসের ঝাল, ঝোল, রসা, কালিয়া, দোলমা, সেকী, সমসা, পোলাও ও শিক কাবাব প্রভৃতি পদের কথা রয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে মাংস মাখানো ভাতের কথা থাকলেও এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর পলান্ন, বিরিয়ানি, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের সাহিত্যেও বাঙালির মৎস্য প্রীতির পরিচয় মেলে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, 'ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল / ধান ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।'[১৬] এমনকি রামকৃষ্ণদেবও মাছের বিভিন্ন পদ খেতে ভালোবাসতেন। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ মাছ-শুক্তো, মাছের অম্বল, মাছের কারি, মিষ্টি ও সন্দেশ খেতে পছন্দ করতেন। মাছের মধ্যে ইলিশ ছিল তাঁর প্রিয়। এমনকি ১৯০২ সালের ৪ জুলাই (প্রয়াণ দিবস) শেষ মধ্যাহ্ন ভোজনেও স্বামীজির পাতে বাদ পড়েনি ইলিশের ঝোল-অম্বল-ভাজা। স্বামীজি ভক্তের আনা মাছ না ফিরিয়ে, ভালো করে রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দিতে বলতেন। মাছ কাটার সময় ঠাকুরের ভোগের জন্য বেশির ভাগ অংশ রেখে, বাকি অংশটুকু 'ইংরেজ ধরনের' রান্না করার জন্য চেয়ে নিয়ে দুধ, দই প্রভৃতি দিয়ে চার পাঁচ প্রকার মাছ রেঁধে ছিলেন।[১৭] উনিশ শতকে প্রচলিত প্রবাদেও রুই, কই'য়ের ছড়াছড়ি। যেমন - 'অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে' / 'অল্প জলে পুঁটি মাছ ফ র্ফ র্করে।'[১৮] কিন্তু শ্রীপান্থ 'ভেতো বাঙালি' বা 'মেছো বাঙালি' প্রবাদ দুটি মিথ্যে রটনা রটনা বলে মনে করেছেন। ইংরেজ আমলেই আঠারো বার দুর্ভিক্ষের সম্মুখিন হয়েছে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন বাঙালি 'মেছো বাঙালি' অভিধা পাওয়ার যোগ্য নয়। যেখানে ইংরেজরা বছরে মাথা পিছু ঊনপঞ্চাশ পাউণ্ড মাছ খায়, ডেনমার্কের লোকেরা খায় চব্বিশ পাউণ্ড; সেখানে বাঙালি নয় পাউণ্ডে আটকে গেছে। তবে, মাছ ব্যাপারে যে বাঙালি উদাসিন নয় সে কথা স্বীকার করেছেন লেখক।[১৯] সে সময়ে কলকাতার ইংরেজ সাহেবরা কাঁটা বিহীন ভেটকি, তোপসে ও চিংড়িতে মজে ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ' কবিতাতে তার প্রমাণ মেলে - 'ডিস ভোরে কিস লয় মিস বাবা যত। / পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত।।'[২০]

এই লোভনীয় দৃশ্য দেখে খাদ্য রসিক বাঙালির মনের অবস্থা কী হতে পারে কবিতাটির পরের কয়েকটি লাইন পড়লেই বোঝা যায় 'হ্যাদে রে নিদয় বিধি ধিকধিকতোরে।। কি হেতু

বেলাকহিঁদু কোরেছিস মোরে।। / গোরা হ'লে হোরা মেরে চ'ড়ে মনোরথে।'[২১] আঠারো ও উনিশ শতকে তোপসে নিয়ে বাঙালি তথা সাহেবদের আদিখ্যেতা চোখে পড়ার মত। ইলিশকে যেমন রুপোলি শস্য বলা হয়। তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত তোপসেকে জলের অমৃত ফল বলে সম্বোধন করেছেন। বিপ্রদাসের পাক-প্রণালীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'তপস্যা মাছের ইহুদি লবাদান' এর উল্লেখ পাচ্ছি। সাহেবরা বলত ম্যাঙ্গোফিস। সম্ভবত আমের মরশুমে এর আবির্ভাব বলে এই অভিনব নামকরণ। সাহেবদের প্লেটে যখন ম্যাঙ্গোফিস হাতছানি দিচ্ছে, তখন বাঙালি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুচো চিংড়ি, চুনো পুঁটির দরদাম করতে ব্যস্ত।[২২]

মৎস্যভুক বাঙালি মাংসকেও সাদরে গ্রহণ করেছিল। বিশেষত 'পাঁটা' শুনতেই বাঙালি পাগল, 'রসভরা রসময় রসের ছাগল। তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।।'[২৩] উনিশ শতকের বাঙালি ব্রাহ্মণরা বৃথা মাংস বিশেষ না খেলেও কালিঘাটে'র কৃপায় পাতে মাংস উঠত। শোনা যায় রামমোহন গোটা একটা ছাগল খেয়ে দিতে পারতেন। তৎকালীন আধ্যাত্মিক গুরুরাও বিশেষ বাধা দেননি। বিবেকানন্দও পয়সা থাকলে খেতে বলেছিলেন, তবে পশ্চিমি গরম মশলা গুলো বাদ দিতে বলেছিলেন। সে সময় পচা হরিণের মাংস, রসা ভেটকিরও যে প্রচলন ছিল তাও জানাচ্ছেন তিনি। হিন্দুরা গেঁয়ো মুরগি না খেলেও বুনো মুরগি ও হাসের ডিম খেত।[২৪]

এই মাংসকে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকে হিন্দু কলেজের নব্যবঙ্গ ছাত্রদের উন্মাদনা চরমে পৌঁচেছিল। সময়টা ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ সাল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ এক ঘোরতর রূপ নেয়। ছেলেরা পৈতে, সন্ধ্যা-আহ্নিক সব পরিত্যাগ করেছিল। রাজনারায়ণ বসু'রা অত্যধিক মদ্যপান করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, '... সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষা ও অতিরিক্ত সীমান্তে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য, 'আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চীৎকার করিত।'[২৫] রাধানাথ শিকদার ছিলেন গোমাংশের ভক্ত। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'একজন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গাল বলিতেন যে, প্রত্যহ এ বেলা অর্দসের আর ও বেলা অর্দসের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন, কার্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন।'[২৬] উনিশ শতকে রচিত 'পাকরাজেশ্বর' (১৮৩১) ও 'ব্যঞ্জনরত্নাকর' নামের দুটি পাক-প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থেও মাছ মাংসের ছড়াছড়ি। এছাড়া প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' এর দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে নানা রকম সুপ, মাছ, সস ও গ্রেভি, পোলাও, চপ, কাটলেট, কোপ্তা, কাবাব ইত্যাদি। রাজানারায়ণ বসু বন্ধুদের সঙ্গে খেতেন শিক কাবাব আবার বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে খেতেন পোলাও-কালিয়া, কোপ্তা।[২৭]

সুতরাং প্রাচীনকালে বাঙালির খাবার-দাবার প্রধানত আমিষ প্রধান ছিল। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রভাবে নিরামিষ ও নানাবিধ মিষ্টান্নের জনপ্রিয়তা বাড়লেও বাঙালি বেশিদিন নিরামিষাশী হয়ে থাকতে পারেনি।

টীকা ও তথ্যসূত্র :

১. বর্তমানে K. T. Achaya বা গোলাম মুরশিদ-এর মতো গবেষকরা ভবদেব ভট্টকে দশ বা এগারো শতকের বলে উল্লেখ করছেন। তবে, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে তর্ক আছে। দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, প্রথম প্রকাশ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি., পৌষ ১৩৬৭, পৃ. ৮-৯।

২. ভট্ট, ভবদেব। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (সম্পা.), বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, পৃ. ৬৭।

৩. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস : সপ্তম সংস্করণ, আদিপর্ব, দে'জ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৪৪৬।

৪. [স্বামী] বিবেকানন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, স্বামী মুমুক্ষানন্দ (প্রকাশক), চতুর্থ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, চৈত্র ১৩৮৩ [২২ তম পুনর্মুদ্রণ: পৌষ ১৪১৮], পৃ. ১৪৩।

৫. গুপ্ত, বিজয়। 'পদ্মপুরাণ/মনসামঙ্গল', শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য (সংকলক), সুধাংশু-সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ. ৯৭।

৬. তদেব, পৃ. ৯৭।

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', দ্বিতীয় সংস্করণ, ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড : এলাহাবাদ ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস : কলিকাতা, ১৯২১, পৃ. ৪৩-৪৪।

৮. তদেব, পৃ. ১৬৩।

৯. তদেব, পৃ. ১৯২।

১০. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম। চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, প্রজ্ঞাবিকাশ, জুলাই ২০০৬, [পুনর্মুদ্রণ মার্চ, ২০১১] পৃ. ৭৯।

১১. তদেব, পৃ. ৭৯।

১২. কবি-কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে মুসলমানদের আগমণের কথা রয়েছে। দ্র. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম। 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশক: ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড ও ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯২১, পৃ. ৮৬।

১৩. Raychaudhuri– Tapan. Modes of Life. Bengal under Akbar and Jahangir - An introductory Study in Social History– Second Impression– Munshiram manoharlal– May 1969– p. 220.

১৪. চক্রবর্তী, রূপরাম। ধর্মমঙ্গল, সুকুমার সেন (সম্পা.), ১ খণ্ড, ১৩৬৩, পৃ. ৬১।

১৫. ভারতচন্দ্র। অন্নদামঙ্গল, শ্রী নির্মলেন্দু মুখো (সম্পা.), পঞ্চম সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০০-০১, [পুনর্মুদ্রণ ২০০৬-০৭], পৃ. ৯৩-৯৪।

১৬. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য।', ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী, (গ্রন্থাবলী সিরিজ), প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত; বসুমতী, প্রকাশসাল অনুল্লিখিত, পৃ. ১৫২।

১৭. [স্বামী] বিবেকানন্দ। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় সংস্করণ, নবম খণ্ড, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ভাদ্র ১৩৮০, [২১ তম পুনর্মুদ্রণ : জানু ২০১২], পৃ. ১৩১-১৩২।

১৮. লঙ, [রেভারেণ্ড] জেমস। 'প্রবাদ মালা', কলিকাতা, ১৮৬৮, পৃ. ২,৩।

১৯. শ্রীপান্থ, 'মৎস্যপুরাণ।', কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ, অক্টো. ১৯৯৯, [একাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০১৮], পৃ. ৪০৯-৪১০।

২০. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, (গ্রন্থাবলী সিরিজ), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক), বসুমতী (অনুল্লিখিত) পৃ. ১২৩।

২১. তদেব, পৃ. ১২৩।

২২. "....মাংসের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে মাংস জুটিয়া উঠা ভার।" দ্র. বসু, রাজনারায়ণ। সে কাল আর এ কাল, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা.), দ্বিতীয় সংস্করণ, বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৫৭ (প্রথম পরিষৎ সংস্করণ), [চৈত্র, ১৪২২ (৭ম মুদ্রণ)] পৃ.৪০।

২৩. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, (গ্রন্থাবলী সিরিজ), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক), বসুমতী (অনুল্লিখিত), পৃ. ১১৮।

২৪. [স্বামী] বিবেকানন্দ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, চতুর্থ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, চৈত্র ১৩৮৩, [পৌষ ১৪১৮ (২২তম পুনর্মুদ্রণ)], পৃ. ১৪৩-১৪৪।

২৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, নিউ এজ, জানুয়ারি ২০০৭, ও২০০৯ (তৃতীয় মুদ্রণ)], পৃ. ৭১।

২৬. বসু, রাজনারায়ণ। সেকাল আর একাল। কলিকাতা; বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত, ১৭৯৬ শকাব্দ, পৃ. ১৩৯।

২৭. বসু, রাজনারায়ণ। আত্মচরিত, ১৩১৫, কলিকাতা, পৃ. ৪২-৪৪।

শাশ্বতী সিনহা বাবু

বাংলার পট ও পটুয়া নারী

অনেক আগেই পটুয়ারা ধর্মীয় গণ্ডী কেটে বেরিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে হিন্দুয়ানী আর মুসলিম সংস্কৃতির যুগ্ম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ অনেকেই অনুসন্ধান করেছেন। পটুয়াদের উপার্জনের জন্য সব ধর্মের মানুষের কাছেই তাদের পট দেখাতে যেতে হত। তখন তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মাচরণ ছিল। কিন্তু কালে কালে হিন্দু ধর্মের উন্নাসিকতা ও প্রবল ধর্মীয় গোঁড়ামী হয়ত এদের মুসলমান হতে বাধ্য করেছিল। তা সত্ত্বেও পূর্বপুরুষদের জাত ব্যবসা পট দেখানো থেকে এরা নিবৃত্ত হতে পারে নি। হিন্দু ও মুসলমানদের নানা ধরণের পট এরা দেখায়। সেসব পটের কাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে গান বাঁধে। গান গায়। সে সব গান পুরুষানুক্রমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হতে থাকে। পটুয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব বা উৎপত্তি বৃত্তান্ত সম্পর্কে ওই জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন মত রয়েছে। এরা সে সব বিশ্বাস করে। এ শিল্পকলার আদি উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন কিছু জানা যায় না, তেমনি এ শিল্প কর্মে নিয়োজিত চিত্রকর সম্প্রদায়ের আদি উৎপত্তিও জল্পনা-কল্পনার বিষয়।

পটুয়া জনগোষ্ঠী কীভাবে উদ্ভব হল সে সম্পর্কে পটুয়াদের মধ্যে নানা বক্তব্য প্রচলিত আছে। পটুয়া অজিত চিত্রকরের কথায় হাবিল, কাবিল দুই ভাই। হিন্দু শাস্ত্র পড়ার জন্য হাবিল হিন্দু হল। আর কাবিল কোরান পড়েছিল বলে সে হল মুসলমান। ইন্টারনেটে এক নিবন্ধে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য লিখেছেন,

এখানে ধর্মের কথা উঠলেই চিত্রকরের দল গেয়ে ওঠে —

"হাবিল পড়িল শাস্ত্র কাবিল কোরান
তাহা হতে সৃষ্টি হল হিন্দু মুসলমান।"

আমার মনে হয় দুই সহোদর ভাই হাবিল আর কাবিলকে নিয়ে এই দু'কলি গানই যথেষ্ট তাদের ধর্মীয় চেতনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য। বর্তমানে প্রায় আড়াইশো পটুয়া পরিবারের বাস এখানে। "যুগ যুগ ধরে এখানে মাঠের ফসল, নদীর জল, ধর্ম-বিশ্বাস হাত ধরাধরি করে আপন খেয়ালে গড়ে উঠেছে, মানুষকে বাঁচতে শিখিয়েছে, মুখে দিয়েছে গান, প্রাণে দিয়েছে সুর আর হাতে দিয়েছে রঙিন স্বপ্ন"।[১]

পটের মধ্যে ইসলামী প্রভাব সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে দেখা যায়। এর ফলে পটের ঘটনাবলী প্রায় একই থাকলেও হিন্দু মুসলিম মিশ্রিত পট নতুন রূপ পায়। এই সময় ও তার পরে অসংখ্য সুফি-মতবাদী ধর্ম প্রচারক মধ্য ইরান-আরব এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। এদের প্রভাবে এদেশের মানুষ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারে। ইসলামের প্রভাবে এদেশের মানুষের ধর্মীয় জীবন হতে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এরফলে দেশীয় সংস্কৃতির সকল আঙ্গিকে ইসলামী প্রভাব পড়তে থাকে। সেই প্রভাব পটচিত্রকলায়ও দেখা যায়। ইসলামী প্রভাবে পৌরাণিক

আখ্যানের সঙ্গে ইসলামী আখ্যান যুক্ত হয়। পাল্টে যায় দেব দেবীর বেশভূষা চালচিত্র। তারা এক একজন বিভিন্ন নতুন আসনে অভিষিক্ত হতে থাকে। যেমন, বন দুর্গা হয়ে ওঠেন বনবিবি, শীতলা লাভ করেন বনবিবির রূপ, দক্ষিণ রায়ের স্থলে অভিবিক্ত হন গাজি কালু, সত্যনারায়ণের স্থলে সত্যপীর ইত্যাদি। এর ফলে এই সকল পীর ফকিরসহ ইসলামী দেব-দেবী বাঙালি জীবনের নতুন অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এই অনুষঙ্গ নির্ভরতায় পটচিত্রের আখ্যান আর চরিত্রে রদবদল ঘটে। তাই কালিয়া দমন আর গোষ্ঠলীলার পাশাপাশি দেখা যায় গাজীর পট। যা সুস্পষ্ট রূপে বাঙালি জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মিশ্রণের পরিচয় বহন করে।[৩] হজরত মুহাম্মদ ও হাসান হোসেনের মর্মান্তিক কাহিনির কোনও পট নেই। পটের গানও ওই সব কাহিনিকে আশ্রয় করে রচিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে নন্দকুমার ব্লকের শেরিফান চিত্রকর জানালেন "আল্লার কোন পার্থিব রূপ নেই। আমরা পৌত্তলিকতা বিশ্বাস করি না। তাই মুসলমান ধর্মের উপর আমরা কোন পট আঁকি না আর গানও করি না"।[৪]

পটুয়া সমাজে নারীদের মধ্যে পর্দানশীলতা আগেও ছিল না। এখনও নেই। সমাজে যারা দিন আনে দিন খায় তাদের সামাজিক সব নিয়ম মেনে চলার সমস্যা আছে। বহুকাল ধরেই পটুয়াদের নিত্যদিনের দারিদ্র্যর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন ও বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে নারী পুরুষ সকলকে। বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েরাও তাতে অংশ নেয়। লক্ষ্যণীয় সাধারণভাবে পটুয়ারা সামাজিক ন্যায় সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন। শাস্ত্রচর্চা ও সমাজ চর্চার পাশাপাশি সর্বত্র যাতায়াত ও মেলামেশার ফলে তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতাও বেশি। পটুয়া মহিলারা সন্তান পালন, রান্না বান্না ও অন্যান্য পারিবারিক কাজের পাশাপাশি পটের কাজও করে। রং প্রস্তুত, পট নির্মাণ, পটের গান রচনা ইত্যাদি সব কাজেই পটিয়সী পটুয়া নারীরা। পট দেখানোর জন্য ৩০-৩৫ বছর আগেও মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যেত। কোথাও কোথাও একা যেত। এজন্য যে কোনও অসুবিধা হত না তা নয় তবে বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের জাত ব্যবসা ছাড়া কিছু করারও ছিল না।

ফলে পট দেখানোর কাজেও এরা অভ্যস্ত ছিল। মেয়েরাও পট দেখাতো। বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশার জন্য এদের মনের মধ্যেকার আচ্ছন্ন সংস্কারের মুক্তি হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে এরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেনি। এরা শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দেয়। মুসলিম ধর্ম অনুযায়ী হয়েও হিন্দু ধর্মের সনাতন সম্পর্কগুলি এরা আগলে রেখেছে নিজেদের মধ্যেও। তাই শাঁখা, সিঁদুর, আলতা, কাজল এদের অনেকেরই অঙ্গ সজ্জার উপকরণ। শাঁখ বাজানো, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে মঙ্গল কামনা বা তুলসী তলায় প্রণাম করে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার সংস্কার এখন কমে গেছে। এক সময় হিন্দু নারীদের মতো পটুয়াদের মধ্যেও এই সংস্কার ছিল। তবে যত দিন যাচ্ছে পট দেখানোর রীতি প্রায় উঠে যাচ্ছে। ফলে হিন্দুদের পূজা অর্চনা নিয়ে আগে যেসব পট নির্মাণ করত এখন তার সংখ্যা খুবই কমে গেছে। নিজেদের মধ্যেও হিন্দু ধর্মের সংস্কারগুলোও প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের সংস্কার বাড়ছে। পট দেখানোর জন্য এরা যে

পট নির্মাণ করত তার অধিকাংশই ছিল হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু আখ্যানকে নিয়ে। সীতার বনবাস, সাবিত্রী সত্যবান, চাঁদ সদাগর, যমপুরী, রাধাকৃষ্ণ লীলা, শিব দুর্গার উপাখ্যান ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও তারা পট আঁকত। মানব সভ্যতার বিকাশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পলাশির যুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা কাহিনি নিয়ে রচিত পটের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। বিশেষ করে মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি। পটুয়ারা পৌরাণিক কাহিনিকে নিয়ে আঁকা পট ও পটের গানে নারীর যে মহত্ব বর্ণনা করত, তাতে সিদুর, আলতা, শাখা, কপালে লাল টিপ থাকত। সতী নারীর বর্ণনায় স্বামী শশুরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, ঘর দোর গুছিয়ে রাখা, আঙ্গিনা নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা, তুলসী তলায় প্রদীপ দান ইত্যাদির যে নিখুঁত হিন্দু সমাজের চিত্র ফুটে উঠত, সেই গৌরবকে মনে মনে শ্রদ্ধা করত পটুয়ারা। ছোট বয়স থেকেই পটুয়া কিশোরীদের মনে হিন্দু নারীর আদর্শ ও গৌরব মর্যাদার আসনে থাকত। তাই বড়ো হয়ে যখন সে ঘর সংসার করত তখন সেই শিক্ষাটিকেই তারা বহন করে চলত। একদিকে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, অন্যদিকে বহুকাল ধরে চলে আসা হিন্দু নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা কোনটিকেই তারা উপেক্ষা করতে পারত না। যার জন্য পটুয়া নারীদের মধ্যে মিশ্রধর্ম ও সংস্কার বহুকাল ধরে চলে আসছিল।

গত ৩০-৪০ বছর ধরে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলায় ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, জনশিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদির ফলে যে কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি হয় তার ফলে বাড়ি বাড়ি পট দেখনোর ক্ষেত্রে নতুন বিষয় বা উপাদান এসেই যায়। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে জনচেতনা বৃদ্ধির কাজে সরকারিভাবে পটুয়াদেরও কাজে লাগানো হয়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এইসব কর্মসূচি গৃহীত হয়। বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিবর্তে রাজ্য সরকারই এদের আর্থিক সহযোগিতা করে। পারিশ্রমিক দেয়। এছাড়াও ভূমি সংস্কারের ফলে অনেক জমি পায়। তারা কৃষি-কাজের সঙ্গে বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে আর্থিক উন্নতির ফলে ব্যবসা, পরিবহন ও অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে পটুয়া নারী পুরুষরা। আর্থিক স্বচ্ছলতা এল ঠিকই, কিন্তু সামাজিক নানা কারণে ঐতিহ্যবাহী পটশিল্পের বেশ ক্ষতি হল। পট দেখিয়ে পারিশ্রমিক অর্জন করাকে সমাজ সম্মানের চোখে দেখত না। এই ব্যবস্থাকে এরা নিজেরাই ভিক্ষার সঙ্গে তুলনা করত। কথায় কথায় এরা এখনও বলে পট দেখিয়ে ভিক্ষা করার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আসলে পট দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট দর দাম ছিল না। অনেকে এক জায়গায় একসঙ্গে পট দেখত, গান শুনত। কেউ কেউ দু-চার পয়সা দিত। বাড়ির গৃহিণীরা দিত চাল, ডাল, সবজি ইত্যাদি। কোন নির্দিষ্ট মজুরি ছিল না। নানাভাবে উপার্জন ছাড়া সংসার চলত না। পরবর্তীকালে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য পেশায় মন দেয় পটুয়ারা।

নানাভাবে সমাজের চরিত্র বদল হচ্ছে প্রতিদিন। লোকসমাজ যতদিন নিজের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে, ততদিনই তার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি অটুট থাকে। কিন্তু

প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা করণে কোন সমাজই আবহমান কাল ধরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে না। ফলে নতুন নতুন উপকরণ যুক্ত হয়। সমাজের নানা অগ্রগতির সঙ্গে লোক সংস্কৃতিরও নানা পরিবর্তন ঘটে। পটুয়াদের পটের মধ্যেও সমাজের নানা বৈচিত্র ফুটে ওঠে আবার পটুয়াদের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও যেমন যেমন পরিবর্তন হয় তেমনই পট-চিত্রকলা, গান ইত্যাদির উপর তার প্রভাব পড়ে। যুগে যুগেই লোকসংগীত ও শিল্পকলা এভাবেই পরিবর্তিত হতে হতে নিজের আধুনিকতা বজায় রাখে। সেদিক থেকে বিচার করলে লোকশিল্প সর্বদা তার মতো আধুনিক। সাধারণ মানুষ যাকে ন্যায্য ও সত্য বলে মনে করে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাকেই স্থান দেবার চেষ্টা করে। পটের ছবি এবং গান সেভাবেই নিজেকে আধুনিক করে রেখেছে।

সমাজে চাহিদার দিকটি মাথায় রেখেই লোক শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। গত চার দশকে পশ্চিমবঙ্গে নানা পরিবর্তন পটুয়াদের গানে, রঙ-তুলিতে ধরা আছে। গ্রাম উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা, জনশিক্ষা, সৌচাগারের গুরুত্ব, জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিবিধান, পালস পোলিও, টীকাকরণ, নারী পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিগত বছরগুলিতে পট রচিত হয়েছে ও পটের গান রচিত হয়েছে। উল্লেখ্য পটুয়ারা আগে গান রচনা করে পট নির্মাণ করে। আধুনিক ফরমায়েশি পট রচনার পাশাপাশি তারা ট্র্যাডিশন্যাল পটও রচনা করে। বিশেষ করে মাছের বিয়ের পট। সব পটুয়াদের কাছেই এই পটটি রয়েছে। যম পট প্রায় সব ট্র্যাডিশন্যাল পটের শেষ দৃশ্যেই দেখা যায়। যেখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয় জীবনের চরম পরিণতির কথা। আর পরলোকে সব অন্যায়ের শাস্তি বিধানগুলিও এই অংশে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। তবে আধুনিক বিষয়ে ফরমায়েশি পটের শেষে যমপটের অবতারণা করা হয় না।

ফরমায়েশি পটগুলি সাধারণভাবে সরকারি নির্দেশেই আঁকা হয়। বিভিন্ন কর্মশালা করে সেখানে লোকশিল্পীদের কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই বিষয়গুলিকে পরপর সাজিয়ে উপস্থাপন করার মতো করে পরিকল্পনা করে পটুয়ারা। তারা সেখানেই গান বাঁধে, পট আঁকে। কেউ কেউ কর্মশালায় বাঁধা গানগুলো লিখে নেয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো সরকারি প্রশিক্ষকদের সাহায্য নেয়। পরে এগুলি মুখস্থ হয়ে যায়। পট দেখাতে দেখাতে ওদের দক্ষতা এতটাই হয় যে প্রয়োজনে কাহিনি নির্ভর গান সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে পরিবেশন করে চলে। এতসব সত্ত্বেও পটুয়ারা কাহিনি নির্ভর পট আঁকতে ও গান গাইতে বেশি ভালোবাসে। কেননা ফরমায়েশি পাটের চাহিদা খুবই কম। অনেকটা প্রয়োজনের জন্য এই পট দেখানো হয়। আধুনিকতা পটুয়া নারীদের মধ্যেও এসে হাজির হয়েছে। রেডিও থেকে টিভি, মোবাইল ফোন বিশ্ব-সংসারকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। গণমাধ্যম ও জনসংযোগ নতুন ব্যবস্থায় উথাল পাথাল নতুন প্রজন্ম। পটুয়া নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সবাই টিভি দেখে। নতুন নতুন আধুনিক সিরিয়াল, সিনেমা দেখে গান শোনে, কাহিনী দেখে। আনন্দের উপকরণে সংযোজন হয় নিত্য নতুন

কাহিনি। সীতাহরণ, রামের বনবাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সতীর দেহত্যাগের মতো উপাখ্যানের জায়গায় সামাজিক বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভৃতির প্রতিচ্ছবি। যুক্তি-তক্কো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সমাজের দৈনন্দিন ঘটনা প্রবাহকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান শত সহস্র টিভি চ্যানেলে চব্বিশ ঘন্টা ধরে চলে মনোরঞ্জন। পট ও গ্রামীণ লোকশিল্প সংস্কৃতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ অন্যদিকে মোড় নেয়। পটুয়ারাও তা বোঝে। তাই তারা গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসে। পটের কাহিনি, গান বদলায়, রঙ বদলায়। ভেষজ রঙের জায়গায় কেমিক্যাল রং কিনে পট আঁকে। অনেকে মোটা দাগের জায়গায় সূক্ষ্ম দাগের ভরাট ছবি আঁকে। পটের গানের সুরে নতুনের ছোঁয়া লাগে। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ পটুয়া নারীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যেসব মেলা হয়, সেখানে লোকশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। লোকশিল্পীরা তাদের গান শোনায়, ছবি দেখায়। পটুয়ারাও পট দেখিয়ে, গান শুনিয়ে অর্থ উপার্জন করে। অনেকে পট কিনে বাড়ি নিয়ে যায় গৃহ সজ্জার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি অফিস সাজানোর জন্যও পট কেনা হয়। জামা কাপড়ে পটের ছবি আঁকা ফেব্রিক্সের কাজ ভালো দামে বিক্রি হয়। পটুয়ারা সেদিকেও মন দেয়। গৃহ সজ্জার জন্য পটুয়ারা নানান পটের ছবি আঁকে বিভিন্ন গৃহ সজ্জার উপকরণের উপর। ফুলদানী, ঘট, বিভিন্ন পাত্রের উপর রং বে-রং-এর কাজ করে বিক্রি হয়। পটের গান এখানে অবান্তর হয়ে পড়ে। পট ও পটের গান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও পটুয়ারা এখনও বিভিন্ন পাত্রের উপরে যেসব ছবি আঁকে, সবই বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি আশ্রিত জড়ানো পটের দৃশ্যরূপ। তবু যখন পটের বিক্রির উপর জোর দেওয়া হয়, তখন একই দৃশ্যের অনেক চিত্ররূপ আঁকা হয়ে থাকে। গান সেভাবে গাওয়া হয় না। মেলার পটের গানের জন্য ফরমায়েশ করে দু-একজন। বেশিরভাগ মানুষই পটের চিত্ররূপ দেখেই সন্তুষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই পটের গান রচনায় ও গান পরিবেশনায় ঐতিহ্য ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। পট ব্যবসায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে পটুয়ারা নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দক্ষ পটুয়ার কাছে পট আঁকার তালিমও নিচ্ছে কেউ কেউ।

শেরিফান চিত্রকর জানালেন, তিনি এখনও পটের গান রচনা করেন ও পট আঁকেন নিজে নিজে। তার সন্তান ও পুত্রবধূরা তাকে পটের গান রচনায় ও পট আঁকায় সাহায্য করে। পট হয় গানের কাহিনির অনুসারী। তবে প্রাচীন ট্র্যাডিশনাল কাহিনি যেসব গান বহুকাল ধরে চলে আসছে সেগুলির বিশেষ পরিবর্তন হয় না। শিল্পীর দক্ষতা অনুযায়ী এক একটি পালার পটের দৈর্ঘ্য বাড়ে বা কমে। এর জন্য গানকে ছোট বড় করার দরকার হয় না। মূল কাহিনি একই থাকে পট দৃশ্যে যেসব ঘাটতি তাও গানে গানে মিটিয়ে দেওয়া হয়।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশবিদেশে পটুয়াদের পট ও পটের গান এক সঙ্গে পৌঁছে যায়। যারা কৌতূহলী তারা এব্যাপারে খোঁজ নিতে সরাসরি পৌঁছে যায় পটুয়াদের বাড়িতে। বড় ক্যামেরা নিয়ে এদের কেউ কেউ তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। কেউ কেউ লেখালেখি করে এই

প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাটিকে নিয়ে। সঙ্গে নিয়ে যায় পট। পটের বিক্রি বাড়ে। সরকারী উদ্যোগে বহু পটুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়। সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে প্রায় সব পটুয়াদের পরিচিতি, ঠিকানা ও ফোন নম্বর রয়েছে। প্রয়োজনমতো এদের ডাক দেওয়া হয় পটচিত্র প্রদর্শনের জন্য। কথা সাহিত্যিক তাপস রায়ের একটি উপন্যাস 'শুধু পটে লিখা', 'গৃহশোভা' পত্রিকায় (২০১৯-২০) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে পটুয়াদের শিল্প কীর্তি ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্প চর্চা কেন্দ্র ও বিভিন্ন গবেষক এই ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তারাও পট ও পটের গান নিয়ে চর্চা করতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে পটুয়াদের বাড়ি যায়। পটের ছবি তোলে, গান শোনে, রেকর্ড করে নিয়ে যায়। পটুয়াদেরও ডাক পড়ে বিদেশে পট দেখানোর জন্য। গ্রামীণ দরিদ্র শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। নতুন করে নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার, সমৃদ্ধ করার কথা ভাবতে থাকে পটুয়ারা।

পটুয়াদের মধ্যে যারা আগে নিজেদের জাত ব্যবসা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তারাও কেউ কেউ পট শিল্পের কাজে আকৃষ্ট হয়ে পট নির্মাণ করতে শুরু করে ক্রমে দেখা যায় পটুয়াদের প্রায় সব পরিবারেই নতুন করে পট নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সক্ষম পুরুষ সদস্যরা অন্য পেশায় নিযুক্ত হলেও পরিবারের মহিলারা পটের কাজে সর্বতোভাবে নিজেদের নিয়োগ করেছে। এখন রাজ্য সরকারের কাছে যে পটুয়াদের নামের তালিকা রয়েছে সেখানে যেসব পুরুষ পটুয়াদের নামের তালিকা রয়েছে তারা বেশির ভাগই বেশ বয়স্ক। কিন্তু মহিলা পটুয়াদের বয়স তুলনায় অনেক কম। পাশাপাশি পুরুষ পটুয়া অপেক্ষা নারী পটুয়াদের সংখ্যা অনেক বেশি। মহিলারা বাড়ির কাজের পাশাপাশি পটের কাজ করে কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করে। বাড়ির সন্তান সন্ততিরাও তাতে হাত লাগায়। ট্র্যাডিশন্যাল পটের গান ও ছবি তাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে। ফলে তাকে রঙে তুলিতে সাজিয়ে তুলতে খুব অসুবিধা হয় না। কেউ কেউ নতুন দৃশ্যের অবতারণা করে পটকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। কেউ কেউ পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়ে নতুন করে গান বেঁধে পট রচনা করে। আধুনিক কালে বিভিন্ন ঘটনা ও গল্প নিয়ে পট রচনা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পটের রচনা হয় নতুন গল্প নিয়ে। এই আধুনিক পট প্রায় সব পটুয়াদের কাছেই রয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক। পার্থক্য অনেক বিশেষ করে গানে। একই রকমের বিভিন্ন দৃশ্যকে যখন গান গেয়ে দেখানো হয় তখন তার বর্ণনার ধরণ বদলে যায়। দৃশ্যগুলোর মধ্যেও বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

আধুনিক পটগুলো দেখলে মনে হয় নারীদের শিক্ষা অঙ্গনে প্রবেশ ও সামাজিক কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মতো বিষয়গুলিকে গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘদিন মেনে নিতে পারেনি। পটুয়ারা নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যাই হোক না কেন সমাজের চাহিদাকে সামনে রেখে এ ধরনের পট রচনা করত। ক্রমেই দিন বদল হয়েছে। সমাজে মহিলারা সম্মানের স্থান দখল করতে পেরেছে। সামাজিক কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে।

আবার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে মহিলারাও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। এইসব বিষয়গুলিকে নিয়ে বহু গান ও পট রয়েছে। অতি সম্প্রতি ঘটনাগুলিকে নিয়েও পট রচিত হচ্ছে। সতী দাহের অভিশাপ, স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহুকাল ধরেই পটুয়ারা পট দেখিয়ে আসছেন। গুজরাটের রূপ কানোয়ারের সতী দাহের মতো ঘটনা নিয়ে এরা তৎক্ষণাৎ পট ও গান রচনা করে। নারী ভ্রূণ হত্যা নিয়েও পট আঁকে। নারীদের অধিকার নিয়ে বারে বারেই পট আঁকে পটুয়ারা। শিক্ষা ক্ষেত্রে ও প্রশাসনে নারীদের সাফল্য তাদের চোখে পড়ে। সম্প্রতি এরাজ্যে নাবালিকা সহ নারী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ উঠে আসে পটুয়াদের সৃষ্টিতে। মধ্যমগ্রামের কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এদের পটে স্থান পায়। পরিবারে পটুয়া নারীদের গুরুত্ব যথেষ্ট। অভিজাতদের মতো এরা সমাজে পুরুষ নির্ভর নয়। স্বাধীনভাবেই এরা বহু জায়গায় যাতায়াত করে। বাড়ির অন্দর মহলেও এদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভারতীয় অন্যান্য নারীদের মতো। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ যে হয় না তা নয়। কদাচিৎ বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হলে মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রথা এরা মেনে চলে। আগেই উল্লেখ করেছি পটুয়া সমাজে মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীন ও স্বাধিকার নিয়ে চলে। মুসলমান ও হিন্দু ধর্মীয় সমাজের যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কার মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনমতো এরা ব্যবহার করে বা মেনে চলে। বাড়ির উঠোনে সকাল সন্ধ্যায় গোবর জল দিয়ে নিকিয়ে রাখে। এখন বাড়ি মাটির দেয়ালে নানা পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে থেকে নিজেদের পছন্দের চিত্র এঁকে রাখে। অবশ্য এটা আগে ছিল না। ইদানিং দূর দূরান্তের লোক তাদের পাড়ায় যায়। তারা যাতে পটুয়াদের আলাদা করে চিনতে পারে সেই জন্যেই নিজেদের পরিচয়কে প্রকাশ্যে আনতেই সম্ভবত দেয়ালে পটের ছবি এঁকে রাখে। বাড়ির পাশে রাখা বিভিন্ন আসবাব পত্রেও এরা রং দিয়ে ছবি এঁকে রাখে। শীতকালে যখন তাদের গ্রামে পর্যটক আসে তখন এরা বাড়ির পাশেই পটগুলিকে সাজিয়ে রাখে। অনেকেই পট কেনে। কেউ কেউ গান শোনে, পট ও পটের গান ভিডিও করে নিয়ে যায়। দেখা যায় পট দেখানো, গান শোনানো থেকে দর দাম করে পট বিক্রি করার কাজে এরা বেশ দক্ষ। বিভিন্ন পটের বিভিন্ন দাম। দীঘল পট বা জড়ানো পটের দামে যেমন রকমফের আছে তেমনি রকমফের আছে পটের এক একটি দৃশ্যেরও। কয়েক দশক আগেও পটুয়ারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। ইদানিং তা থেকে কিছু বেরিয়ে এসেছে। সরকারি ও বেসরকারি কিছু প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত।

বর্তমানে পটুয়ারা অনেকেই তাদের পুরাতন পেশা ছেড়ে নানাভাবে উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। যেভাবে চাষি, কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি এরা নিজেদের পেশায় আবদ্ধ থাকতে পারেনি—অনেকটা সেভাবেই তাদের পেশা বদল করেছে পটুয়ারাও অনেকেই। তাদের শিল্প ও জীবিকা এক সময় একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদিও আয় ছিল কম। তবুও অন্যান্য পেশাকে তারা মেনে নিতে পারেনি বহুকাল। বর্তমান আধুনিকতা ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য তাদের ভাবনাকে বদলে দিয়েছে। যাই হোক পটুয়ারা তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পট

দেখানোর প্রচলিত বৃত্তি থেকে সরে গেলেও এদের মধ্যে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, পুতুল তৈরি করা কিংবা এই ধরনের অন্যান্য কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছেই। সময় পেলেই তারা এইসব কাজ করে অনেকেই। ইদানিং কেউ কেউ এসব কাজে দেশ বিদেশের সম্মানও পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের সংখ্যা বেড়েছে স্বাধীনতার পরে। অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় চলে আসে দেশভাগের পর। তারা এপারে পট দেখানো শুরু করে।

আগে ওপার বাংলায় যে পট ও পটের গানের প্রচলন ছিল তা বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায়। আনোয়ারুল করীম বাংলাপিডিয়াতে লিখেছেন—"পটুয়ারা অনেক সংগীত সহযোগে পটচিত্র দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা গানের তালে তালে দর্শক শ্রোতাদের পটচিত্রের আখ্যানভাগ বুঝিয়ে দেয়। যশোর ও খুলনা অঞ্চলে পটুয়াদের গাইন" নামে অভিহিত করা হয়। অতীতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, সিলেট, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী এবং দিনাজপুর অঞ্চলে পটুয়ারা বসবাস করত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে দেশবিভাগের পর অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়। যারা থেকে যায় তাদের পেশায়ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ভাটা পড়ে। বর্তমানে ময়মনসিংহ, মুন্সিগঞ্জ, খুলনা, যশোর ও জামালপুর অঞ্চলে কদাচিৎ দু'একজন পটুয়া বা গাইন শ্রেণির শিল্পীর সাক্ষাৎ মেলে। পটুয়ারা বিভিন্ন মেলা, ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান এবং গ্রামে গঞ্জে পটচিত্র বিক্রয় করে। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন দেবদেবীর পট পূজা অর্চনার জন্য সংরক্ষণ করে।[৫]

বাংলার এপার আর ওপারের পটুয়াদের শিল্প ও সামাজিক উন্নতির জন্য যখন থেকে নারীরা এগিয়ে এসেছে, তখন থেকেই পটের ও পটের গানের মধ্যে আধুনিকতা এসেছে বেশি করে। আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও মর্যাদা বেড়েছে স্ত্রী-জাতির। তার প্রভাব পড়েছে সমাজে। পটুয়াদের নিজস্ব গণ্ডির বাইরেও তার প্রভাব পড়েছে। বিশ্বায়নের পর থেকে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম পটুয়া নারীদের আরো আধুনিক হতে সাহায্য করেছে। বিশ্ব বাজার ও বিশ্বের সব আধুনিকতার দিকে ছুটে চলেছে পটুয়া নারীরা। কিন্তু সম্ভাবনার দিক এটাই যে এরা এঁদের লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে খুব স্বার্থকভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। এটা তাদের গৌরব ও মর্যাদাকে নিশ্চিতভাবেই অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। http.//www.utoldhara.com.rang/tuli/mon/ -রঙ তুলি মন লেখে তিনজন- ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য।
২। http.//bn.banglapedia.org.index/php.title.পটচিত্র
৩। https//www. facebook. com. 1052426121532213. posts. 1077664672341691.
৪। সাক্ষাৎকার-শেরিফান চিত্রকর, নন্দকুমার, পূর্বমেদিনীপুর।
৫। http.//bn.banglapedia.org.index.php/title.পটচিত্র